[illegible]খণ্ড—দশম ও একাদশ সংখ্যা। মাঘ ও ফ[illegible]

নব্যভারত।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা,

১৭নং রঘুনাথ চট্টেয্যের ষ্ট্রীট, "মল্লিকা-যন্ত্রে" শ্রীনটবিহারী ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত;
২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬ই ফাল্গুন, ১৩০০।

[illegible]বার্ষিক মূল্য ৩] [illegible]

...দকের নিবেদন।

...সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইল। ফাল্গুন মাসের ...

...আসিয়াছে, এই সময়ে আমাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ ক... ...বে, ... করিয়া এখন কিছু কিছু মূল্য পাঠাইয়া উপকার করিলে ... ...ধিত হইব।

৩। বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার এবং বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মহাশয়গণ নব্যভারতের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়া মূল্য আদায় করিতে গিয়াছেন।

নব্যভারত সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়।

কবিরাজ শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

৩০ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট চোরবাগান, কলিকাতা।

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় অমৃতপ্রাশ, চ্যবন-প্রাশ, ছাগাদি ও চরক সুশ্রুতোক্ত নানা-প্রকার বৃষ্যঘৃত, মহামাষ, মহারুদ্র, কন্দর্পসার, বৃহদ্‌বিষ্ণু, মধ্যমনারায়ণ, বাসারুদ্র, সপ্তশতী প্রসারণী প্রভৃতি তৈল, নানাবিধ বটিকা, মোদক বটিকা চূর্ণ অবলেহ অরিষ্ট আসব ও জারিত ধাতু দ্রব্যাদি সকল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। মফঃস্বলে ভ্যালুপেবল ডাকে পাঠান হয়। ব্যারামের অবস্থা সহ রিপ্লাই কার্ড কি টিকিট্ পাঠাইলে ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠান হয়।

"আমি শ্রীযুক্ত কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেনের চিকিৎসা প্রণালী দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। ইনি অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি, আমার বাড়ীতে অতি কঠিন পীড়া অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য করিয়া আমাকে ...ঋণী করিয়াছেন। স্বভাব উত্তম, প্রকৃতি মধুর, ব্যবহার ...তি সুন্দর। ইহার দ্বারা ... যিনি কোন রোগীর চিকিৎসা ... নিশ্চিন্ত ... হইবেন, ... মোহিত হইবেন, বিশ্বাস করি।"

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, নব্যভারত সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

স্বর্গীয় সাধু মহাত্মা কিশোরী লাল রায় মহাশয়ের পুস্তক সমূহ, যথা, Essay on happiness, মূল্য ১৲, দেবতত্ত্ব, মূল্য ॥০ ও সঙ্গীত মূল্য ।০, বগুড়া, শিববাটী, বাবু মহেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়। যাঁহারা এই সকল পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহারা কিশোরী বাবুর বিপন্ন পরিবারের বিশেষ উপকার করিবেন।

উপনিষদঃ।

অর্থাৎ, ঈশ, কেন, ... মণ্ডক ও মাণ্ডুক্য ... "ব্রহ্ম-... ...বোধ ...

টাকা ও "প্রবোধক" নামক বঙ্গানুবাদ সমেত। সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ৵০ আনা। ২১০।৩।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, লেখকের নিকট প্রাপ্তব্য।

ব্রহ্মসন্দেশ।

শ্রীআনন্দচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত, মূল্য ।০, ১৭ নং সুরতির বাগান, কলুটোলায় পাওয়া যায়। এখানি একজন অন্ধ ব্যক্তির পুস্তক। যিনি ক্রয় করিবেন, তিনি অন্ধের জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ।

৩ খানি মনোহর নূতন উপন্যাস।

মায়া ।০, দুই ভাই ৵০, একটি চিত্র ...

বাবু হারা... ...প্রণীত ... মোহিত হইবেন ... কবির 'দুলালী' ॥০, ... অশ্রুম ॥০, 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমিক' ৵০, 'সুর...' ...আনা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২... কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নব্যভারত সম্পাদকের সুপরিচিত।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপ বাবু, ব্রজেন্দ্র বাবু, অক্ষয় বাবু, দয়... এবং মিঃ ডি, এন রায়, এম, ডি, মহোদয়গণের অনুগৃহীত। মাদার টিং ড্রাম ।৵০, ডাঃ ১২ প... ৩০ ক্রম ।৵০; ১২ শিশির ঔষধপূর্ণ কলে... পুস্তকাদি সহ ৩, ঐ ২৪ শিশির ৮।০, ৩... ১০।০ ইত্যাদি। গার্হস্থ্য চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ পুস্তক, ফোঁটা ফেলার যন্ত্র ২৪ শিশির ৮... শিশির ৯৷৵০; ৩৬ শিশির ১২, ইত্যাদি ... ২৵০; খুব ভাল "ক্রিম" ৩, ৪।০, ৬; ক্যাম্ফার ১ আউন্স ৮০, অর্দ্ধ আউন্স ।০। এমেরিকান ও জার্ম্মেন ফার্ম্মাকোপিয়ার সংক্ষেপ সংস্করণ ২, ...

কাল-মাহাত্ম্য।

দর্শনকারেরা কালের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ঘটনার পর ঘটনা, তাহার পরে ঘটনা, তাহার পরেও ঘটনা, এইরূপে ঘটনা পরম্পরার অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। একটী ঘটনা হইতে অপর একটী ঘটনার ব্যবধানের নাম কাল। ঘটনা ... কাল কিছুই নয়। ঘটনা না থাকিলে, ...ই কথাটারই সৃষ্টি হইত না। সূর্য্যের ...ই দুই ঘটনার ব্যবধানের নাম ...আর একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার ...হইবে, কাল শুধু একটী স্মৃতি। সূর্য্যাস্তের সময়ে সূর্য্যোদয়ের কথা মনে জাগে বলিয়াই, দিন নামক একটী দীর্ঘ-কালের অনুভব করি। অনেকক্ষণ খুব গাঢ় নিদ্রা দিয়া উঠিলে, মেঘান্ধকারের দিনে, সময় সময় বিকালকে সকাল বলিয়া মনে হয়। গাঢ় অন্যমনস্কতার সময় অতি সুদীর্ঘ কালকে সামান্য বলিয়া বোধ হয়। আবার দুঃখাদির সময়ে যখন কালের উপরে অর্থাৎ দুঃখারম্ভরূপ বিগত ঘটনা হইতে দুঃখান্তরূপ ভাবী ঘটনার ব্যবধানের প্রতি বড়ই মনোযোগ হয়, তখন কালকে অত্যন্ত লম্বা বোধ হইতে থাকে। এই জন্যই "দুঃখের রাত পোহায় না" এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যাক্, স্থূলকথা, দার্শনিকেরা কালটাকে কিছুই বলিতে চান না।

মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক রোখ বা ...তি দর্শনাপেক্ষা কবিত্বের দিকেই প্রবল। জ্যোতির্ব্বিদের চক্ষে যে চন্দ্র একটী জল ...য়ু-শূন্য মরুমাত্র, মানুষ তাহাকে সর্ব্বান্তঃ- ... সুধাকর ব... প্রেয়সী ও প্রিয়তমের ...দর সঙ্গে তু... ...রিয়া নর নারী অপার ...নন্দ ভোগ করে, প্রাণের আবেগ প্রশমিত করে। পিপাসু ব্যক্তি, শীতল জল পান করিবার সময় জলজান ও অম্ল-জানের মিশ্রণোৎপন্ন কোন একটা যৌগিক পদার্থ পান করিতেছে, মনে করে না। কাল সম্বন্ধেও এই কথা। দার্শনিক যে কালের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কবি সেই কাল লইয়া কালী এবং মহাকা... মূর্ত্তি রচনা করিয়া চমৎকারিত্বের এক... দর্শন করিয়াছেন। কালই, ব্রহ্মা ... কালই স্রষ্টা, কালই পোষ্টা, ... কর্ত্তা। বীজ হইতে অঙ্কুর ... কাল, অঙ্কুরকে ফল-ফুল-পল্লব-ভূ... করে কাল, বৃক্ষকে জ্বলন্ত চুল্লিকার... করে কাল।

আমরা বাহ্য জগতের উপরেই কা... প্রভাব সহজে অনুভব করিয়া থা... শিশু যুবা হইল, যুবা বৃদ্ধ হইল, বৃদ্ধ শ... মিশিল, অবশেষে কাল তাহার... মুছিয়া ফেলিল, এইরূপে মানব-সৃষ্টি-চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে। এই হাসি, এই কান্না। সকালে দেখিলাম, ওয়াটার্লুর রণাঙ্গনে বীর-কেশরী সগর্ব্বে ব্যূহ ভেদ করিতেছেন, বিকালে তিনি পলায়মান, দশ দিন পরে দেখিলাম, সেণ্ট হেলেনায় সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ। ইনিই না আল্‌প্‌সের তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ শৃঙ্গকে পথিস্থিত ক্ষুদ্র বল্মীকবৎ তুচ্ছ মনে করিতেন? ইঁহারই না প্রতাপে পৃথিবী কাঁপিতেছিল? মেষরক্ষক দরিদ্র বালক ক... ঘণ্টার মধ্যে বিজয়ী সম্রাট্ হইল। ডেবিড্ বা দাউদের প্রশংসায় মানবে... ...

কাল রাখাল আজ ভূপাল, কালের ইঙ্গিতে মানবভাগ্য সর্ব্বদা এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

জড়জগতে এ প্রভাব আরো সুস্পষ্ট। বনে নগর বসিতেছে, মহানগরী বনে ঢাকা পড়িতেছে, নদী শুকাইয়া ক্ষেত্র হইতেছে, ক্ষেত ভাঙ্গিয়া নদী বহিতেছে। সুন্দরবনের বাদা আজ সিটি অব্ পেলেসেস্ (City of Palaces), কিন্তু বাঘের ভয়ে সপ্তগ্রামের ভগ্নদৃশ্য কেহ দেখিতে চায় না। যুগে যুগে ... নবীন বেশ ধারণ করিতেছে।

...ন ভারতীয় পণ্ডিতগণ কালমাহা-...বে দেখিয়াছেন। জনসমাজের ...র প্রভাব অতি ধীরগামী। ...র্ণ সমাজসাগরের এক একটী ... উত্থান পতন হয়। জাতীয় প্রকৃতির ...টী ভাবের উন্মেষ হইতে সহস্র বৎসর ...তীত হয়। আর্য্য ঋষিগণ বর্ত্তমান মানব ...র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ...র আয়তনকে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ...ই চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। ...প্রকৃতির উপরে কালের আধিপত্য অনিবার্য্য। কাল কুম্ভকারের চক্র বা চিত্রকরের তুলিকা, জীব ঘটপটের মত। কাল যে ভাবে পড়ে, জীব সেই ভাবে গঠিত হয়। জীবের সমগ্র প্রকৃতি যুগমাহাত্ম্যের অনুযায়ী। কলিতে সত্যের প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের এবং সত্যে কলির প্রকৃতি বিশিষ্ট জীবের বর্ত্তমানতা সম্পূর্ণ সম্ভাবনার অতীত। আর্য্য ঋষিগণ বাহ্য জগৎকেও ...ইরূপ কালাবর্ত্তের বহির্ভূত মনে করেন ... এক কথায়, কাল তাঁহাদের মতে ...র প্রতিনিধি স্বরূপ, অথবা স্রষ্টার হ-... কালের দাস। কালই প্রকারান্তরে অদৃষ্ট...পির লিখক। পূর্ব্বকালে ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল সভ্যজাতিই কাল-মাহাত্ম্যের অনিবার্য্যতা স্বীকার করিত। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদিগের মত কালের এতাধিক উচ্চ মাহাত্ম্য অপর কোন দেশের লোকই স্বীকার করে নাই।

এখনকার ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে বলেন, কালকে কেশা... করিয়া টানিয়া আনাই মানব ... পরিচায়ক। বুদ্ধ, মুষা, ঈশা, মহম্... মহাত্মাগণ এইরূপে শত শত ... কেশে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ... ঘটাইয়া গিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ পণ্ডিতদিগের এই মত।

মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটী মত আছে। জনসমাজের দুর্গতি দূর করিবার জন্য সময় সময় ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন, অথবা কোন বিশেষ আত্মাকে প্রেরণ করেন। এইটী প্রথম মত। ভূগর্ভের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার ফলে যেমন আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হয়, মহাপুরুষগণও তদ্রূপ জনসমাজের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াবিশেষের ফল মাত্র। আবর্জ্জনা পচিলে সময়ে যেমন গ্যাস্ জ্বলিয়া আলেয়াগ্নি উৎপন্ন হয়, দুর্গতিসম্পন্ন সমাজের চরম দুরবস্থার পরে প্রাকৃতিক শক্তি প্রভাবেই সেইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এইটি দ্বিতীয় মত। আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোন দলের লোকেরা প্রথম মত এবং কোন দলের লোকেরা দ্বিতীয় মত পোষণ করেন। এই মত দুইটীর কোন একটি স্বীকার করিলেই যে কাল-মাহাত্ম্য স্বীকার করা ... তাহা বাহুল্যরূপে বলা নিষ্প্র...

ভিক্ষাবৃত্তি।

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই ভিক্ষাবৃত্তি প্রচলিত আছে। ভিক্ষার প্রয়োজনও আছে। যখন লোক নিজ ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে প্রকৃত পক্ষে অপারক হয়, সৎপথে থাকিয়া শত চেষ্টা করিয়াও জীবন ধারণের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান জুটাইয়া উঠিতে পারে না, এমতাবস্থায় তাহার পরের দয়ার প্রতি নির্ভর না করিয়া উপায় কি? এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ শ্রেয়। জগৎপিতা মনুষ্যের হৃদয়ে দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণ দিয়াছেন, ইহাদের অবশ্যই সার্থকতা আছে। নিঃস্ব, রোগগ্রস্ত, কার্য্যাক্ষম, দুর্দ্দশাপন্ন কত লোক আছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। যাঁহারা দুঃস্থ লোকদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র অতি প্রশস্ত। পরদুঃখ বিমোচনের সুযোগের অভাব নাই। কিন্তু দান করিতেও বিচারের প্রয়োজন। পাত্রাপাত্র ভেদে কেবল দান করিলেই পরোপকার হয় না। কতকগুলি দান আছে, তাহাতে সমাজের, পৃথিবীর, অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন;—
'There are a few of the administrative functions of Government for which a person would not be fit, who is fit to bestow charity usefully.' (Subjection of women)

যাহারা দান করিয়া প্রকৃত উপকার করিতে পারে, তাহারা শাসন কার্য্য প্রভৃতি কঠিন কার্য্য করিতেও সক্ষম। অতএব দেখা যায়, মিলের মত পণ্ডিতের মতে বিচার করিয়া দান করা একটা দুরূহ কাজের মধ্যে গণ্য।

আমাদের দেশে বহুসংখ্যক • ব্যবসায়ী ভিক্ষুক আছে। সুস্থ, সবল, কার্য্যক্ষম অনেক লোক নিশ্চিন্ত মনে, স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে, সুখ-স্বচ্ছন্দে, সাধারণের স্কন্ধে চাপিয়া দিনপাত করিতেছে। এই শ্রেণীর লোকের দুর্ভিক্ষে ভয় নাই; জীবিকা নির্ব্বাহের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা তাহারা একবারও ভাবে না। আমাদের সমাজে ইহাদের প্রতি বিশেষ সামাজিক নিগ্রহ আছে, এইরূপও বোধ হয় না। পরন্তু অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে ইহারা আবার সম্মানিতও হইয়া থাকে। 'বৈরাগীঠাকুর,' 'ফকির সাহেব' উল্লিখিত প্রকার ভিক্ষুকের উদাহরণ। ইহাদের মধ্যে অনেক দুশ্চরিত্র লোকও আছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে, অধিকাংশ 'বৈরাগী' (?) সর্ব্বপ্রকার আসক্তির দাস হইয়া, নির্ব্বিবাদে প্রকাশ্যভাবে পাপাচরণ করিবার জন্যই 'বৈরাগী' নাম ধারণ করিয়া থাকে। যাহারা পবিত্র বৈরাগ্য ধর্ম্ম এইরূপে কলঙ্কিত করে, ধর্ম্মের নামে যাহারা অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের, সমাজের প্রতি, সাধারণের প্রতি, কোন প্রকার দাবি আছে কি? ইহাদিগকে উৎসাহিত করা সমাজের উচিত, না, ইহারা আর সমাজের পাপস্রোত বৃদ্ধি করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি করা বিধেয়? দেশ নানারূপ দুর্ভিক্ষে নিপীড়িত; এমতাবস্থায় সুস্থকায়, সবল, দুশ্চরিত্র অলস লোকদিগকে সমাজের পালন করিতে হইলে দেশের দুর্গতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে।

এই স্থলে আর এক শ্রেণীর লোকের কথা বলিব। অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা মনে করেন, সমাজের প্রতি তাহাদের একটা স্বাভাবিক দাবি আছে। যাঁহারা

যাঁহারা কালকে মানব শক্তির অধীন বলেন, তাঁহারাও এই মত দ্বয়ের কোন না কোন একটী পোষণ করেন। সুতরাং তাঁহাদের এক মত অপর মতকে খণ্ডন করিতেছে।

যে যাহা বলুক, মানবজাতি চিরদিন কালের আধিপত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে। সভ্য মানবসমাজের আদ্যোপান্ত ইতিহাস এ কথার প্রমাণ দিতেছে। কাল প্রভাবে একই প্রণালীতে ক্রমে সকল সমাজেরই আচার ব্যবহার রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। স্ত্রী পুরুষের মিলন জনসমাজের একটী অতি প্রধান ব্যাপার। বেশী কথা না বলিয়া, শুধু এই প্রথা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। মহাভারতাদি পাঠ করিলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে দাম্পত্য সম্বন্ধের এত কড়াকড় নিয়ম ছিল না। ঋতুমতীর ঋতু রক্ষা একটী ধর্ম্মকার্য্য ছিল। ইহাতে স্ব-স্ত্রী পর স্ত্রীতে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র এবং ব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত বিবাহ-প্রথার ঘোর বিরোধী। মুষার পূর্ব্ব সময়ে মিসর বেবিলন, প্যালিষ্টন প্রভৃতি দেশেও এতদ্রূপ বিবাহপ্রথার শিথিলতা ছিল। বাইবেলের ইতিহাসে এজ্‌রাইল বংশের আদিম বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, এ বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে বাকল্‌ সাহেব লিখিয়াছেন ;—"এক সময়ে স্পার্টার বীরগণ ক্রীট্‌ দ্বীপ অবরোধ করিয়া তথায় বার বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে দেশ ভাবী বীরবংশে ও লোক সংখ্যায় হীন হইবে ভাবিয়া, তাঁহারা, দেশীয় যুবতীদের গর্ভে স্বেচ্ছা ক্রমে সন্তানোৎপাদন জন্য আপনাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশৎ বলিষ্ঠ যুবাপুরুষকে স্পার্টায় প্রেরণ করিয়া দিলে সেই প্রেরিত যুবাগণ তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল।"

মানুষ চিরকাল কালের পায়ে মাথা নোয়াইয়া আসিতেছে। কাল যাহা বলে, মানুষ তাহাই করে। প্রতি দশ বৎসরে হিন্দুর হিন্দুয়ানি নবীন আকার ধারণ করিতেছে। কেন? শুধু কালের তাড়নায়। কালের ভাব অতিক্রম করিয়া কোন জাতি আজ পর্য্যন্ত উন্নতির পথগামী হইতে পারে নাই। এই বন্দুক কামানের দিনে যদি তুমি ধনুর্ব্বাণ লইয়া সমরে নাম, নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। এখন আর ধনুর্ব্বাণের কাল নাই, বন্দুক কামানের দিন। এখন যুদ্ধে জয় চাও ত ধনুক রাখিয়া বন্দুক ধর। ভাবিয়া দেখিলে, সব বিষয়েই এইরূপ করা বিধেয় বোধ হইবে। আর্য্য ঋষিগণও এই জন্য কলিতে কলির ভাবই রক্ষা করিতে বলিয়াছেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ভাব অবলম্বন করিতে বলেন নাই। শরীর মনের প্রকৃতি এবং বাহুশক্তির পার্থক্য প্রদর্শন দ্বারা তাহা অসম্ভবপর প্রমাণিত করিয়াছেন।

কাল, কে বলে তোমাকে অস্তিত্বহীন? কে বলে তোমাকে শুধু আকার-হীন ঘটনা, জলীয় ছায়া? যে বলে বলুক, মানুষের প্রাণ তাহাতে কখনও সায় দেয় নাই, দিবেও না। যাহাকে তুমি কুসুমকোমল কোলে স্থাপন করিয়া আদর কর, পলকে তাহার কৌপীন রাজবেশে পরিণত হয়,—শীতাতপক্লান্ত শূন্য শিরে স্বর্ণমুকুট শোভে, মুকুটে মাণিক জ্বলে। আর বজ্র-নির্ম্মিত জ্বলন্ত অঙ্গুলে একবার যাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছ, সে হায়—হায়—করিয়া, সুখ শান্তির জন্য চীৎকার পূর্ব্বক মৃত্যুকে ঘন ঘন আহ্বান করিতেছে। হা কাল—হা কাল—, তুমি দয়ালু, তুমি নিদারুণ।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সুপণ্ডিত ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের হিন্দু-সমাজের প্রতি দাবি থাকিতে পারে। কিন্তু যাহারা কেবল নামে ব্রাহ্মণ, বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নামের কলঙ্ক, তাঁহাদিগকে সমাজ কেন প্রতিপালন করিবে? অল্প কতক দিন হইল আমাদের নিকট একটী ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ছেলে মেয়ের বিবাহ দিয়া ঋণী হইয়াছেন, কাজেই ভিক্ষার প্রয়োজন। ছেলের বয়স আঠার বৎসর, কন্যার বয়স দশ বৎসর। তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না, 'বাপু তুমি আমোদ আহ্লাদ করিয়া ছেলে মেয়ের বিবাহ দিলে, পুত্রবধূ ও জামাতার মুখ সন্দর্শন রূপ আনন্দ উপভোগ করিলে, আমি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া যে একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিয়াছি, তাহাতে তুমি ভাগ বসাইতে আসিলে কেন?'

বিক্রমপুর অঞ্চলে দেখিয়াছি, শ্রীহট্ট হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ (গলায় পৈতা আছে এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়) আসিয়া বাসা করিয়া থাকে। তাহারা ভিক্ষা করিয়া প্রচুর চাউল সংগ্রহ করে এবং বৎসরান্তে তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা পয়সা লইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই ব্রাহ্মণগুলি প্রায়ই সুস্থকায় এবং বলিষ্ঠ, লেখা পড়ায় সরস্বতীর বরপুত্র। এই অলস লোকগুলি সমাজের উপর টেক্স বসাইয়া কেন বাস করিবে? আমরা টেক্স টেক্স বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি, এই সকল টেক্সের কথা একবার ভাবি কি? যে কারণেই হউক, আমরা একেবারে স্বাবলম্বন হীন হইয়া পড়িয়াছি; আমরা গগনভেদী চীৎকার তুলিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে জানি। দুর্ভিক্ষ হইল গভর্ণমেণ্ট বসিয়া করেন কি? সকল দোষগুণই যেন কেবল শাসন প্রণালীর, আমাদের কিছুই নহে। এইরূপ বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে সকল দেশেই প্রচলিত আছে। হারবার্ট স্পেনসর লিখিয়াছেন;—'In each such mind there seems to be the unexpressed postulate that every evil in society admits of cure; and that the cure lies within the reach of law.'

কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিষয় গুলি তলাইয়া দেখা উচিত। দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি উপদ্রব কি কেবল গভর্ণমেণ্টের দোষে হয়, না অন্য কোন কারণও আছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, দেশের উৎপন্ন দ্রব্যে ভাল করিয়া কুলাইয়া উঠিতেছে না। এমতাবস্থায় এক শ্রেণীর লোক যদি অলস থাকিয়া কেবল আহার্য্য বস্তুর ধ্বংস এবং বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে, তবে কালে আরও দুঃসময় উপস্থিত হইবে। কেবল জাতির গৌরব করিয়া বসিয়া থাকার সময় চলিয়া গিয়াছে। জীবিকা নির্ব্বাহের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত। আমাদের দেশে এখনও বিস্তর অনাবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সকলের চাষাবাদের প্রয়োজন হইয়াছে। যে পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত, তাহার নিকট অনেক পথই খোলা আছে। পাত্রা পাত্র বিবেচনা না করিয়া দান করায় জাতীয় মনুষ্যত্বের হানি হয়, আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং নরনারীকে পরিশ্রমের গৌরব শিক্ষা না দিয়া নীচ ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রসিদ্ধ লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষ "জীবনের ভার" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "যে অলস, সে সমাজের বল বৃদ্ধি করিবে, দূরে থাকুক, ব্যাধিজীর্ণ মাংসপিণ্ডের মত সে [illegible] কণ্ঠে বিল-

স্থিত রহে, এবং তাহার ভারবহন রূপ অনাবশ্যক কার্য্যেই সমাজ অকারণে ক্ষীণবল হইতে থাকে। * * * "তুমি কে যে তুমি আলস্যের পর্য্যঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বৃথা হাস্য পরিহাসে সময় পাত করিবে; আর আমি চৈত্রের রৌদ্র ও শ্রাবণের বৃষ্টি মাথায় বহিয়া তোমার জন্য ভোগ্য বস্তু আহরণ করিব? তুমি কে যে তুমি বিলাসের পুষ্পিত আবরণে অঙ্গ ঢালিয়া বিরহ বিলাপে বসিয়া থাকিবে; আর আমি গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে তোমার জন্য পরিশ্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইব? হউক তোমার নাম হস্ত, আর আমার নাম পদ, অথবা তোমার নাম কেশ আর আমার নাম নখ; কিন্তু তুমি আমি উভয়েই যখন সমাজের অঙ্গ, তখন তুমি হস্ত কিম্বা কেশের কার্য্য না করিলে, আমি কেন তোমার সম্পর্কে পদ কিংবা নখের কার্য্য সাধনে রত রহিব? আমি দিবসের একার্দ্ধ মাত্র পরিশ্রম করিয়াই জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারি। কিন্তু আমাকে যে সেই স্থলে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয় এবং তাহাতেও আমার উপযুক্ত সংস্থান কি সংকুলন হয় না, তাহার কারণ তোমার ঐ আলস্য।"

শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন।

আর একটী বিখ্যাত সঙ্গীত।

GOD SAVE IRELAND.

(অনুবাদ।)

(১)

অতি উচ্চে ফাঁসি তরু-শির দেশে
মহামতি বীরত্রয় ঝোলে ফাঁসে।
অত্যাচারী প্রতিহিংসা তৃপ্তি তরে
বধিল পরাণ যৌবনের ঘোরে।
তারা কিন্তু সবে স্বজাতি প্রখ্যাত
বিক্রমের সহ শত্রু সম্মুখিল।
অতি সুনিশ্চিত মরণেরি ভিতে।
নির্ভিক পরাণে সবে আগুইল।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—বীরেরা কয়।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'— সকলে গায়।
'বধ্য মঞ্চপরে, কিংবা রণস্থলে
'মরেনা যেথানে কি ভয় মরণে
'মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।

(২)

চৌদিকে বেষ্টিত ক্রূর শত্রুদলে;
সগর্ব্বে তবুও সাহস উথলে।
কেমনা অন্তরে ভেবে ছিল তারা
সে সবার কথা ভালবাসে যারা—
দূরে বা অদূরে বিশ্বস্ত সাহসী
লক্ষ লক্ষ [illegible] সুহৃদ হিতৈষী
বীচি-সঙ্কুল জলধি পারে, আর
চির প্রিয় পুণ্যভূমি আয়র্লণ্ডে।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—সদর্প রবে।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—ফুকারে সবে।
বধ্যমঞ্চ পরে, কিংবা রণস্থলে
'মরিনা যেথানে কি ভয় মরণে
'মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।

(৩)

সধীরে আরোহী সোপান বন্দুর
তুলিল গম্ভীরে প্রার্থনার স্বর।
ইংলণ্ডের মৃত্যুপাশ পরি গলে,
দাঁড়ায়ে সবাই ফাঁসি তরু তলে;
সোদর স্নেহে চুমিল পরস্পরে।
স্বদেশ স্বধর্ম্ম স্বাধীনতা তরে
অটল রাগ মরণেরও কালে।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—বর যাচিল।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—সবে বলিল।
'বধ্য মঞ্চপরে, কিংবা রণস্থলে,
'মরিনা যেথানে কি ভয় মরণে
'মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।

(৪)

স্বদেশের তরে যে বীর প্রাণ
এইরূপে করি জীবনদান
গেলরে চলি ; বিনা শেষ দিন
লয় না পাইবে কভু তাহাদের স্মৃতি।
কিন্তু এ উদ্দেশ্য ততদিন রবে
আনন্দ সম্পদে কিংবা বিপদে
যত দিন এই, এই ক্ষুদ্র দ্বীপে
না করি স্বাধীন না করি মহৎ জাতি।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—সদর্পে বলি।
'রখুন আয়র্লণ্ডে বিধি'—সকলে গাই।
'বধ্য মঞ্চপরে, কিংবা রণস্থলে,
'মরি না যেথানে কি ভয় মরণে
'মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।

উপক্রমণিকা।

ফরাসী 'মার্শেয়েল্ক,' ইংলিস 'রুল ব্রিটানিয়া' বা 'গড সেভ দি কুইন'র ন্যায় 'গড সেভ আয়র্লণ্ড' একটি জন-সাধারণ-প্রিয় আইরিস জাতীয় সংগীত। দেশ কাল ও জাতিগত বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্যে বিরচিত বলিয়া উল্লিখিত জাতীয় সংগীত গুলি সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ভাবাত্মক ; কিন্তু প্রত্যেকটি একই উদ্দেশ্যমূলক। স্বদেশের হিত সঙ্কল্পে স্বদেশ-বৎসল সুকবি এক এক সময়ে সমগ্র জাতির অস্ফুট মনোভাব কবিতার ছন্দে পরিব্যক্ত করেন। মাধুরীময় কবিতার ছন্দ বিন্যাসে জাতীয় ভাব লিপিবদ্ধ হইয়া বংশ পরম্পরা চলিয়া যায়। এক একটি সংগীতে সমগ্র জাতির, সমগ্র দেশবাসীর এক এক সময়ের বিশেষ বিশেষ মনোভাব বা অবস্থা সন্নিবদ্ধ থাকে বলিয়া, জাতীয় সংগীত, স্বভাবতঃই প্রত্যেক জাতির অতীব আদারের, সম্মানের ও গৌরবের সামগ্রী।

আমরা বলিলাম, 'গৌরবের' সামগ্রী। ইহা সকল দেশের পক্ষে অথবা সকল সংগীতের পক্ষে প্রযোজ্য না হইতে পারে। যেথানে কোন স্বাধীন জাতির সংগীতে জয়োল্লাস, কীর্ত্তি কলাপ ঘোষণা, সুখ শান্তি, বীরত্ব বর্ণনা থাকে, সেথানে নিশ্চয়ই সে সংগীত 'গৌরবের সামগ্রী'। কিন্তু যেথানে পরাধীন জাতির সংগীতে দুঃখ বিষাদের আর্ত্তরব নিনাদিত হয়, অত্যাচার, নির্য্যাতনের নিদারুণ মর্ম্মপীড়া কবিতাচ্ছন্দে গীত হয়, রুদ্ধ ক্রোধ, অতৃপ্ত প্রতিহিংসা ও ভগ্ন-আশার ভাব যুগপৎ উচ্ছ্বাসিত হইতে থাকে, সেথানে জাতীয় সংগীত নিশ্চয়ই গৌরবের নহে। কিন্তু উভয় স্থলেই উহা যে গভীর আদর ও সম্মানের সামগ্রী, তাহা অবিসম্বাদিত। সকল সময়ে সকল জাতির অদৃষ্টে গৌরব গান ঘটে না। ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় জাতি বিশেষের অদৃষ্ট-চক্রও সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, শান্তি অশান্তি, প্রাচুর্য্য অভাব, অধীনতা স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা অবস্থার মধ্য দিয়া বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে। সুতরাং যদি কোন দেশের জাতীয় সংগীতের মধ্যে আমরা দেখি যে, পাশাপাশি গৌরব-গান ও বিষাদ-গান অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

আমাদের অনুবাদিত সংগীতটি আইরিশ কীর্ত্তি কাহিনী পরিজ্ঞাপক নহে। গভীর, অতি গভীর—বিষাদের গান, এই আইরিশ জাতীয় সংগীতটি। আনন্দ উল্লাস অপেক্ষা দুঃখ বিষাদ অধিকতর সংক্রামক। বোধ হয়, তাই এই বিষাদ সংগীত, এই গভীর মর্ম্মদাহী আর্ত্তরব ভিন্ন জাতির প্রাণেও সমবেদনার তরঙ্গ উত্থিত করে।

খ্রীঃ ১৮৬৭ অব্দে নবেম্বর মাসে এলেন,

লার্কিন, ওব্রায়েন নামক তিন জন আইরিশ ফিনিয়ান, পুলিশ সার্জ্জণ্ট বেটের প্রাণ বধ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সংগীতটি ইহাদের উদ্দেশে রচিত। টিমথি, ডি, সলিভান এই সংগীতের রচয়িতা।

আইরিশ 'ফিনিয়ান' পদটি বোধ হয় সকল পাঠকের নিকট সহজ-বোধ্য হইবে না। আমরা তাই ইহার অর্থ একটু খুলিয়া বলিলাম। খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে যখন ইউনিয়ন একট দ্বারা আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের সহিত সংযোজিত হয়, সেই অবধি ইহার স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টের স্বাধীনতা লোপ হইয়া গিয়াছে। হৃতস্বাধীনতা পুনরুদ্ধার বাসনায় অন্যূন শত বর্ষ ব্যাপিয়া স্বদেশ-প্রাণ আইরিশ ধুরন্ধরগণ নানারূপ অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে গুপ্ত সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশময় বিদ্রোহানল পরিব্যাপ্ত করিবার চেষ্টাও একটি। অন্যান্য গুপ্ত সভার মধ্যে ফিনিয়ান সভা তদানীন্তন শাসন কর্ত্তাদিগের বিশেষ ভয় ও উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্ট দুই বা তিন শতাব্দীতে আইরিশ জাতীয় সৈন্যদিগকে উহাদের অধ্যক্ষের নামানুসারে Fiana Erion অর্থাৎ Fenians বলা হইত। (অধ্যক্ষের নাম ছিল Fenius) ফিনিয়ান গুপ্ত সভার অধিনেতা, সেই প্রাচীন নামে এই সভার নামকরণ করেন। ইহা হইতে প্রত্যেক সভ্যকে ফিনিয়ান বলা হয়। ফিনিয়ান গুপ্ত সভার প্রত্যেক সভ্য বিদ্রোহিতার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে প্রতিশ্রুত। প্রত্যেক ফিনিয়ান্ গুপ্তভাবে এক সৈনিক পুরুষ। ফিনিয়ান সম্প্রদায় বিদ্রোহ সংঘটনেচ্ছু গুপ্ত সেনাদল। সুতরাং ফিনিয়ান্স্ বলিলে এই বুঝিতে হয় যে—যাহারা এই সভার সহিত এক উদ্দেশ্যে স্বদেশের উদ্ধার বাসনায় বদ্ধপরিকর এবং অস্ত্রধারণ করিয়া দেশের জন্য প্রাণদানে কৃতসংকল্প ও প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, এইরূপ গুপ্ত, অবৈধ, অন্যায় ও অবিহিতরূপে দেশোদ্ধার মন্ত্রণায় যোগদান করিয়া অনেক সহস্র সহস্র আইরিশ যুদ্ধে, বধ্য মঞ্চে, কারাগারে, অস্বাস্থ্যকর দ্বীপান্তর-নির্ব্বাসনে আপনাদের জীবন হারাইয়াছে।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ে কেলি (Colonel Thomas J. Kelly) নামক এক ব্যক্তি আয়র্লণ্ডে ফিনিয়ানদের নেতা। কেলি ১৮৬৭ অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেষ্টর নগরে উপস্থিত হয়। তৎকালে অনেক আইরিশ ম্যাঞ্চেষ্টরে আসিয়া বাস করিতেছিল। কেলি ম্যাঞ্চেষ্টর প্রবাসী আইরিশদিগের কোন এক গুপ্ত মন্ত্রণা সভায় যোগদান করিবার জন্য ইংলণ্ডে আগমন করে। কেলি ও ইহার সহযোগী ডিজি (Captain Deasy) এবং অন্য দুইজন এক পরিচ্ছদ বিক্রেতার আপণ সমক্ষে পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছিল। এক পুলিশ কনষ্টেবল ইহাদিগের কথাবার্ত্তার একটু আভাস বুঝিতে পারিয়া এবং ইহাদের প্রতি সন্দিহানচিত্ত হইয়া, ইহাদিগকে ধরিবার জন্য উদ্যম করিলে, অন্য দুইজন পলাইয়া যায়, কেলি ও ডিজি ধৃত হয়। বিচারস্থলে ইহারা আপনাদিগের প্রকৃত নাম ধাম গোপন করিয়া, অন্য নামে পরিচয় দেয়, এবং আপনাদিগকে আমেরিকাবাসী বলিয়া বলে। বিচারক ইহাদিগের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া Vagrancy Act মতে ২।৩ দিবসের মিয়াদ দিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া

দিবার আদেশ প্রচার করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ডিটেকটিভ পুলিশের লোক বলিল যে, ইহাদের বিচার সপ্তাহ কাল স্থগিত রাখা হউক; কেন না, ইহাদের দুইজনের মধ্যে ফিনিয়ান-নেতা আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সপ্তাহ বিলম্ব করিতে হইল না। সেই দিবসই সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডিটেকটিভ পুলিশ যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিল যে, এই বন্দিদ্বয়ের একজন কেলি, ফিনিয়ান-অধিনেতা, অন্য জন তাহার সহকারী কাপ্তেন ডিজি।

কেলি ও ডিজির বন্দী সংবাদে. মাঞ্চেষ্টার-প্রবাসী আইরিশ ফিনিয়ানদের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অধিনেতার মুক্তির জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা হইল। একদল সশস্ত্র যুবা কেলির উদ্ধারের জন্য কারাগারের পথে এক নিভৃত স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কেলির মুক্তি মন্ত্রণার সংবাদ যথাসময়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট পৌঁছিলেও, তাঁহারা যথাবিহিত সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। এই নিমিত্ত যখন বন্দীবাহী শকট পুলিশরক্ষী সমভিব্যাহারে কারাগারাভিমুখে ধাবিত হইতেছিল, লুক্কায়িত ফিনিয়ানগণ যথাস্থান হইতে বহির্গত হইয়া শকট আক্রমণ করে। দাঙ্গায় পুলিশ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। শকটাভ্যন্তরস্থ সার্জেণ্ট বেট কোন এক ফেনিয়ানের বন্দুকের গুলির আঘাতে নিহত হয়। কথিত আছে যে, কোন ফিনিয়ান ইচ্ছা করিয়া বেটকে নিহত করে নাই। বাহিরে গোলমাল শুনিয়া বেট শকটের চাবির ছিদ্র পথ দিয়া উকি মারিয়া দেখিতেছিল। সেই সময়ে একজন ফিনিয়ান, অন্য উপায়ে শকটদ্বার উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া, বন্দুক দ্বারা চাবি ভাঙ্গিবার জন্য সেই ছিদ্র মুখে বন্দুকনালী রাখিয়া আওয়াজ করে। তাহাতেই আহত হইয়া বেট প্রাণত্যাগ করে। ফিনিয়ান-অধিনেতা কেলির মুক্তির জন্য এই উদ্যমকে আইরিশ ইতিহাসে Manchester Rescue নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পুলিশ হস্তে কেলির ধৃত হওন, বলপূর্ব্বক কেলির উদ্ধার সাধন ও তদানুষঙ্গিক দাঙ্গা হাঙ্গামা, এবং পরে ধৃত বিদ্রোহীদের উপর পুলিশের অমানুষীপীড়ন ও অত্যাচার, মাঞ্চেষ্টার প্রবাসী সমগ্র আইরিশদিগের প্রতি পুলিশের উৎপীড়ন ও অন্যায় আচরণ সংবাদে আয়র্লণ্ডের অধিবাসীরা নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত, উদ্বেলিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। এদিকে ইংরাজগণ মুষ্টিমেয় ফিনিয়ান হস্তে রাজশক্তির অবমাননা দেখিয়া প্রতিশোধ বাসনায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। ভয়, ক্রোধ, প্রতিহিংসা উভয় জাতির হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। এমতাবস্থায়, মাঞ্চেষ্টার উদ্ধার-সহায়কারী বন্দীদের বিচারের জন্য Special commission বসিল। উইলিয়ম ফিলিপ এলেন, মাইকেল লার্কিন, টমাস মাগুয়ার, মাইকেল ওব্রায়েণ এবং এডওয়ার্ড কণ্ডেণ, এই পাঁচজনকে সার্জেণ্ট বেটের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে পাঁচজনেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের পর অপরাধীরা প্রথমতঃ, প্রত্যেকে অভিযোগের বিরুদ্ধে আপন আপন বক্তব্য প্রকাশ করে। সকলেই দৃঢ়বাক্যে অভিযোগ অস্বীকার ও স্ব স্ব নির্দ্দোষিতা প্রদর্শন করে। শেষ বক্তা, কণ্ডেণ, স্বীয় বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে এই কথাগুলি বলে;—"আপনারা শীঘ্রই আমাকে

ঈশ্বর সমীপে প্রেরণ করিবেন এবং আমিও যাইতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। আমার অনুতাপ করিবার বা প্রত্যাহার করিবার কিছুই নাই। আমি কেবল এই বলি, ঈশ্বর আয়র্লণ্ড রক্ষা করুন”।

কণ্ডেণের এই কথা বলা শেষ হইলেই, ইহার সঙ্গীগণ সকলে এককালে অভিযোগ-মঞ্চ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া উদ্দীপ্ত মুখ তুলিয়া ও হস্ত বিস্তার করিয়া সমস্বরে ও একাগ্রপ্রাণে চীৎকার করিয়া উঠিল—God save Ireland. সেই অবধি God save Ireland পদটি আয়র্লণ্ডে জাতীয় মহামন্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বিচারের কিয়দ্দিবস পরে, লণ্ডন ও অন্যান্য স্থানের সংবাদ পত্রের রিপোর্টারগণ, (যাঁহারা বিচার স্থলে উপস্থিত ছিলেন) মাগুয়ার সম্বন্ধে বিচারের দোষ দেখাইয়া হোম-আপীসে এক আবেদন করেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুসন্ধান দ্বারা যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া, মাগুয়ারকে দোষমুক্ত করিয়া প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা হইতে অব্যাহতি দেন। মাগুয়ারের দণ্ডাজ্ঞা রহিত দেখিয়া ন্যায়বান্, অপক্ষপাত বিচারপ্রিয় কোন কোন সদাশয় ইংরাজ আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে, যখন অপক্ষপাত বিচার হয় নাই, যখন যথাযোগ্য প্রমাণের অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন এই অপরাধীদের অন্য যে কোনরূপ দণ্ড দেওয়া হয় হোক, কিন্তু ইহাদের প্রাণ-দণ্ড যেন না করা হয়। এইরূপ আন্দোলনের পরেই কণ্ডেণের প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ প্রচারিত হইল। আয়র্লণ্ডবাসীরা আশা করিয়াছিল, ক্রমে অবশিষ্ট তিনজনেরও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। ২৩শে নবেম্বর ১৮৬৭ অব্দে এলেন, লার্কিন ও ওব্রায়েণের ফাঁসি হয়।

যদিও ইংরাজদিগের সমক্ষে উক্ত দণ্ডিত ব্যক্তিত্রয় অতি নীচ ঘৃণ্য হত্যাকারী, আই-রিশদিগের নিকটে ইহারা স্বদেশের জন্য “মারটার” বলিয়া পূজ্য ও আদরণীয়। সেই জন্যই, ইহাদের স্মৃতি স্থায়ী করিবার উদ্দেশে এবং ইহাদের প্রতি স্বদেশের জন্য প্রাণদান-কারীর আত্মার গৌরব ও সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য যে নানাবিধ অনুষ্ঠান ও আয়োজন হয়, তন্মধ্যে বিষাদ-মাখা জাতীয় সংগীতে ইহাদিগকে অমর করিবার বাসনাও অতি স্বাভাবিকরূপে কবির লেখনী সঞ্চালিত করিয়াছিল। আইরিশ মিনিষ্ট্রে-লাদির মধ্যে, স্বদেশ ভাবময় কবিতাস্তবকে, ভবিষ্য আইরিশ বংশের নিকট প্রকাশ্য বধ্যমঞ্চে প্রাণদণ্ডিত এই স্বদেশবাসীদের স্মৃতি চির জাগ্রত থাকিবে।

সংগীতোল্লিখিত ব্যক্তিত্রয় 'murderers' কি 'martyrs', আমাদের বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই। আমরা শুদ্ধ ভাবের পক্ষ হইতে এই জাতীয় সংগীতটীকে দেখিব। ইহাতে যেরূপ উৎসাহ, আবেগ ও বিষাদ সহকারে জাতীয় ভাবের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা আইরিশ জাতীয়তার, স্বদেশপ্রাণতার এক উচ্চ বিকাশ অতি সুন্দররূপে অনুধাবন করিতে পারি। স্বাধীন হোক, আর পরাধীন হোক, যে জাতি স্পর্দ্ধার সহিত, উচ্চ সৎ-সাহসের সহিত মুক্তপ্রাণে আইরিশ কবির সহিত সমস্বরে বলিতে পারে

'বধ্য মঞ্চপরে কিংবা রণস্থলে
'মরি না যেথানে কি ভয় মরণে
'মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।

সে জাতি পবিত্র জাতীয়তার উচ্চসোপানে যে উন্নীত হইয়াছে, কেহ অপক্ষপাত হৃদয়ে তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

গৌড়-ইতিহাস ও ভক্তিশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত।

পূজ্যপাদ শ্রীল সম্পাদক মহাশয়, আপনার অবিদিত নাই, জেলা রাজসাহী রামপুর বোয়ালিয়াস্থ শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় পত্র দ্বারা আমাকে কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, আর তাহার উত্তরগুলি নব্যভারত পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বলেন। আমি তদনুসারে অর্থাৎ তাঁহার প্রশ্ন-ঘটিত উত্তরগুলি নিম্নে লিখিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি, ভরসা করি, আপনার কৃপাদৃষ্টিতে যদি পত্রিকায় স্থান পাইবার যোগ্যহয়, অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর প্রথম প্রশ্ন।

" নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ। "

(১) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এই লিখনানুসারে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপগোস্বামী কি যবন ?

" তোমার বড় ভাই করে, দস্যু ব্যবহার। "

" জীব পশু মারি কৈল, চাকলা সবকাশ॥ "

(২) পাতসার এই উক্তিতে শ্রীসনাতনের কেহ কি বড় ভাই দস্যু ছিলেন ? জীব পশু হিংসা করিতেন ?

(৩) তাঁহারা কোন কুলোদ্ভব ? এবং তাঁহাদের প্রকৃত বৃত্তান্ত কি ?

উত্তর।

১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড় বঙ্গদেশ একপ্রকার স্বাধীন পাঠান রাজ্য ছিল। ৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্বে অর্থাৎ যে সময়ে সম্রাট হুমায়ুন ও তৎপুত্র আকবর সাহা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গৌড়নগরে সুবুদ্ধি রায় নামে জনৈক হিন্দুরাজা এবং পাঠান বংশীয় হুসেন সাহা নামে ঐ রাজার জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন।

দিনাজপুরের উত্তরাংশে প্রসিদ্ধ গৌড় নগরে (অধুনা জঙ্গলাকীর্ণস্থানে) প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংশাবশিষ্ট (সেকালের নৃপতি কর্ত্তৃক বিচিত্র নির্ম্মাণ কৌশল) রাজপ্রাসাদের এবং মসজিদের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, এবং নানাবর্ণিত ইষ্টক ও প্রস্তরাদি স্থানে স্থানে পতিত আছে এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রাচীন তিন্তিড়ী বৃক্ষে পরিবেষ্টিত এবং নানা ফুলদল পরিশোভিত যে একটী সুরম্য সরসী শোভা পাইতেছে, রাজা সুবুদ্ধি রায় ঐ বাপি খননের নিমিত্ত উক্ত হুসেন সাহার হস্তে বিস্তর অর্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন।

লোভ অতি ভয়ঙ্কর শত্রু। অর্থ-লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া "সা হুসেন" সেই অর্থ হইতে কিছু অর্থ আত্মসাৎ করেন। পশ্চাৎ রাজা সেই ছিদ্র পাইয়া অপহৃত অর্থ উদ্ধারের নিমিত্ত হুষেণের পৃষ্ঠ দেশে চাবুক মারিয়াছিলেন। এই প্রহারের জন্য সা হুসেন উক্ত রাজার ভয়ানক শত্রু হইয়া নানা কুচক্র দ্বারা সৈন্য সামন্তকে বশীভূত করিয়া সুবুদ্ধিরায়কে সমরে বন্দী করেন। রায়ের প্রাণদণ্ড করিবারই হুসেণের পত্নীর সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। পরন্তু, সা হুসেন উক্ত রাজার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। এই খাতিরে প্রাণদণ্ড না করিয়া প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে রাজার মুখে নিষ্ঠীবন পাত্রের জল

দিয়া জাতিচ্যুত ও রাজ্যচ্যুত ও দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া "সাহুসেন" স্বয়ং গৌড় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

রাজ্য লাভের পর "সাহুসেণ" বিপুল পরাক্রমের সহিত বাহুবলে উড়িষ্যা প্রদেশের কিয়দংশ জয় ও বল প্রয়োগে অনেকের যথা সর্ব্বস্ব লুট ও বিস্তর জীব পশু হিংসা ও বিস্তর দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও দেবালয় ভগ্ন করিয়া তত্র প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত সাহুসেনের অত্যন্ত সৌহৃদ্য থাকা বশতঃ দিল্লীশ্বর গৌড়রাজ্যের কোন কার্য্যে স্বয়ং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তার্পণ করেন নাই ও করিতেন না। কেবল সময়ে সময়ে রাজার নিকট কর গ্রহণ করিতেন মাত্র। তৎকালীনে বঙ্গের হিন্দু রাজগণ তাঁহার অধীনস্থ ছিলেন। বিদিত আছে, সম্রাট আকবরের দেশ-প্রসিদ্ধ মন্ত্রী "আবুলফজল" আইন আকবরি নামে একখানি দণ্ড পুস্তক প্রণয়ন এবং দ্বিতীয় মন্ত্রী রাজপুত-বংশীয় "রাজা তোড়লর্ম্মল" রাজ্যের ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় নিদর্শন পত্র প্রস্তুত করিয়া এক এক স্থানের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই রাজস্ব সংগ্রহের সেরেস্তায় "চাকলা" "সরকার" ও পরগণা লিখিবার রীতি নীতি প্রচলিত হয়। তৎসময়ে গৌড় বঙ্গের রাজস্ব সংগ্রহের সেরেস্তা অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও অনেক স্থান "গএর আবাদি" অর্থাৎ পতিত ভূমি ও নানা স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ও হিংস্র জন্তু প্রভৃতির অধিক দৌরাত্ম্য ও পথ ঘাট অত্যন্ত দুর্গম ছিল। অদৌ রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট ও কোনরূপ সুচারু বন্দোবস্ত ছিল না। সেই কালে কর্ণাট প্রদেশস্থ রাজবংশী ভরদ্বাজ গোত্র কুলোদ্ভব যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীকুমার দেব নবহট্ট (নৈহট্ট) বাস পরিত্যাগে নিজপুত্র বহুবিদ্যা-বিশারদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ, এই পুত্রত্রয় এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধব সহিত গৌড় রাজধানীর নিকটস্থ "রামকেলী গ্রামে" বাস করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের পিতৃদত্ত নাম "অমর" ও "সন্তোষ" পশ্চাৎ নাম শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ। যথা, ভক্তিমালা প্রকাশিকা গ্রন্থে ;—

" অমর, সন্তোষ, নাম পূর্ব্বেতে আছিল।
সনাতন, রূপ নাম, পশ্চাৎ হইল॥ "

কুলীন গ্রামনিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর শ্রীবসু রামানন্দ ও শ্রীসত্য রাজখাঁনের পিতা মহাত্মা মালাধর বসু, উপাধি গুণরাজ খাঁন, যাঁহার কৃত "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামে বঙ্গের আদি গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ও ৪০০ শত বৎসরের হস্তলিখিত গ্রন্থ যাহা আমার বাড়ীতে আছে, এবং ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট মহোদয় কর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মহাত্মা মালাধর বসু, গৌড়েশ্বরের বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সর্ব্বগুণান্বিত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে পড়সী ভাবে নিকটে পাইয়া বড়ই স্নেহ করিতেন, ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের মন্ত্রণা ও লেখ্য বিষয়ে সাহায্য লইতেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ তৎসময়ের রাজভাষা আরব্য ও পারস্য বিদ্যায় এতদূর ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন যে, তখনকার মুসলমান সম্প্রদায় বড় বড় মৌলবী ও মোল্লা ও কাজীগণ উক্ত বিদ্যার বিচারে তাঁহাদের নিকট পরাস্ত হইতেন। একখানি তুরকিনামা পারস্য ভাষার গৌড় ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট আকবর দিল্লী হইতে গৌড়েশ্বরকে পারস্য

ভাষায় যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, এক এক সময় তাহার অর্থ বড়ই দুরূহ হইত। অর্থাৎ লোগদ নামা পারস্যাভিধানের সাহায্য ব্যতীত তাহার অর্থ মীমাংসা ও উত্তর লেখা হইত না। গৌড়েশ্বর সেই সকল পত্রাদির উত্তর লিখিবার কারণ, মূল পত্রাদি গুণরাজ খাঁনের হস্তে সমর্পণ করিতেন। গুণরাজ খাঁন আবার সেই সকল পত্রের উত্তর লিখিবার কারণ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের হস্তে দিতেন। পশ্চাৎ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ কর্তৃক লেখা প্রস্তুত হইলে, মন্ত্রীবর তাহা লইয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত করণান্তর রাজার অনু মতি ক্রমে তাহাই সম্রাটের নিকট দিল্লীর দরবারে পাঠাইতেন। সেই সকল পত্রের "এবারত" অর্থাৎ রচনা এতই মধুর ও শ্রবণ-তৃপ্তিকর হইত যে, পাঠ ও শ্রবণ করিবার কালে দিল্লীশ্বর বড়ই প্রীত এবং বিস্মিত হইতেন। এবং লেখ্য দর্শন করিয়া একমুখে লেখক ও রচকের শত শত প্রশংসা করিতেন। গুণীর গুণ গুণী ব্যতীত কি অন্যে জানিতে সক্ষম? দিল্লীশ্বর সামান্য ছিলেন না। জগতে খ্যাতি আছে ;—"দিল্লীশ্বরো বা, জগদীশ্বরো বা" নামে তিনি, সম্বোধিত হইতেন। সম্রাট আকবর যথার্থ গুণী লোকের আদর ও সম্মান করিতেন। লেখা ও রচনার ভাবে দিল্লীশ্বরের হৃদ্‌প্রত্যয় হইয়াছিল যে, লেখক ও রচক সামান্য ব্যক্তি নহেন। হয়, দেব-অংশ-সম্ভূত, নয় ঈশ্বরের কৃপাভাজন পাত্র, অথবা সরস্বতীর বরপুত্র। তাই তিনি, এক সময় একটী পত্রের উত্তরে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে লেখক ও রচকের নাম জানিবার অভিপ্রায়ে গৌড়েশ্বরকে পত্র লেখেন। গৌড়েশ্বর সেই পত্র পাইয়া এবং অমাত্য গুণরাজ খাঁন প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া লেখক শ্রীরূপ ও রচক শ্রীসনাতন, এই উভয় নাম পত্রাভ্যন্তরে লিখিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট পাঠাইয়া দেন। দিল্লীশ্বর সেই উত্তর পাইয়া, শ্রীরূপ ও সনাতনকে মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত এবং মর্য্যাদার সহিত তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃ ও বন্ধু ভাবে গ্রহণ ও তাহাদের মন্ত্রণানুসারে রাজ কার্য্য সম্পাদন করণের নিমিত্ত "ফরমান" অর্থাৎ নিজ আজ্ঞার সহিত শ্রীরূপ ও সনাতনের পৃথক পৃথক নামকরণে এক একখানি "পাঞ্জাপাট্টা" অর্থাৎ নিজ করপল্লব যুক্ত সনন্দ লিখিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট পাঠাইয়া দেন। গৌড়েশ্বর, সম্রাটের সেই আদেশ এবং সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তদ্দণ্ডেই, শ্রীরূপ ও সনাতনকে দরবারে আহ্বান করিয়া, সম্রাট-প্রদত্ত খেলাৎ অর্থাৎ ঐ সনন্দ গ্রহণ করিতে বলেন। ইহাতে দুই ভাই বড়ই ভীত হইলেন। কারণ, সেকালের লোক এ কালের মত ম্লেচ্ছ সেবী, ম্লেচ্ছ-স্পর্শী, অথবা চাকরির ভিখারী ছিলেন না। ব্রাহ্মণের চাকরী জীবিকা নহে, স্মৃতিআদি শাস্ত্রের বিরোধী; বিশেষতঃ কাম্বোজ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ সংসর্গে জাতিচ্যুত হইতে হয়। তাহার আবার প্রায়শ্চিত্তাভাব। সংহিতাকার পরাসর বলিয়াছেন ;—

"আসনাচ্ছয়নদ্যানাৎ সম্ভাষণাৎ সহভোজনাৎ
সক্রামন্তিহি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥" ১২শ অ,৭২

যেমন বিন্দুমাত্র তৈল জলে পতিত হইলে সমুদায় জল ব্যাপে, তদ্রূপ যবন ও পাপীর সহ উপবেশন, একত্র শয়ন ও একত্র গমন ও একত্র ভোজন ও আলাপন করিলে নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও পাপ আশ্রয় করে।

এতন্নিবন্ধন, দুই ভাই মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া রাজসমীপে বহু প্রকার

অনুনয় ও আপত্তি করিলেন। পরন্তু গৌড়েশ্বর কোন আপত্তিই শুনিলেন না। তখনকার রাজ-নিয়ম বড়ই ভয়ঙ্কর ছিল। কেহ রাজাজ্ঞা অবমাননা করিলে তন্মুহূর্ত্তেই তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, কোন প্রকারে এড়াণ পাইবার যো ছিল না। তদাবস্থায় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। অগত্যা দণ্ড ভয়ে শেষ রাজারসহ কয়েকটী নিয়ম বদ্ধ করিয়া মন্ত্রীত্ব পদ ভয়ে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আছে ;—

সনাতন রূপ, মহামন্ত্রী, সর্ব্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা, শিষ্ট লোকের মুখেতে॥
গৌড় রাজ যবনের, অনেক অধিকার।
সনাতন রূপে আনি, দিলা রাজ্য ভার॥
মেলচ্ছ ভয়ে বিষয় করিলা অঙ্গীকার।
এ দুই প্রভাবে রাজা, বৃদ্ধি কৈল তার॥

যৎ সময়ে গৌড় রাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপ ও সনাতনকে সনন্দ প্রদত্ত হয়, তৎসময়ে তখনকার রাজ নিয়মানুসারে হিন্দু নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া উভয়ের যাবনিক নাম ও খেতাব অর্থাৎ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। যাবনিক অর্থাৎ পারস্য শব্দে তন্নামের অর্থ এই ;—"দবির শব্দ" ঈশ্বরের আজ্ঞাভাজন ; "খাস শব্দে" উত্তম, এই খাস শব্দ হইতেই খাসা শব্দের উৎপত্তি। দ্বিতীয় খাসনবিশ শব্দে উত্তম লেখক।

"সাওকর বা সাওয়ার শব্দে" অত্যন্ত দাতা এবং মুক্তহস্ত, আর বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। মল্লিক শব্দে অতি মর্য্যাদাশালী। দুই ভাই এই সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়া শ্রীরূপ "দবির খাস" এবং শ্রীসনাতন "সাকর মল্লিক" নাম ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ মর্য্যাদা ভিন্ন সম্রাটের আদেশানুসারে স্বয়ং গৌড়েশ্বর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে সময়ে সময়ে ভাই, "দোস্ত" বলিয়া বন্ধু ভাবে সম্বোধন করিতেন।

এদিকে গৌড়েশ্বর সকল বিষয়ে সম্মানিত, বিশেষতঃ বয়সে প্রবীণ ছিলেন। তাই তাঁহার প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত শ্রীরূপ ও সনাতন (রাজাকে) যে "জিন্দাগানি" "ও জিন্দাপীর" বলিয়া সময়ে সময়ে সন্মাননা ও সম্বর্দ্ধনা করিতেন। ম্লেচ্ছ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ ম্লেচ্ছের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতেন না,কখনও একাসনে বসিয়া কাজ করিতেন না। স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া কাজ করিতেন। "জিন্দাগানি শব্দে পীর" এবং জিন্দা শব্দে দাদা" যথা পারস্যাভিধানে ;—

"জিন্দা দাদা, কাসদ্ নানা" ইত্যাদি

সাওকর শব্দ হইতে সাকর শব্দের উৎপত্তি। সাওকর শব্দটী এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় প্রচলিত আছে। কাহাকেও মুক্তহস্ত এবং দাতা ও উদার চেতা দেখিলে "লোকটী বড়ই সাওকর," কার্য্য কারণ সম্বন্ধে লোকে সচরাচর এই শব্দ বঙ্গ ভাষায় ব্যবহার করে। শব্দটী যাবনিক ভাষা হইলে কি হয়, বড়ই মিষ্ট। তাই মহাপ্রাজ্ঞ সম্রাট বাছিয়া বাছিয়া উভয়ের নামকরণ করিয়াছিলেন। শেষ নামও সার্থক ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। দুই ভাই শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারে জীবের ভাগ্যে সদয় হইয়া "সাওকার" অর্থাৎ ভক্তি শাস্ত্র প্রচার ও বিতরণ না করিলে ভক্তি শাস্ত্র কি, এবং তাহার ভিতর কি বস্তু আছে, ইহা কেহ কি জানিতেন ? না বুঝিতেন ? তাঁহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে রাশি রাশি ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন ও বিনামূল্যে অকাতরে বিতরণ ও প্রচার করিয়া

একদিকে বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ও অন্য দিকে জগতে অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভক্তমাল গ্রন্থে আছে;—

" দবীর খাস আর সাকর মল্লিক।
প্রভাবেতে এ দোহাঁর খেতাব অধিক ॥
যাহাঁদের হইতে হয়, ভক্তির প্রচার।
আচার্য্য সম্রাট বলি, খ্যাতি নাম যাঁর॥" ইত্যাদি

ইঁহারা বাল্যকালে বঙ্গের অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীসর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতির প্রসিদ্ধ নৈহট্টের চৌবাড়ীতে ন্যায়,দর্শন,স্মৃতি সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদায় এবং "ক্যাস্পিয়ান" মহাদ্বীপ বাসী সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী "সাইদ ফকিরদ্দিনের" নিকট পারস্য ও আরব্য বিদ্যা রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সম্রাট আকবরের প্রধান মন্ত্রী রাজা তোড়লমল্ল রাজস্ব সংগ্রহের সেরেস্তায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে কিছু বিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গৌড় বঙ্গেও সেই বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি এবং প্রজার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া সকলের চক্ষুরঞ্জন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব কালে যবনদিগের অনেক প্রকার দৌরাত্ম্য দমিত হইয়াছিল। এই-কালে যবনদিগ হইতে হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ঠ হওয়াতে,

" পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

দুষ্কৃত জনের হস্ত হইতে সাধুগণের পরিত্রানের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান পূর্ণ অবতার

" ধর্ম্মং মহা পুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম।
ছন্নো কলো যদ্ভব স্ত্রি যুগোইত সত্বম্॥" (শ্রীমদ্ভাগবত)

রূপ ধারণ করিয়া, যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আদিকালে স্বরস্বতী তীরে অঙ্কুরিত ও মধ্যকালে বদরিকাশ্রমে পল্লবিত ও তৎপরবর্ত্তী কালে নৈমিষারণ্যে মুকুলিত হইয়াছিল, সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম ফলবান প্রবল বৃক্ষে পরিণত করিবার নিমিত্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের জন্ম গ্রহণের কিছু পূর্ব্বে,১৪০৭ শাকে, শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের প্রবাহে সমস্ত বঙ্গ ভাসাইয়া ছিলেন। সেই পবিত্র প্রবাহে সকল পাপ তাপ এবং বহুদিনের বদ্ধ কুসংস্কার ধৌত হইয়াছিল। সকলে সকলকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দিয়াছিল। এমন কি, হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্যের অস্তগমনের পর হিন্দুর এমন দিন আর কখন হয় নাই। হিংসার পরিবর্ত্তে প্রেম, আঘাতের পরিবর্ত্তে আলিঙ্গন, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচলধামে গমন করেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাহার পূর্ব্বাবতারে সহচর বা সহচরী, সেই কালে তাঁহাদিগকে মনোমধ্যে স্মৃতি হওয়াতে, বিশেষত তাঁহাদিগের দ্বারা বহু কার্য্য সাধন অর্থাৎ অবতারের মোক্ষ প্রয়োজন সাধিত করিতে হইবে, এই জন্য, তাঁহাদিগকে বিষয়-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিবার মানসে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, মথুরা গমনের ভাণ করিয়া, সাঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ ভক্তগণের সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তন আর ব্রহ্মার দুর্ল্লভ হরিনাম প্রেম আচণ্ডালে বিতরণ করিতে করিতে ক্রমে গৌড় রাজ্যের নিকট "রামকেলী" গ্রামে গিয়া উপস্থিত হন। সেইকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে গৌড় রাজধানীর নিকট লক্ষ লক্ষ লোকের সংঘট্ট হয়। সেই

কালে শ্রীশ্রীপ্রভু দাস রঘুনাথ গোস্বামী নিজকৃত পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; যথা,—

"শ্রীবৃন্দাবন যাইতে প্রভুর যবে হৈলা মন।
ভক্তগণ লয়ে সাথে, চলিলা গৌড়ের পথে,
যাঁহা আছে রূপ-সনাতন॥
কণক পূর্ণ চাঁদে, কামিনী মোহন ফাঁদে,
মদনে মদন গর্ব্ব চূর্ণ।
মৃদু মৃদু আধভাষা, ঈষৎ উন্নত নাশা,
দাড়িম্ব কুসুম যিনি কর্ণ॥
ঝরে নয়নার বিন্দে, বাস্প নামক রন্ধ্রে,
তারক ভ্রমর হরষিত।
গভীর গর্জ্জন কভু, কভু বলে হাহা প্রভু,
আপাদ মস্তক পুলকিত॥
প্রেমে না দেখিয়া বাট, ক্ষণে মারে মাল সাট,
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে বলে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গ রায়, সবে দেখিবারে ধায়,
কর্ম্ম বন্দে পড়ি গেল বাধা॥
পাইছেন প্রেম ধন, নাচয়ে বৈষ্ণবগণ,
আনন্দ সায়রে নাহি ওর।
দেখিয়া মেঘের মেলী, চাতক করিছে কেলী,
চাঁদ দেখি যৈছন চকোর॥
প্রেমে মাতয়াল গোরা, জগৎ করিল ভোরা,
যবনের হইল বিশ্বাস।
জড় অন্দ, মুক মাত্র, সবে হৈলা প্রেম পাত্র,
বঞ্চিত শ্রীরঘু নাথ দাস॥" (পদসমুদ্র)

* * * * *

সেইকালে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোকের সমাগম দৃষ্টে জনৈক পাঠান কোতয়াল অর্থাৎ শান্তিরক্ষক তদর্শনে অত্যন্ত ভীত ও চমৎকৃত হইয়া, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া একটু ভাব উল্টাইয়া বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে:—

এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলী গ্রামে।
নিরবধি করয়ে সে ভূতের কীর্ত্তনে॥"
না জানি তাহার সঙ্গে, আছে কত জন।

রাজা তৎ শ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন;—

"রাজাবলে কহ কহ, সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায় কি নাম কৈছে দেহের গঠন॥"

তখন রাজার কিঞ্চিৎ মুখের আশ্বাস পাইয়া সহর কোতয়াল স্বরূপ বর্ণন করিয়া বলিতে লাগিলেন:—

কোতয়াল বলে শুন, শুনহ গোসাঁই:
এমন অদ্ভুত কভু, দেখি শুনি নাই॥
সন্ন্যাসীর শরীরের, সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কাম দেব সম হেন, নাপারি বলিতে॥
জিনিয়ে কনক কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ, সুনাভী গভীর॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ, কমল নয়ন।
কোটিচন্দ্র সে মুখের, নাহি করি সম॥
সুরঙ্গ অধর মুক্ত, জিনিয়া দশন।
কাম সরাশন যেন, ভ্রুভঙ্গ পত্তন॥
সুন্দর সুপিন বক্ষে, লেপিত চন্দন।
কটিতটে শোভে মহা অরুণ বসন॥
রাতুল চরণ যেন, কমল যুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল॥
কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই, করয়ে ভ্রমণ॥
নবনীত হইতেও কমল সব অঙ্গ
তাহাতে অদ্ভুত শুন, আছাড়ের রঙ্গ॥
এক দণ্ডে পড়েন, আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত॥

যবনরাজ, কোতয়ালের মুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রূপ, গুণ, এবং মহিমা শুনিয়া আর বদান্যতার বিশেষ পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তখনই হিন্দু কর্ম্মচারী সজ্জন ও সুশীলবন্ত কেশব ছত্রি প্রধান পাত্রকে ডাকিয়া সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করেন;

"কহত কেশব খাঁন, কি মত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বল্দি, নাম বল যার॥
কেমত তাহার কর্ম্ম, কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঁই সেহ, কহিবে অবশ্য॥"

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজার ভয়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহিমা গোপন করিয়া কেশব পাত্র বলিলেন;—

"কেবলে সন্ন্যাসী সে. এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরিব, বৃক্ষের তলবাসী॥"

রাজা কেশবের প্রতি উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া অন্যথা বাক্যে বলিলেন ;—

রাজা বলে, গরিব তারে বলিল কেমনে।
মহাদোষ হয় ইহা, শুনিলে শ্রবণে॥
হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ, খোদায় যবনে।
সেই তিহোঁ নিশ্চয়, জানিহ সর্ব্বজনে॥
তাঁহারে সকল দেশ, কায় বাক্য মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে॥
অতএব তিঁহ সত্য, জানিহ ঈশ্বর।
গরিব বলিয়া তারে, না কর উত্তর॥
কাজি বা কোটাল কিংবা, হউ যেই জন।
কিছু বলিলেই তার, লইব জীবন॥"

রাজা, এইরূপ সকলের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়া অভ্যন্তরে গমন করিলেন। কিন্তু মন স্থির হইল না। অনন্তর খাস-মন্ত্রী দবির খাসকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে।—

"দবির খাসেরে রাজা, পুছিলা নিভৃতে।
গোঁসাইর মহিমা তিহেঁ।, লাগিলা কহিতে॥
যে তোমারে রাজ্য দিলা, যে তোমার গোসাঞা।
তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে, জন্মিলা আসিয়া॥
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধ হয়॥
মোরে কেন পুছ তুমি, পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশসম॥
"রাজা কহে হেন এই, মনে যেই লয়।
সাক্ষাত ঈশ্বর ইহোঁ, নাহিক সংশয়॥" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ঈশ্বর, প্রাগুক্ত প্রশ্নোক্তি দ্বারা শ্রীশ্রীরূপ যবন রাজের অন্তঃকরণে প্রতীতি জন্মাইয়া অগ্রজের নিকট গমন করিলেন। পশ্চাৎ দুই ভাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় নিজ নিজ বেশ লুকাইয়া (রামকেলী গ্রামে) অর্থাৎ যেখানে মহাপ্রভু সাঙ্গপাঙ্গ সহিত বিরাজমান ছিলেন, অর্দ্ধরাত্রে তত্র-স্থানে উপনীত হইয়া প্রথমেই করুণাবতার শ্রীশ্রীমদ্‌নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া এবং তৎপশ্চাৎ শ্রীহরি দাস ভক্তের পাদবন্দনা পূর্ব্বক অনন্তর দর্শনে দুই গুচ্ছা তৃণ ধারণ করিয়া গললগ্নী কৃতবাসে শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইয়া

" গৌর কান্ত্যা চ্ছন্ন রূপ, শ্যামায় পরমাত্মনে।
গৌড়াকাশা দিতা খণ্ডে, সলিলে ব্রহ্মণে নমঃ।"

এইরূপ বহুবিধ স্তুতি বাধের পর আপন আপন পরিচয় প্রদান কালে বলিলেন ;—

" নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু, কহিতে বাসী লাজ॥"

পতিতোদ্ধারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়ের মস্তকে হস্ত প্রদান ও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে, সনাতন! হে শ্রীরূপ! আর দৈন্য প্রকাশ করিতে হইবে না। তোমার উক্তিতে আমার প্রাণ বিকল হইতেছে ;—

" গৌড় নিকট আসিতে নাহি কোন প্রয়োজন।
তোমা দোহাঁ দেখিতে মোর, ইহা আগমন॥
এই মোর মনের কথা, কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেন আইলা, রামকেলী গ্রামে॥
ভাল হৈলা দুই ভাই, আইলা মোর স্থানে।
ঘর যাহ আর কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই, কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা দোহাঁর করিবে উদ্ধার॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

প্রভুর এইরূপ প্রসন্নতায় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন আশ্বস্ত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণে বিদায় হইবার কালে বিনীতভাবে কিছু নিবেদন করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রো-দয় নাটকে ;—

" সনাতন কহে প্রভু, করি নিবেদন।
হেন পরিচ্ছেদে না যাইবে বৃন্দাবন॥
দুই এক বন্ধু লয়ে, মথুরা যাইবে।
তবে ব্রজ দরশনে, বহু সুখ পাবে॥"

এই সঙ্কেত কথা বলিয়া দুই ভাই নিজ বাড়ীতে গমন করেন। পশ্চাৎ প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মথুরাগমনে

ক্ষান্ত হইয়া সাঙ্গপাঙ্গ অর্থাৎ ভক্তগণ সহিত নীলাচলে প্রত্যাগমন ইচ্ছায় যাত্রা করিলেন। দুই ভাই যখন শুনিলেন,মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিয়াছেন, তখন আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। প্রভুর বিরহে দুই ভাই অতিমাত্র চঞ্চল হইলেন। প্রভু নীলাচলে উপস্থিত হইয়া কখন কোন সময় কোন স্থানে গমন করেন, তৎসংবাদ জানিবার মিনিত্ত দুইজন গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া বিশেষ কার্য্যানুরোধে শ্রীরূপ রাজধানীতে গমন করিলেন। আর, শ্রীসনাতন বাড়ীতে রহিলেন। কিছু দিনের পর.গুপ্তচর নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন করিয়া, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে বনপথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন, যখন এই সংবাদ শ্রীরূপের শ্রুতিগোচর করিলেন, তখন শ্রীরূপ আর কালব্যাজ না করিয়া আপনার উপার্জ্জিত অর্থ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে এবং কুটম্ব ভরণ পোষণে বিভাগ করিয়া দিয়া এবং অগ্রজ সহোদর সনাতনের বৈরাগ্যহেতু দশ সহস্র মুদ্রা মুদি ঘরে রাখিয়া রাজভয়ে জ্যেষ্ঠকে কোন কথা খুলিয়া লিখিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠকে বৈরাগ্য উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, এই কারণে একখানি "শর্কর" অর্থাৎ খোলাকুচীর মধ্যে সূচিকার অগ্রভাগে ;—

য, রী, র, লা, ই, র,ং ন, য়, ॥

এই ৮ টী অক্ষর মাত্র লিখিয়া অগ্রজকে দিবার নিমিত্ত ঐ গুপ্তচর হস্তে ঐ শর্করাখণ্ড সমর্পণ করিয়া এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া দিয়া কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভকে সঙ্গে লইয়া গুপ্ত পথে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করেন। পশ্চাৎ মহামহা সঙ্কটস্থল এবং পর্ব্বতারণ্য পার হইয়া বহুকষ্টে প্রয়াগধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন্। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সে সময়ে শ্রীরূপকে পাইয়া করিলেন কি ?

" প্রিয় স্বরূপে, দয়িত স্বরূপে,
প্রেম স্বরূপে, সহজাতি রূপে,
নিজানু রূপে, প্রভুরেক রূপে,
তদনু রূপে, স্ব বিলাস রূপে, ॥
প্রিয় স্বরূপে রূপ, দয়িত স্বরূপ,।
সহজ মধুর ইহোঁ, প্রভুর স্বরূপ ॥
ত্রিভুবনে মুখ্যত্তম, হয় যার রূপ।
তাররূপ হয় সেই বিলাস স্বরূপ ॥
হেনরূপ পাঞা প্রভু, উল্লাসিত হঞা।
বিস্তর করিল প্রেম, আলিঙ্গন দিয়া ॥
তারে আজ্ঞা দিলা তুমি, যাহ বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ গূঢ় লীলা, করহ বর্ণন ॥ "
(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক)

এদিকে শ্রীরূপের প্রস্থানে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহার ধৃতানুসন্ধান জন্য স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কোন স্থানে তাহার আর সন্ধান পাইলেন না। অন্য দিকে শ্রীরূপের বিরহে শ্রীসনাতন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিলেন। এবং বৈরাগ্যের পূর্ব্বানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পণ্ডিত ও ভট্টাচার্য্যদিগকে লইয়া নিজ প্রাঙ্গণ মধ্য শ্রীশ্রীতুলসীক্ষেত্রের নিকটে বসিয়া দিবসের প্রথম ও শেষ যামার্দ্ধে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ শ্রবণ এবং রাত্রে হরিবাসর সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পীড়ার ভাণ করিয়া রাজ সংসারে আর গমন করিলেন না।

কাজে কাজেই শ্রীরূপের প্রস্থানে এবং শ্রীসনাতনের অনুপস্থিতে রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি লক্ষিত হইল। সেই সময় উড়িষ্যার কোন এক বিভ্রাটে রাজা তত্রস্থানে যাইতে

অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। হয়, প্রধান মন্ত্রী শ্রীসনাতনের হস্তে রাজ্য সমর্পণ, নয় তাহাকে সঙ্গে করিয়া তত্রস্থানে গমন করিবেন, রাজা এই ইচ্ছা করিয়া শ্রীসনাতনের দৈহিক অবস্থা জানিবার নিমিত্ত জনৈক রাজবৈদ্যকে শ্রীসনাতনের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই বৈদ্যরাজের বাড়ী শ্রীখণ্ডে, সে কথা পরে বলিব।

বৈদ্যরাজ রাজ আজ্ঞায় শ্রীসনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া দ্বাররক্ষকের মুখে শুনিলেন, শ্রীসনাতন সুস্থ শরীরে ভট্টাচার্য্যাদি সমভিব্যাহারে প্রাঙ্গনে বসিয়া পুরাণ শ্রবণ করিতেছেন, ভিতরে প্রবেশের কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় ক্ষেত্রস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, দৌবারিকের কথা সত্য। শ্রীসনাতন বৈদ্যরাজকে দেখিয়াই সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার নিকটে বসাইলেন। অন্যান্য কথা হইল বটে, পরন্তু যে জন্য গমন, বৈদ্যরাজ শ্রীসনাতনের ভাব গতি দেখিয়া সে কথা আর তুলিলেন না ও বলিলেন না। কিয়ৎক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ শ্রীসনাতনের নিকট বিদায় গ্রহণানন্তর রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা চাক্ষুষে দেখিয়া ছিলেন তৎসমস্ত রাজার শ্রুতিগোচর করিলেন। রাজা শ্রবণ মাত্রেই বুঝিলেন, এই সমস্ত সেই আগন্তুক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর খেলা। শ্রীরূপ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, অতঃপর শ্রীসনাতনও তৎপথ অবলম্বন করিবেন। মন মধ্যে এই এক যুগপৎ দুঃখ ও ভাবনার উদ্রেক হইল। কি যাহাদিগের মন্ত্রীত্ব বলে আমার রাজ্যসুখ, যদি তাহারাই আমাকে একে একে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে। কিন্তু সেই দুঃখ কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। পরদিন, স্বয়ং পদব্রজে শ্রীসনাতনের গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন, শ্রীসনাতন বুধমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ প্রাঙ্গণ মধ্যে বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে একদিকে হর্ষ ও অন্য দিকে বিমর্ষ হইলেন। এদিকে স্বয়ং পাতসার হটাৎ আগমন দৃষ্টে সকলে সম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে বসিতে আহ্বান ও উচ্চাসন প্রদান করিলেন। রাজা স্বতন্ত্র স্থানে উচ্চাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রথমেই একটু গম্ভীরভাবে শ্রীসনাতনকে বলিলেন, হে মন্ত্রীবর? তোমার মনস্থ কি? তুমি উপস্থিত ও সবল থাকিয়াও আমার সকল কার্য্য নাশ করিতেছ, এ তোমার কি ধর্ম্ম? তোমার পীড়ার কথা শুনিয়া আমি বৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম, পশ্চাৎ বৈদ্য মুখে শুনিয়াছি এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও দেখিতেছি, বস্তুতঃ তুমি পীড়িত নহ. এরূপ ছল করিবারই বা প্রয়োজন কি?

সনাতন উত্তর করিলেন, হে জিন্দাপীর, আমি বস্তুতঃ শ্রীরূপের বিরহে কাতর. এ অবস্থায় আমা হইতে আর রাজকার্য্য চলিবে না, যেহেতু আমার মনের স্থিরতা নাই, অতএব আমার স্থলে অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া কার্য্য সমাধান করুন। রাজা তৎশ্রবণে অন্তরে দুঃখ ও বাহ্যে কোপ প্রকাশ করিয়া (পারিভাষিক শব্দে বলিলেন;— যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

"তবে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা, কহে আরবার।
তোমার বড় ভাই করে, দস্যু ব্যবহার॥
জীব পশু মারি কৈল, চাকলা সবকাশ।
তুমি হেতা কৈলে মোর, সব কার্য্য নাশ॥"

বলিতে কি; আমাদের যখন কিছু কিছু জ্ঞান হয়, আর পূজ্যপাদ বৃদ্ধ মাতা-

মহের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক ও অর্থ শিক্ষা করি, সেই কালে মহাপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ গুরু মাতামহ মহাশয় ঐ কতিপয় পয়ারের অর্থ আমাদিগকে এই মত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অপরে যিনি যাহাই বলুন, "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং" বলিয়া আমাদের এতাবত তাহাই স্মরণ ও ধারণা আছে। রাজাদিগের কুট বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহারা কার্য্য-কালে, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চারি নীতির অনুসরণ করেন। ঐ কয়েকটী পয়ারের ভিতর দ্ব্যর্থভাব আছে, প্রথমতঃ ভয় প্রদর্শন, দ্বিতীয়তঃ ভ্রাতৃভাব স্থাপন। যথা ;—

" তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার ॥ "

হে, সনাতন? তুমি যাহাকে জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে বহু মান্য কর, সে একজন দুষ্ট অর্থাৎ তাহার দস্যু ব্যবহার।

" জীবপশু মারি কৈল, চাকলা সবকাশ। "

সে জীব পশু হিংসা করিয়া "চাকলা" অর্থাৎ প্রদেশ আয়ত্ত ও শেষ করিয়াছে। তুমি সেরূপ দুষ্টের হস্ত হইতে কেমনে এড়ান পাইবে? ইহা ভয় প্রদর্শন। পক্ষান্তরে তিতিক্ষা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন, তুমি সেরূপ দুষ্টকে রাখিয়া কোথায় যাইবে?

ধীসম্পন্ন, শ্রীসনাতন রাজার এই ইঙ্গিত বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, রাজা অত্যন্ত বলবান ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী, যখন এই উৎপেক্ষা ভাব প্রদর্শন দ্বারা, অর্থাৎ আমার কেহ বড় ভাই না থাকা সত্বেও যখন পারিভাষিক শব্দে নিজেরই পরিচয় দিতেছেন, তখন ইহাকে সন্তোষ ও আত্ম রক্ষা করিবার উপায় কি? এই ভাবিয়া তখনই রাজ-মর্য্যাদা স্থাপনার্থে বলিলেন ;—

" সনাতন কহে তুমি সতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যাহা দোষ করে, দেহ তার ফল ॥ "

হে গৌড়াধিপ! আপনি স্বতন্ত্র, আপনাতে ঐশ্বরিক শক্তি আছে, যে যাহা কার্য্য করে, তাহার উপযুক্ত ফল অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার অধিকন্তু আমার কিছু বলিবার নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, রাজা একে যবন, তায় হিংস্র এবং দেবদ্রোহী শ্রীসনাতনের বৈরাগ্যানুষ্ঠান দেখিয়া তাঁহার ঈদৃশ দুঃখ করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন; শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রূপলাবণ্য দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে স্বয়ং ঈশ্বর ও সকলের শাস্তা, ও তাহার উপর আর কেহই নাই, পূর্ব্বেই রাজার সে বিশ্বাস এবং সত্ত্ব গুণের উদয় হইয়াছিল। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতেঃ—

" যে হুসেণ সাহা, সর্ব্ব পড়িয়ার দেশ।
দেব মূর্ত্তি দেউল, ভাঙ্গিয়া কৈল শেষ ॥ "
" হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র, ।" ইত্যাদি

পুনঃ প্রশ্ন হইতে পারে সে কোন সময়? —যথা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়নাটকে ;—

"যখন রামকেলী গ্রামে যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ, এবং জড় প্রভৃতি, কি নীচ কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি বৈশ্য এবং যবন ও শ্বপচ প্রভৃতি একত্রিত হইয়া শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত ও নগরে অসংখ্য লোকের সমাগম ও চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনির কল্লোল তখন রাজা বিস্ময় রসে আবির্ভূত হইয়া কেশব খাঁন পাত্র সমভিব্যাহারে নিজ অট্টালিকার উপরে উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন কি, যেন সর্ব্বত্রই প্রসন্নতার মূর্ত্তি, সুখের উৎসব, প্রেমের বিলাস, আনন্দের ছাট, বিপদ নাই, মলিনতা নাই, শোক নাই, জাত্যাভিমান নাই, সেই অসংখ্য লোকের মধ্যস্থলে, শ্রীগঙ্গার উপকূলে দ্বিতীয় গঙ্গার স্বরূপ একটী নবীন সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য গীতারম্ভে অকাতরে হরিনাম প্রেম বিতরণ দ্বারা পাষণ্ড দলন ও লোক নিস্তার করিতেছেন। সেই স্বর্ণমেরু সদৃশ রূপরাশি রাজার দৃষ্টি পথে পতিত হইবামাত্র রাজা তদগত চিত্ত হইয়া চিত্র পুত্তলিকাবৎ সেই জগন্মোহন রূপ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিরভিলাষ নিস্পৃহ ভাবে দর্শন করিয়া আত্ম

হারা হইলেন। সেই কালেই তাঁহার সত্ত্ব গুণের উদয় হয়। সেই কালেই শ্রীশ্রীমহা প্রভুর সহিত তাহার সম্মিলনের ইচ্ছা হয়।

পরন্তু ;—

"বহু জন্মানী পুণ্যানী, রতিসাৎ শ্যামসুন্দরে॥"

বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় করিলে তবে শ্রীকৃষ্ণে রতি এবং সেই রতিতে ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভ হয়, এবং তদ্ভক্তকে ভগবান আত্মসাৎ করেন। রাজার সে পুণ্য ছিল না। বিবিধ পাপজনিত নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎকারণ বশতঃ রাজা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপালাভে অকৃতার্থম্মন্য হইলেন। কেবল দূর হইতে দর্শন সুখ হইল, এইমাত্র। তাহার সেই কালের মনঃক্ষোভ দরিদ্র আশাবৎ মনোমধ্যেই বিলীন হয়। পশ্চাৎ শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য চেষ্টা দেখিয়া রাজার পূর্ব্বভাব উদিত হওয়াতে শ্রীসনাতনের সঙ্গলাভ বাসনায় রাজা বহু প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীসনাতন রাজার সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। সুতরাং রাজা; শ্রীসনাতনকে কারাগারে বন্দী করিয়া উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, চাকলা শব্দে প্রদেশ, সব শব্দে "সমস্ত" "কাশ" শব্দে শেষ। যাবনিক নিকাশ শব্দ হইতেই কাশ শব্দের উৎপত্তি। বাঙ্গালা ভাষায় ইহা শেষ শব্দ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। নিকাশ শব্দটী বঙ্গভাষায় বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কার্য্যকালে "কাজ শেষ অথবা নিকাশ কর, এমন স্থলে ঐ শব্দ ব্যবহার হয়। তুরকিনামা পারস্যাভিধানে ব্যক্ত আছে ;—

"নিকাশে কার, খাস, ছুনিদা তামাম॥" ইত্যাদি

শ্রীসনাতন যখন বন্দীশালে তখন শ্রীরূপের প্রেরিত ওয়াহক সেই পত্রের লিপি সুযোগ ক্রমে শ্রীসনাতনের হস্তে সমর্পণ করেন। আর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে বন পথে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিয়াছেন, এ কথাও নিবেদন করেন।

শ্রীসনাতন শর্করখণ্ড পাইয়া শ্রীরূপের হস্তাক্ষর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু দেখিলেন, তাহার মধ্যে ৮টী অক্ষর মাত্র। অন্য কোন সংবাদ নাই। পশ্চাৎ বহুচিন্তা ও অক্ষর যোজনা করিয়া জানিলেন, মহাভাবযুক্তউপদেশপূর্ণ, একটী বিচিত্র শ্লোক।— যথা, শ্রীসনাতন বিবেকতন্ত্রে ;—

"য দু প তেঃ ক গতা মথুরা পু রী।
র ঘু প তেঃ ক গ তো ত্ত র কোশ লা।
ই তি বি চি ন্ত, কুরুষ মনঃ স্থিরং
ন স দি দ ম্, জ গ তী ত্য ব ধার য়॥"

শ্লোকটী পাঠ করিয়াই আর স্থির হইতে পারিলেন না। অশ্রুবেগ সম্বোরণ করিতে পারিলেন না। নদীর বেগ কখন কি ধরিয়া রাখা যায়? পলাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা পাদ-বন্ধন, কেমন করিয়া পলাইবেন। স্মরণ হইল, মুদি ঘরে দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত আছে। কারাধ্যক্ষকে বহু বিনয় করিয়া বিনয়ে বাধ্য করিলেন। অবশেষে তাহাকে সেই অর্থ হইতে সাত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দিয়া "দাড়ুকা" অর্থাৎ পাদবন্ধন বেড়ি মোচন করাইয়া ঈশান নামক জনৈক রক্ষক সমভিব্যাহারে "গড়িদ্বার" অর্থাৎ গৌড়ের দুর্গ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে এক প্রকাশ্য রাস্তা গিয়াছে,সেই প্রকাশ্য রাস্তায় না গিয়া রাত্রিকালে মাঝিকের সাহায্যে গঙ্গাপার হইয়া পাতড়া পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করেন। অনন্তর, সমস্ত দিবস হাঁটিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাতড়া পর্ব্বতে উপনীত হইয়া দস্যু হস্তে পতিত হন্। কথিত আছে, পার্ব্বতীয় ভুঞাজাতি পথিক পাইলে পথিকের নিকট

কি আছে, তাহা গণনা দ্বারা জানিতে পারিত। এবং অর্থ লালশায় পথিককে বিবিধ যত্নের সহিত আটক করিয়া শেষে বিষ প্রয়োগে দ্বারা প্রাণদণ্ড ও অর্থ আত্মসাৎ করিত। শ্রীসনাতন ও ঈশানকে পাইয়া জানিল, তাহাদের সহিত ৮টী মোহর আছে। তন্নিমিত্ত শ্রীসনাতনকে আবাসে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিবিধ যত্ন ও ভক্তি করেন। "অতি ভক্তি চোর লক্ষণং" রাজমন্ত্রী সনাতন তা জানিতে পারিয়া সঙ্গে কোন অর্থ আছে কি না? ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশান উত্তরে বলিলেন, ৭ টী স্বর্ণ মোহর আছে। সনাতন, ঈশানের নিকট হইতে সেই ৭ মোহর লইয়াও তদ্দ্বারা ভুঞাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া এবং পশ্চাৎ ঈশানের নিকট আর একটা মোহর আছে জানিয়া সেখান হইতেই ঈশানকে গৌড়ে বিদায় দেন। আর ভুঞাদিগকে বিনয়ে বাধ্য করিয়া সম্বলের মধ্যে একমাত্র করঙ্গ লইয়া সেই ভুঞাজাতির সাহায্যে বহু কষ্টে পর্ব্বতারণ্য পার হইয়া এবং প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই ভুঞাদিগকে বিদায় দিয়া শেষে হাজিপুর নামক গ্রামে গিয়া উপনীত হন। এই হাজিপুর গ্রাম অধুনা মজঃফরপুর ও ছাপরা জেলার মধ্যস্থিত এই স্থানের অনতিদূর শোনপুর নামক স্থানে হরিহরছত্র নামে প্রসিদ্ধ মেলা ও ঐ মেলাতে (প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে) বহু সংখ্যক হস্তী ও ঘোটকাদি বিক্রয় হয়। শ্রীসনাতনের শ্রীকান্ত নামে ভগ্নীপতি গৌড়েশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী ঘোটক ক্রয় করিবার নিমিত্ত ঐ হাজিপুরে থাকিতেন। দৈবাৎ শ্রীসনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়াতে শ্রীকান্ত শ্রীসনাতনকে পাইয়া বিশেষ যত্ন এবং কারাগার ক্লেশজনিত অত্যন্ত মলিন অবস্থা দেখিয়া ভদ্রবেশ ধারণ করিবার নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করেন। কিন্তু সনাতন সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তাঁহার প্রযত্নাতিশয়ে শীত নিবারণ হেতু কেবলমাত্র একখানি ভোটকম্বল লইয়া গঙ্গাপার ও প্রসিদ্ধ পাটনা নগরের মধ্যভাগ রাস্তা হইয়া শ্রীকাশীধামে গিয়া উপস্থিত হন এবং তত্রস্থানে উপনীত হইয়া লোক-পরম্পরায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তত্রস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন, এই কথা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীচন্দ্রশেখরের বাটীতে গমন করেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তৎসময়ে অভ্যন্তরে ছিলেন, শ্রীসনাতনের আগমন জানিতে পারিলেন। চন্দ্রশেখরকে ডাকিয়া বলিলেন, বহির্দ্বারে একটী বৈষ্ণব দাড়াইয়া আছেন, তাহাকে শীঘ্র বাড়ীর ভিতরে আন। চন্দ্রশেখর তৎক্ষণাৎ প্রভুর আদেশ পালনার্থে বহির্দ্বারে গমন করিলেন। দেখিলেন, বৈষ্ণব নাই; মলিন বসন পরিধানা, সবচুল ও শ্মশ্রু এবং করঙ্কধারী একজন দরবেশ অর্থাৎ ফকির দণ্ডায়মান আছেন। সন্দেহবশতঃ তাঁহাকে আহ্বান না করিয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া সেই অবস্থা জানাইলেন।

প্রভু তৎশ্রবণে পুনরাজ্ঞা করিলেন, তিনি দরবেশ নহেন, ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব, তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক মৎসমীপে শীঘ্র আনয়ন কর। শ্রীচন্দ্রশিখর আজ্ঞামাত্র দ্বারদেশে গমন করিয়া সমাদরপূর্ব্বক শ্রীসনাতনকে ভিতরে আনিয়া প্রভুর সহিত মিলাইলেন। প্রভু; শ্রীসনাতনকে পাইয়া করিলেন কি? শ্রীসনাতনকে ক্রোড়ে লইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিজ বহির্বাসে তাঁহার

অশ্রু সমার্জ্জন করিলেন। আর তৎক্ষণাৎ শ্রীচন্দ্রশিখরের দ্বারা জনেক নরসুন্দরকে আনাইয়া সেই নরসুন্দরের দ্বারা শ্রীসনাতনের মস্তকে শিখামাত্র রাখাইয়া এবং শ্মশ্রু ত্যাগ করাইয়া সমীচীন করাইলেন। এবং বহু শিক্ষা দিয়া পশ্চাৎ বলিলেন ;—

" তোমার শরীরে মোর, প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব, বহু প্রয়োজন ॥
ভক্ত ভুক্তি কৃষ্ণ প্রেম, ভক্তের নির্দ্ধাব্।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর, বৈষ্ণব আচার ॥
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম, সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষা ॥"

এইমত শ্রীসনাতনকে বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপের নিকট যাইতে অনুমতি করেন। তদনুসারে শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধারহেতু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপের সহিত মিলিত হন্।

এস্থলে এই কয়েকটী কথার উত্তরে বলিতে হইতেছে। (১) এখনকার সবর্তুল এবং শ্মশ্রু ও করঙ্গ এবং কন্থাধারী মৎস্য ও পলাণ্ডু ও পাস্তা অন্নভোজী, মাদক-সেবী মানবী বা পিশাচী সহযোগী কোন কোন সম্প্রদায় শ্রীসনাতন প্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া যে সমাজে পরিচয় দেয়, বস্তুতঃ তাহারা শ্রীসনাতন প্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। তাহারা দুকুলের বাহির। তাহাদের করণ কারণ ও চাল চলন দেখিলে শ্রদ্ধা হওয়া দূরে থাকুক, আপনা হইতেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। শ্রীশ্রীপ্রভু সনাতন আদৌ তদ্রূপ কোন সম্প্রদায় গঠন করেন নাই।

(২) কোন কোন সম্প্রদায় বলেন; "নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।' শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের এই পরিচয়ে তাঁহারা যবন ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন; "নীচ শূদ্র দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রচার ॥"

ইহাতেও বেশ বিবেচনা হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নীচে দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যাঁহারা এ সকল তর্ক করেন, তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিব, ইহাই বলিব যে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত অথবা ভগবানোক্ত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা কখন দেখেন নাই। কারণ গীতাতে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন ,—

" পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'

"হে পার্থ, দুষ্কৃতি জনের হস্ত হইতে সাধুগণের পরিত্রাণ হেতু (বিশেষতঃ ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত) আমি অবতার রূপ ধারণ করিয়া থাকি।" এস্থলে ইহাই বক্তব্য, কলিযুগ নিস্তারকাবতারে দুষ্কৃতি বিনাশ ব্যতীত অসুর বিনাস কার্য্য নাই। সুতরাং অনেকে অনেক প্রকার বলিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ;—

" ধর্ম্মং মহা পুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম।
ছন্নো কলৌ যম্ভব স্ত্রি যুগোঽত সত্বম ॥"

এই কলি কালে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ছন্নো ভবে অবতার রূপ ধারণ করিয়া স্বয়ং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ভক্ত দ্বারা এই ৪টী কার্য্য সমাহিত করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। যথা,

" রামানন্দ দ্বারে, কন্দর্পের দর্পনাশে।
দামোদর দ্বারে, নিরপেক্ষ পরকাশে ॥
হরিদাস দ্বারে, সহিষ্ণুতা জানাইলা।
সনাতন রূপ দ্বারে, দৈন্য প্রকাশিলা ॥
জিতেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ, সহিষ্ণুতা দৈন্য।
এ চারি অবধি ব্যক্ত, কৈলা শ্রীচৈতন্য ॥"
সনাতন রূপ দৈন্য, নাপারি বুঝিতে।
মূর্খগণ ইথে তর্ক, করে নানা মতে ॥" ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীশ্রীপ্রভু সনাতন ও শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীরূপ শ্রীশ্রীমহা প্রভুর নিকট যে পরিচয় দিয়াছিলেন, সে কেবল তাহাদিগের দৈন্যোক্তি।

বস্তুতঃ তাহারা যবন নহেন। কর্ণাট দেশীয় ভরদ্বাজ গোত্র কুলোদ্ভব যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, তাহাদের বংশাবলীর পরিচয় এই ;—

যথা, লঘুতোষনী গ্রন্থে।

"মেজে রাজ সভা সভাজিত পদ, কর্ণাট ভূমি পতি।
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদগুরু ভবি, ভরদ্বাজান্বয় গামনী॥
পুত্র স্তস্য নৃপস্য কশ্যপ তুল্য, মারোহত রোহিনী,
কাণ্ড স্পার্দ্ধি যশোভব সুরপতে, স্তুলা প্রভাবো ভবৎ॥"

*   *   *   *

"বিচার গুনি শেখর, শিখর ভূমি বাসস্পৃহাং।
স্ফুরত সুরতরঙ্গিনী তট, নিবাস পর্য্যুৎ সুকঃ
ততো দমুজ মর্দ্দন ক্ষিতি প্রপূজ্য পাদঃ ক্রমোৎ
দুবাস নবহট্টকে সকিল পদ্ম নাভঃ কৃতি।
মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজত স্তৈব সত্রোৎ সবৈ।
কন্যাষ্ঠা দশ কেন সার্দ্দম ভব স্তেতস্য পঞ্চাত্মজ
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথাশ্চ নারায়ণো।
ধীরঃ শ্রীল মুরারি রূত্তম গুণঃ শ্রীমম্মুকুন্দ কৃতী;
জাত স্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবর শ্রীমান কুমারা ভিধঃ॥"

*   *   *   *

তত্রৈব "আদি শ্রীলসনাতন স্তদমুজ শ্রীরূপ নামাততঃ"
শ্রীবল্লভ নামধেয় বলিতো নির্ব্বেদা যে রাজ্ঞতঃ।
আসা দ্যতি কৃপাঃ ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহর প্রেমাখ্যা ভক্তি শ্রিয়ি॥"

অর্থাৎ, ভরদ্বাজ গোত্রে সমুদ্ভব কর্ণাট দেশীয় রাজার প্রপৌত্র পদ্মনাভ শিখর ভূমি বাসস্পৃহা পরিহার করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিলাষে নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এবং তথায় শ্রীজগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। ক্রমে তাহার ১৮টী কন্যা এবং পুরুষোত্তম, জগন্নাথ নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ নামে ৫ সন্তান হয়। ঐ মুকুন্দের কুমার নামে এক সন্তান; তিনি অত্যন্ত ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। কোন দ্রোহ হওয়াতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সৎকুল জাত এবং সদাচারী হইয়াও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সহিত আহার ব্যবহারে মিল হয়। শেষে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কন্যার পানি গ্রহণ করেন। এবং অনেক গুলিন পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে আদি শ্রীসনাতন, মধ্যম শ্রীরূপ, কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভ। পরন্তু শ্রীসনাতনের জ্যেষ্ঠ কেহ ছিলেন না। শ্রীকুমার দেবের অবশিষ্ট পুত্রগণে অকালে কাল কবলে কবলিত হইয়াছিলেন। এখন তর্কবাদিগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এতৎ প্রমাণ দ্বারা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নিখুঁত ব্রাহ্মণ কি যবন? অপিচ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহা প্রভুর পূর্ব্বাবতারে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সি বর্গের মধ্যে শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরী ও শ্রীরূপ মঞ্জুরী নামে গোপিনী ছিলেন। যথা শ্রীগণোদ্দেশ দিপীকায়াং।

"যারূপ মঞ্জরী শ্রেষ্ঠা সুরাসী রতি মঞ্জরী,
দোষাতে নাম ভেদেন, লবঙ্গ মঞ্জরী বুধৈঃ
সাধ্য গৌর তিন্ন তনুঃ সর্ব্বারাধ্য সনাতন,
তমেব প্রাবিশং কার্য্যে মুনিঃ বর সনাতন॥"
"শ্রীরূপ মঞ্জরী খ্যাতা, যাসীবৃন্দাবনে পুরা;
সাদ্য রূপাখ্যা গোস্বামী ভূত্বা প্রকটা মিয়াং॥"

বৈষ্ণব দিকদর্শনীতে ব্যক্ত আছে ;— শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছুদিন পরেই শ্রীশ্রীপ্রভু সনাতন ১৪১০ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৭০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে ২৭ বৎসর গৃহে বাস এবং ৪৩ বৎসর ব্রজভূমে অবস্থিতি এবং মধ্যে মধ্যে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ১৪৮০ শকের আষাঢ় শুক্ল চতুর্দ্দশীতে শ্রীবৃন্দাবনের যোগধামে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে যোগপিঠে বিরাজিত শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউ তিনিই প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু রূপগোস্বামী ১৪১১ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে ২৫ বৎসর গৃহে অবস্থিতি ও ৫০ বৎসর শ্রীব্রজভূমে বাস ও মধ্যে মধ্যে নানা

তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ১৪৪৫ শকের শ্রাবণ শুক্ল দ্বাদশীতে শ্রীবৃন্দাবনধামে তিরোহিত হন। শ্রীবৃন্দাবন যোগপিঠে বিরাজমান শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউ শ্রীমূর্ত্তি তাহারই প্রতিষ্ঠিত।

শাস্ত্র বেত্তাগণ বলিয়াছেন ;—"পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনং।"

কিন্তু বৈরাগ্যধর্ম্মে দারপরিগ্রহ একবারে নিষেধ। তাঁহারা ভবিষ্যত ভাবিয়া তন্নিবন্ধন দারপরিগ্রহ করেন্ নাই। বংশ রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভ নামান্তর অনুপম জেষ্ঠদ্বয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। শ্রীশ্রীহরিভক্তি শ্রীপ্রভু প্রকাশিকা নামক গ্রন্থে ইঁহাদের অন্যান্য কাহিনী অনেক আছে। বাহুল্যভয়ে তৎপ্রকাশে বিরত হইলাম।

বৈষ্ণবদাসানুদাস শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তনিধি।
বদনগঞ্জ।

সটীক ভবিষ্যৎ মহাকাব্য।

এ মহাকাব্যের রচয়িতা কে, তাহা জানি না। কি উপায়ে আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহা কাহারও জানিবার প্রয়োজন দেখি না। আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে টীকা দিয়াছি। কবি নিজে একটী ভূমিকা দিয়াছেন, সেটি অপ্রযোজনীয় হইলেও আমি মুদ্রিত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

শ্রীমল্লিনাথ বঙ্গবাসী।

ভবিষ্যৎ মহাকাব্য।

ভূমিকা।

একটি গল্প আছে যে, একজন কাব্যরসগ্রাহী বদান্য ধনীর নিকটে, একজন লোক একটি শ্লোক রচনা করিয়া পুরস্কার লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল ; শ্লোকটি এই :— দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ। শ্লোক দেখিয়াই ধনী হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, এ কি রকমের শ্লোক? পুরস্কারপ্রার্থী কবি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মহাশয়, শ্লোকের কোন্ লক্ষণ আমার কবিতায় নাই?" ধনী কহিলেন, "মহাশয়, শ্লোকের চারিটি চরণ থাকে।" কবি :—"আজ্ঞে আমার শ্লোকে 'বিড়াল' রহিয়াছে ; বিড়াল চতুষ্পদ, সুতরাং চারিচরণের অভাব কোথায়?" ধনী কৌতুক দেখিবার জন্য হাসিয়া বলিলেন, "শ্লোকে একটা রস থাকা চাইত?" কবি :—"কেন, আমার শ্লোকে দুগ্ধ আছে, ইহা সাক্ষাৎ গব্যরস।" ধনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শ্লোকের একটা অর্থ কই?" এবার কবি হাসিয়া বলিলেন—"মহাশয় যদি অর্থ থাকিত, তবে আর আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি কেন?" ধনী এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া কবিকে পুরস্কার দান করিলেন।

আমার এ মহাকাব্যও সর্ব্বলক্ষণ যুক্ত। ইহাতে প্রলয় আছে, সৃষ্টি আছে, যুদ্ধবিগ্রহাদি আছে, রাজ বংশের বর্ণনা আছে, এবং নয়টি সর্গও আছে। তবে রস আছে কি না, সে কথা পাঠকগণ বিচার করিবেন। আর অর্থ আছে কি না, গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে আমি নিজে তাহার বিচার করিতে পারিব। অলমতি বিস্তরেণ।

১ম সর্গ।

(১)

বিধিলিপি, ভবিতব্য, কে খণ্ডাতে পারে?
কলিতলা ভূমে ঘোঁট,
মেসিন্ প্রেসের চোট,
কত ইন্দ্র চন্দ্র অষ্টবসু দরবারে *—
বসিয়া মন্ত্রিল কত,
গালি দিল মনোমত,
তবুও বিকৃত রুচি বাঙ্গালী সন্তান—
এমনি স্বভাব ধৃষ্ট,
না ভাবিল নিজ ইষ্ট,
নাহি দিল কড়ি তায় পেতে পরিত্রাণ।
ইন্দ্র পুরাঙ্গনাগণ
হেরি এই অলক্ষণ,
নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্রতে আসিয়া ধরায়,
সহরের বুক জুঁ'ড়ে
রঙ্গভূমি নিল পেতে;
বঙ্গভূমি তবু ত্রাণ ঠেলিল হেলায়।

(২)

হায় হায়, বিধিলিপি কে পারে খণ্ডাতে?
অধর্ম্মের অত্যাচার
নাহিক সহিল আর—
ক্রোধে দণ্ড নিলা দেব, বঙ্গেরে দণ্ডিতে।
আষাঢ় পহেলা দিবা,—
বরষার ঘটা কিবা,—
কড় কড়ে বজ্রনাদ, উপজয়ে ভয়;
অশ্রান্ত অনন্ত বৃষ্টি—
ভেসে যায় বঙ্গ সৃষ্টি;
অখণ্ড্য দেশের রিষ্টি, আসিল প্রলয়।

গলা গলা হল জল,
যায় বঙ্গ রসাতল;
আঁকু মাকু করি সবে উঠে গৃহ ছাদে;
কিন্তু জল ক্রমে বাড়ে,
মূল সুদ্ধ ঘর নড়ে;
পড়িল গলিয়া শেষে 'ছপ্ ছপ্' নাদে।

(৩)

ঘর বাড়ী এমারৎ কীর্ত্তি-স্তম্ভ যত,
বনরাজি পাখী পশু,
মানবের পঞ্চ অসু,
প্রলয়ের পদতলে হল অবনত।
হায়রে বরষাকালে,
উনবিংশ এক শালে,
এরূপে বাঙ্গালী বংশ ধ্বংস একেবারে।
অনিত্য এ ঘর বাড়ী
তবু এত বাড়াবাড়ী
কেন হায়! ভাবে কবি ভাসি নেত্রাসারে।
না শুনিলে উপদেশ,
এবে এই হল শেষ;
ইন্দ্রে না সঁপিয়া অথ কি ফল সে ধনে?
মরেছ, এখন আর
কিবা মিছা তিরস্কার;
পূর্ব্বে না বুঝিলে, তাই দুঃখ র'ল মনে।

(৪)

দুরন্ত প্রলয় অন্তে কিবা ছিল বাকী?
বেঁচে ছিল অর্দ্ধ লাখ
ভূষণ্ডি কুলের কাক,
কাদাখোঁচা, ছাতারিয়া এইরূপ পাখী।
কেন না মাংসের লোভে
ফের যদি পাপে ডোবে
লোভী মানবের দল; এই শঙ্কা করি—
সুধু সঙ্গীতের তরে,
রাখিলেন খাঁচা করে
উল্লিখিত পাখী-গুলি, লীলাময় হরি।

* টীকা—ইন্দ্রের সহিত অষ্টবসুর কোন পৌরাণিক সংশ্রব নাই; দ্বিতীয়তঃ দেবতাদিগের সহিত ইংরাজের আমলের মেসিন প্রেসের কথা লিখিয়া কবি আপনার অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

ভূচর আদির মাঝে,
যেকটি নিতান্ত বাজে,
তারা ছাড়া আর গুলি বাঁচিয়া উঠিল;
বিলায়ত্তি ফুল ফল
মরে গেল অজচ্ছল,
গজাল কুমুড়া, ঘেঁটু আবার ফুটিল।

(৫)

লোপ কিসে পায় আর্য্য বংশ আহা মরি,
রয়ে গেল চারি জন
নরকুলে বিচক্ষণ,
ইন্দ্র বসু দীননাথ কৃষ্ণ নাম করি। *
যোগশাস্ত্রে অধিকারী
বৈদ্যুতিক টিকি ধারী,
তাহারা মরিতে পারে? সম্ভবেনা কভু।
রঙ্গভূমে পুণ্যানারী
বঙ্গভূমে র'ল চারি;
হইলেন চারি বীর তাহাদের প্রভু।
কলিতলা গৃহ ছত্রে
জড়িত সংবাদ পত্রে,
অপূর্ব্ব পাইল রক্ষা ভারতের বেদ;
পাপে ভারি বসুন্ধরা
ডুবে বটে গেল ত্বরা,
কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষা হল আর কার খেদ?
ভনিল কবি ভবিষ্যৎ কেমনে ঈশ রোষে—
প্রলয় হইল বঙ্গে পাপ কর্ম্মে স্বদোষে। ‡
ইতি প্রলয় নামক প্রথম সর্গ।

২য় সর্গ।

প্রলয়ের ঝড় গেল থেমে;
জল গেল সাগরেতে নেমে;
নব সৃষ্টি নব বঙ্গে হইল রচন।
বেঁচে ছিল আর্য্যভাব ধারী
যেই চারি যোড়া নর নারী,
আধ্যাত্মিকভাবে তারা মিলিল এখন;
বিধাতার বিশেষ নিয়োগে
কলিতলা বীডন্ সংযোগে (১)
কিরূপে হইল সৃষ্টি কহি সংক্ষেপিয়া;
মেল্‌থাসে ব্যক্ত আছে ধারা—
কিরূপেতে আর্য্য তেজে তারা—
অচিরে মানুষে দেশ ফেলিল ছাপিয়া;
বর্ষা অন্তে নব কুশাঙ্কুর,—
করে যথা ক্ষেত্র ভরপূর,
তেমনি অসংখ্য আর্য্য উঠে গজাইয়া;
কিম্বা যথা বরষার চোটে—
আঁদাড়ে পাঁদাড়ে শত ফোটে
বেঙ্-ছাতি শির ফুলাইয়া—
পিতৃ মাতৃ ধর্ম্ম পুণ্য রাশি
সংক্রমিল সেই বংশে আসি;
লিখেছে ডার্ব্বিন্ এই তত্ত্ব বিস্তারিয়া।
সুতরাং বুঝহ সংকেতে,
কিরূপে সে নবীন বঙ্গেতে
ষোল আনা আর্য্য ধর্ম্ম বেড়াল চরিয়া।
নীরোগ হইল নারী নর,
দূরে গেল ম্যালেরিয়া জ্বর;
দূর হল যাবনিক আধি ব্যাধিচয়।
গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষা তরে
জোর করে ড্রেন্ নাহি করে;
শুধু আর্য্য তেজে ধরা হলো শান্তিময়।
কেহ আর রহিল না গাধা
বালিকা বিবাহে দিতে বাধা;
অথবা দুশমে তার ধর্ম্ম রক্ষা তরে।

টীকা—* ইন্দ্র নাম করিয়া, অথবা দীননাথ যে কৃষ্ণ তাঁহার নাম করিয়া উদ্ধার পাইল, এরূপ অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু 'বসু' কেন? অষ্টবসুর নাম করিয়া কোন কার্য্য হইবার তো প্রথা নাই?

‡ দেখিতেছি মালিনী ছন্দে সর্গভঙ্গ করা হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালায় সংস্কৃত ছন্দ কেন? আর যদি সংস্কৃতের অনুকরণ করা হইয়া থাকে, তবে আর দুখানি চরণ কোথা?

(১) বীডন্ অর্থ কি?

পুরুষ লইল বহু নারী,
বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ভারি ;
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি হ'ল ঘরে ঘরে।
নিষেধ করে না আর কেউ—
বাঘের পশ্চাতে যথা ফেউ—
আধ্যাত্মিকভাবে যেতে বেশ্যা রঙ্গভুমে।
যে যাহার নিজ মনোমত
হইল আমোদে সদা রত ;
শিহরি রহিল দেশ উৎসবের ধূমে।
প্রলয়েতে হয়েছিল সাফ্—
নাহি ছিল রেল্ টেলিগ্রাফ্—
যোগ বলে এবে শুধু সব কার্য্য হয় ;
সূক্ষ্ম দেহে যায় শূন্যে উড়ে—
প্রবেশে পাতালে ভুঁই ফুঁড়ে—
আর্য্যকীর্ত্তি আর্য্য তেজ জগতে অক্ষয়।
নির্ত্য মধুর্নাস ময় বঙ্গ মরি হেইইল
ঘেঁটু ফুল কাকফুল চারিদিক ছাইল।
পুণ্যময় দেশ ভরি আর্য্যদল ভাতিল ;
ছন্দময় কাব্য কবি যত্ন করি গাঁথিল।
(ইতি সৃষ্টি নামক ২য় সর্গ।)

৩য় সর্গ।

হলত বিপুল সৃষ্টি ; তখন লোকের দৃষ্টি
পড়ে গেল সুতীক্ষ্ণ বিচারে ;
"মাথা শূন্য নহে কেশ, রাজা শূন্য নহে দেশ,
রাজা তবে বল কবি কারে ?
"আইনেতে অধিকার, সব চেয়ে সেরা যার,
আমাদের সেই রাজা হবে ;
"ইন্দ্র নাম দিয়ে তায়, রাজ ছাপ মেরে গায়
বসাইব" মন্ত্রিন সরবে।
গুণের বাছনি করি, রাজা সবে নিল ধরি ;
রাণী তাঁর পরমা সুন্দরী—
সঙ্গীতের আলাপনে, নৃত্য গীতে একমনে,
পূর্ব্বে ছিল বীডন কিন্নরী।
দুই জন (?) করে ঘর (১) রাজা রাণী একত্তর,
কিন্তু এক বিপত্তি ঘটিল :—
সবারি বংশের ক্রম, বেঙের বেঙাচি সম,
একা শচী পড়িয়া রহিল।
গোধন চরাল শেষে, মাঠে ঘাটে দেশে
দেশে (২)
কেমনে কি হল নাহি জানি,
আর কিছু দিন পরে, আঁচাআঁচি পরস্পরে
পাড়া শুদ্ধ শেষে কাণাকাণি ;
শেষে কথা স্পষ্ট খোলা, কিন্নরী ধরিল খোলা
পোড়ামাটি ইত্যাদি যাবৎ।
হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচে সবে, পূর্ণদেশ মহোৎসবে ;
কেটে গেল প্রকাণ্ড আপৎ।
রক্ষিতে সে মহাবংশ, সর্ব্বলোক পাল অংশ,
তিল তিল হয়েছিল জড়,
তাই বুঝি হল তার, অতিশয় গুরু ভার,
প্রজার আনন্দ তাহে বড় (৩)
শেষে তিনমাস পরে (৪) পবিত্র আর্য্যের ঘরে
জন্মে শিশু পুত্র মনোহর—
কিবা চক্ষু কিবা নাক, কিবা তার হাঁক ডাক,
কিবা মুখ কিবা ওষ্ঠাধর।
জন্মমাত্রে কাঁদে নাচে, লাফাইয়া উঠে গাছে,

---

(২) সর্গভঙ্গের শ্লোক হ্রস্ব দীর্ঘ করিয়া পড়িবার জন্য কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

টীকা—(১) 'দুইজন' এই কথার পর প্রশ্ন চিহ্ন কেন ? কবি punctuation জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

(২) এস্থানে সম্পূর্ণ রঘুবংশের অনুকরণ

(৩) গোধন চরাণ হইতে এ পর্য্যন্ত ভয়ানক অনুকরণ কাণ্ড; মহাবংশ রক্ষার জন্য লোক পালাদি অংশের কথা রঘুবংশে এইরূপ আছে।

(৪) তিন মাস পরে, ইহা অসম্ভব; কবি সবই জল্দি জল্দি সারিয়াছেন।

কণ্ঠাগ্রে ভারতী খেলা করে
হাতে দিয়ে করতালি, মাতাকে বলিত **(৫)
হাসে মাতা প্রফুল্ল অন্তরে।
দিনক্ষণ বুঝে সুখে, আধ্যাত্মিক গ্রন্থ খুঁজে,
নাম তার দিল কাল্লচাঁদ।
যোগীন্দ্র তাহার পায়, লুটাইয়া বলে হায়
আজি মোর ঘুচিল বিষাদ।
একি রত্ন গাছে ফলে? দীর্ঘ তপস্যায় ফলে,
সবারি অংশেতে আমাদের—
স্বর্গে না খুঁজিলে মেলে, জনমিল হেন ছেলে,
পবিত্র বংশেতে রাজাদের।
না হইতে দশ পার, দশ বিয়ে হল তার;
দ্বাদশেতে দ্বাদশ সন্তান;
ক্রমে বংশ হল তাজা, শেষে সেই হ'ল রাজা;
বাণপ্রস্থে ইন্দ্র তিরোধান।
ইন্দ্র-শ্রাদ্ধ প্রচুর করিয়া সোম নামা সুধাতে,
নৃত্যে গীতে গৃহ অবিরত শুভিয়া সপ্ত রাত্রি;
আষাঢ়েতে প্রথম দিবসে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত
হোলো পুত্র; প্রলয় গণনে ষোল বর্ষের
অন্তে। (৬)
ইতি অভিষেক নামক তৃতীয় সর্গ।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (৭)

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যবস্থা-ঘটিত উন্নতি।

কৃষকদিগকে অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য কিরূপ সরকারি বন্দোবস্ত হইতে পারে, ইহাই এই অধ্যায়ে বিচার করা যাইবে। এ বিষয়ে যে কোন সরকারি বন্দোবস্ত নাই, একথা বলিলে ভুল হয়। ১৮৭৯ সালের ১০ আইন ও ১৮৮৪ সালের ১২ আইন ভারতবর্ষের উত্তরাংশের কৃষকদিগকে অল্প সুদে ঋণ দিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্যই প্রবর্ত্তিত হয়। স্থান বিশেষে এই আইনের সাহায্যে অনেক উন্নতিও হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই আইন অনুসারে ঋণ দান বা ঋণ গ্রহণ করা প্রায় কুত্রাপি প্রচলিত হয় নাই। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী কমিসনরের উপর ঋণদানের ভার আপাততঃ অর্পিত। তাঁহাদের কাজ এত অধিক যে, এই আইনানুসারে কৃষকদিগের উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইলে পাছে তাঁহাদিগের কার্য্য অনেক বাড়িয়া যায়, এই কারণে তাঁহাদিগের এই উন্নতির প্রশ্রয়ের প্রতি অনাস্থা। কৃষকেরাও আইনানুসারে জামিনের যোগাড় করিতে অর্থ ব্যয় হইবে, ঋণ পাইতে অনেক বিলম্ব সহিতে ও হাঁটাহাঁটি করিতে হইবে, এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া, গবর্ণমেন্টের নিকট বার্ষিক শতকরা ৬।০ সুদে ঋণ লওয়া অপেক্ষা, দেড়া সুদে অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা ৫০্ টাকা সুদ হিসাবে মহাজনের নিকট বীজ লওয়া বা আহারের চাউল ফুরাইলে ধান্য লওয়াই ভাল, এইরূপ স্থির করে। যে আইনের কথা উল্লেখ করা হইল উহা যে কেবল কৃষকদিগের বীজের মূল্য পাইবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, এমন নহে। এই আইনের উপর নির্ভর

(৫) * * চিহ্নের অর্থ কি? এ কি বিদ্রূপ না বিকল্প? যাহাই হউক কিছুই হয় নাই; বিদ্রূপ ফোটে নাই, বিকল্প হয় নাই।

(৬) কবি বলেন, এটা মন্দাক্রান্তা বৃত্ত।

করিয়া কৃষকগণ, পুষ্করিণী বা কূপ খনন ও পঙ্কোদ্ধার' করিবার জন্য, বন্যা হইতে জমী রক্ষা করণার্থ বাঁদ দিবার জন্য, লাঙ্গলের বলদ কিনিবার জন্য, এবং কৃষি ব্যবসায় চালাইতে গিয়া অন্যের নিকট যে ঋণ আছে, তাহা পরিশোধের জন্য, গবর্ণমেণ্টের নিকট যথেষ্ট জামিন দিয়া ঋণের জন্য আবেদন করিতে পারে। বাস্তবিক এই আইনানুসারে যদি কার্য্য করিবার কোন সুবন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে দেশের কৃষকদিগের সমূহ উপকার দর্শে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যেমন গ্রামে ২ এক জন পাটওয়ারি ছিল, সেইরূপ পাটওয়ারী বা কানুনগো প্রত্যেক গ্রামের বা কয়েকটী গ্রাম সমষ্টির তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইবাব কথা পুনরায় উত্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, এ সম্বন্ধে আইনেব পাণ্ডুলিপি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। কার্য্যে পরিণত হইলে এবং কৃষিকার্য্যে সহায়তায় সম্যক প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে এই আইন দ্বারা যে কৃষকদিগের উন্নতি কল্পে একটী সুন্দর ভিত্তি স্থাপিত হইবে, এরূপ আশা আছে। এই আইনের দ্বারা জমীর যেরূপ বন্দোবস্তের কল্পনা হইতেছে, সেই বন্দোবস্তের ভার গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের উপরই অর্পিত। কৃষি ও ভূম্যাধিকার বন্দোবস্ত এক বিভাগের উপর ন্যস্ত হওয়াতে, কানুনগোগণের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য ঋণ দান করা সুবিধা হওয়া সম্ভব। ঋষিগণ যাহাতে কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধারণের মধ্যে থাকে, ইহা ডাক্তার ভল্‌কার সাহেবেরও মত।

গবর্ণমেণ্টেরও ক্ষতি না হয়, অথচ সহজে অনেক কৃষক ঋণ পায়, কানুনগোগণের সহিত একটী কমিসন বন্দোবস্ত হইলেই ইহা নিষ্পন্ন হইবে। স্থানীয় লোক জামিন দিয়া কানুনগো নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বিনা মোকদ্দমায় কানুনগোগণ যত টাকার ঋণ নিয়মিত সময়ের মধ্যে সুদশুদ্ধ আদায় করিয়া দিতে পারিবে, সেই টাকার উপর শতকরা ॥৹ আনা করিয়া কমিশন পাইলে, উহারা ঋণদান ও আদায়, উভয় বিষয়েই যত্নবান থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত বন্দোবস্তী ডেপুটি কলেক্টাররাও স্থানীয় তদারকের দ্বারা সর্ব্বদাই জানিতে পারিবেন, ঋণ দান কার্য্যে উৎকোচের প্রাদুর্ভাব আছে বলিয়া কৃষকগণ কানুনগোর নিকট ঋণ না লইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় মহাজনদিগের নিকটই অত্যধিক সুদে ঋণ লইতে উৎসুক কি না? ঋণের টাকা কৃষকের হস্তে অর্পণ ও ডেপুটীকালেক্টরের সম্মুখে হওয়া কর্ত্তব্য। কৃষিঋণ দান ও আদায় কানুনগোদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ থাকিলে, এ কার্য্য নিশ্চয়ই সুচারুরূপে চলিবে, এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য হইলে বৃথা লেখালিখি ও হাঁটাহাঁটি আবশ্যক হইবে না। জামিন সম্বন্ধেও নিয়ম শিথিল হওয়া আবশ্যক। সিকিভাগ না বসাইয়া প্রায় কেহ জামিন হইতে রাজি হয়েন না। কানুনগো আবশ্যক বোধ করিলে কৃষকের জামিন না লইয়া ঋণ দানে সম্মতি দিবে না, এইমাত্র নিয়ম থাকিলেই যথেষ্ট;

ঋণ সম্বন্ধে আর একটু ব্যাপক নিয়ম হইলে ভাল হয়। কেবল গ্রামের কৃষকগণই ঋণ পাইবে, শিল্পীগণ পাইবে না, এরূপ নিয়মে সকল প্রজার সমান সুবিধা হইল না। শিল্পীগণ কৃষকদিগের অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চ শ্রেণীর লোক বটে,

কিন্তু তাহারাও মহাজন-প্রপীড়িত। গ্রাম্য শিল্প সমুদয় মহাজনের দৌরাত্ম্যে ক্রমশঃ নির্ব্বাপিত প্রায়। দেশীয় তন্তুবায় যে বিলাতি কাপড়ের দরে দেশী কাপড় বিক্রয় করিতে পারেনা, এমত নহে, কিন্তু মহাজনের সুদ দিয়া ও তাঁহাকে বিনালাভে অর্থাৎ বিলাতি কাপড় অপেক্ষাও সুলভ মূল্যে কাপড় বিক্রয় করিয়া যে কাপড় তাহার অবশিষ্ট থাকে, তাহা অন্যকে অধিক মূল্যে বিক্রয় না করিলে বেচাবার অন্নই জুটিয়া উঠা দায়। উদাহরণ স্থলে মুরশিদাবাদ জেলার একজন প্রধান রেশম তন্তুবায়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মির্জ্জাপুরের প্রধান তন্তুবায় মৃত্যুঞ্জয় সরকার এক মহাজনের নিকট ৮০০৲ টাকা ও অন্য এক মহাজনের নিকট ৩০০৲ টাকা ঋণী। ৮০০৲ টাকার জন্য বাৎসরিক শতকরা ১৮৲ টাকার হারে ও ৩০০৲ টাকার জন্য ২৪৲ টাকার হারে তাহাকে সুদ দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ধনী মহাজন দ্বয়ের যখন যে রেশম কাপড়ের বরাত হইবে, মৃত্যুঞ্জয়কে খরচা মাত্র পোষাইয়া তাহা যোগাইতে হইবে। রেশম কাপড়ের দুর্মূল্যতা ও অবশ্যম্ভাবী হীনাবস্থায় ঋণ যেরূপ একটী প্রধান কারণ, অন্যান্য শিল্পেরও দুরাবস্থার প্রায় সেই কারণ। কৃষক ও শিল্পীদিগের অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ হইলে যে দেশের আবস্থা কত পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা বলা যায় না।

জমির বন্দোবস্ত করিবার ও হিসাব রক্ষার জন্য যে সকল কানুনগো নিযুক্ত হইবে, তাহাদিগের জমির জরিপ জমীদার ও কৃষক সংক্রান্ত আইন ও কি কি উপায়ে জমির উন্নতি সাধন হয়, এই সকল বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা দিয়া পরে নিযুক্ত করা উচিত। তাগারি, বৃক্ষরোপণ, গাছে কীটলাগা নিবারণ, শস্যরক্ষা, জমীর সার, প্রভৃতি কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে মুদ্রিত প্রবন্ধ কানুনগো আপিসে বিক্রয়ার্থে থাকা আবশ্যক। কৃষকগণ সহসা সাহস করিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসে যাইতে পারে না, কিন্তু কানুনগো আপিসে কৃষকদের উন্নতির নানা উপায় হইলে, সেই সকল উন্নতি কৃষকগণ অনায়াসেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিবে। আপাততঃ ব্যবস্থা সত্ত্বেও অনেক কৃষক ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে।

১৮৮৪ সালের ১২ আইনের ৬ধারা অনুসারে গ্রামের সমুদায় লোক একত্র হইয়া যাহাতে কোন সাধারণ উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণের জন্য আবেদন করিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী গ্রামের সাধারণ উন্নতি সমুদায় জমী দারেরই কর্ত্তব্যের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট; সাধারণ উন্নতি সাধন দ্বারা জমীদারও আইনানুসারে প্রজার নিকট অধিক হারে খাজনার দাবি করিতে পারেন। গ্রামের স্বাস্থ্যহানি বা কৃষি বিভ্রাট নিরাকরণার্থ নানা প্রকার অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। এই সমুদায় অনুষ্ঠান কার্য্য কিরূপে পরিণত করা যাইতে পারে, ইহার বিবরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। কানুনগো আপিসে এই সকল পুস্তিকা বিক্রয় হইলে কৃষকদিগের এই সকল উন্নতি সাধনের দিকে নিশ্চয়ই ক্রমশঃ আস্থা জন্মিবে। জমীদারের নিকট আবেদন করিয়া নিষ্ফল হইলে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ লইয়া কানুনগো ও গবর্ণমেণ্টের এঞ্জিনিয়ার দ্বারাই একের পর অন্য উন্নতি কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। উল্লিখিত ১২ আইনের

৬ ধারা বাঙ্গালা দেশে প্রযুজ্য না হইলেও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে প্রযুক্ত হইতে পারে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ না হয়, অথচ জমীদারের অনাস্থা সত্ত্বেও গ্রামের স্বাস্থ্য বা কৃষিকার্য্যের হানি নিবারণের উপায় হয়, এরূপ বন্দোবস্ত তাগাবি ঋণ দ্বারা অনায়াসেই হইতে পারে। কানুনগো আপিসে সাধারণ ঋণের জন্য আবেদন হইলে,ঐ আবেদন বন্দোবস্তী ডেপুটী কালেক্টরের আপিসে কানুনগো দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় সমেত দাখিল হওয়া কর্ত্তব্য। বন্দোবস্তী ডেপুটী কালেক্টরের ঋণ দেওয়া অভিপ্রেত হইলে, তিনি জমিদারের কাছারিতে অমুক তারিখে অমুক গ্রামে অমুক সাধারণ কার্য্যের জন্য জমিদার কোন বন্দোবস্ত না করিলে প্রজাদের ঋণ দেওয়া হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখে জমীদারের লোক আসিয়া ছয় মাসের মধ্যে প্রার্থিত উন্নতি জমীদার দ্বারা সাধিত হইবে, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে প্রজাদিগের ঋণ দেওয়া স্থগিত থাকিবে। জমীদার অর্থাভাবে এই উন্নতি সাধনে অশক্ত এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইলে এবং জমিদার তাগাবি ঋণ লইতে সম্মত থাকিলে জমিদারকেই ঐ ঋণ দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ হইবে না; অথচ জমিদার তাগাবি করিয়া প্রজাদের যে স্থায়ী উন্নতি করিবেন, তজ্জন্য যে অধিক হারে প্রজার নিকট খাজনা প্রাপ্য, তাহাও তিনি পাইতে পারিবেন। যে খানে জমীদারের অনাস্থা বশতঃ প্রজারা ঋণ লইয়া নিজেদের উদ্যোগে গ্রামের কোন স্থায়ী উন্নতি করিবে,সেখানে জমীদার প্রজাদিগের কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না,এরূপও নিয়ম হওয়া উচিত। এরূপ হইলে প্রজা ও জমীদার উভয় পক্ষেরই গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে এবং উভয় পক্ষেরই স্থায়ী উন্নতি সাধনের সহিত স্বার্থ জড়িত থাকায় দেশের স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নতির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য প্রত্যেক বন্দোবস্তী ডেপুটীকালেক্টর প্রতিবৎসর এত টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দান করিতে পারিবেন, এইরূপ একটা নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। আপাততঃ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কৃষি ঋণ দানের বন্দোবস্ত করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। প্রত্যেক জেলার জন্য তাগাবির পৃথক্ বজেট নাই,এবং তাগাবি না দিলে ম্যাজিষ্টেটদিগের এক্ষণে কিছুই দুর্ণাম হয় না। বন্দোবস্তী ডেপুটীকালেক্টরদিগের দ্বারা দেয় তাগাবির বজেট হইলে এবং ঐ বজেট অনুসারে কোন কাজই না হইলে, তাঁহাদের জবাবদারী হইতে হইবে।

কৃষকগণ এক্ষণে প্রায় বীজ ক্রয়ের জন্যই মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক স্থলে মহাজনগণ টাকা না দিয়া বীজের শস্য ঋণস্বরূপ কৃষকদিগকে দিয়া তৎকালীন বীজের যে মূল্য, তাহাই ঋণের টাকা বলিয়া ধার্য্য হয়। শস্য উৎপন্ন হইলে ঐ টাকায় যত নূতন শস্য ঐ সময় পাওয়া যায়,ও সুদের পরিবর্ত্তে আরও এক চতুর্থাংশ পরিমাণ শস্য কৃষকের নিকট গ্রহণ করেন। শস্য যদি দৈবাৎ মারা যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত বীজের মূল্য ও তাহার এক চতুর্থাংশ ঋণ ধার্য্য হইয়া ইহার পরে আবার শস্যোৎপাদন কালে ঐ ঋণের জন্য সুদ সহ টাকা বা শস্য কৃষককে দিতে হয়। মহাজনগণ

ঋণ পরিশোধের জন্য কৃষককে পীড়াপীড়ি করেন না। অদূরদর্শী কৃষকও ঋণ পরিশোধে তাদৃশ ব্যগ্র না হইয়া ফসল উত্তম হইলে অন্য প্রকার ব্যয়ে অধিক তৎপর হয়। এরূপ অবস্থায় অনেক কৃষকই মহাজনের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কানুনগোও, মহাজনের পরিবর্ত্তে কৃষকগণকে সময়ে যাহাতে বীজ দিতে পারেন ও টাকার পরিবর্ত্তে শস্য কর্ত্তনের সময় যাহাতে শস্য লইতে পারেন, এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। বীজ দান দ্বারা কৃষি-বিভাগ কৃষকদিগের বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারেন। বীজের গুণে বা বীজের দোষে শস্যোৎপাদনের বিশেষ তারতম্য হয়। একই জমীতে একই কালে এক প্রকার ধান্য, গোধুম বা আলুর বীজ হইতে অধিক পরিমাণ ফসল ও অন্য প্রকার বীজ হইতে অল্প পরিমাণ ফসল হয়। কোন প্রকার বীজ ব্যবহার দ্বারা অনাবৃষ্টিতে অধিক ক্ষতি হয় না, আবার কোন প্রকার বীজ ব্যবহার দ্বারা অতি বৃষ্টিতে অধিক ক্ষতি হয় না। কোন্ কোন্ ভূভাগে কোন্ কোন্ প্রকার বীজ ব্যবহার দ্বারা অধিক পরিমাণ ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কৃষি-বিভাগের পরীক্ষা সমূহের ইহাই একটী মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। পরীক্ষার ফল অনুসারে কানুনগোগণও বুঝিতে পারিবেন, কোন্ কোন্ জাতীয় বীজ তাঁহাদের নিজ নিজ তত্ত্বাবধানের অধীনস্থ গ্রামপুঞ্জের জন্য উপযোগী। উপযুক্ত বীজের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ এলাকার মধ্যে কৃষি কার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন। অন্ততঃ কানুনগোগণ কৃষি বিদ্যালয়ে ও পরীক্ষা-ক্ষেত্রে শিক্ষিত হইলে ও তাঁহাদের সহিত কৃষি বিভাগের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রক্ষিত হইলে, তাঁহাদের দ্বারা যে গ্রামে গ্রামে কত প্রকার উন্নতি করা যাইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। লেফ্‌টেনেণ্ট পোগ্‌সন্ তাঁহার ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে এই মত বারম্বার প্রকাশিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষা ক্ষেত্রগুলি প্রজাদিগের ব্যবহারের উৎকৃষ্ট বীজ প্রস্তুতের জন্যই প্রধানতঃ রাখা কর্ত্তব্য। ডাক্তার ভলকর সাহেবও গবর্ণমেণ্টকে মহাজনের পরিবর্ত্তে প্রজাকে বীজ যোগাইবার ভার লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধারণে যে কয়টী পরীক্ষা ক্ষেত্র আছে, সেগুলি উদ্দেশ্য-বিহীন বলিলেও বলা যায়। কানুনগো-আপিসে কৃষকগণ বীজের জন্য আবেদন করিলে, ঐ আবেদন বন্দোবস্তী ডেপুটী কালেক্টর ও কৃষি বিভাগের কর্ত্তার অনুমতি ও আদেশ ক্রমে গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত কোন একটা বীজ-প্রস্তুতের ক্ষেত্রের অধ্যক্ষের নিকট দাখিল হওয়া উচিত। নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের জন্য বিশেষ উপযোগী যদি কোন প্রকার বীজ ক্ষেত্রাধ্যক্ষের নিকট মজুত থাকে, তবে তিনি সেই বীজ কানুনগোর নিকট প্রেরণ করিবেন, নতুবা স্থানীয় বীজ তাঁহার শস্য-ভাণ্ডার হইতে দিতে অনুরোধ করিবেন।

প্রত্যেক কানুনগো-আপিসে এক একটী শস্যভাণ্ডার থাকা কর্ত্তব্য। তাগাবি ঋণ পরিশোধের জন্য কৃষকগণের পক্ষে শস্য কর্ত্তনের সময় শস্য দেওয়াই সুবিধা। সেই শস্য অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়া কৃষকগণ টাকা হাতে পাইলে প্রায় ব্যয় করিয়া ফেলে। কৃষকগণ এখনও অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার ও

ঋণ পরিশোধের আবশ্যকতা শিক্ষা করে নাই। তাহাদের বীজ আবশ্যক হইলে বীজ ক্রয় করিবার জন্য অর্থ ঋণ স্বরূপ না দিয়া বীজ দেওয়াই ভাল। পরিশোধ কালেও তাহারা যদি অর্থ না দিয়া বীজের মূল্য ও নির্দ্দিষ্ট কুলিদের অনুরূপ শস্য দেয়, তবে তাহাই লওয়া কর্ত্তব্য। এই সমস্ত শস্য এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত কানুনগো আপিসে উপযুক্ত ভাণ্ডারে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ শস্য রক্ষার পাঁচটী উদ্দেশ্য (১) পুরাতন চাউল, গোধুম, ছোলা প্রভৃতি নূতন চাউল, গোধুম, ছোলা প্রভৃতি হইতে সহজে পরিপাক হয়। মহাজন কর্ত্তৃক নূতন চাউল প্রভৃতির ক্রয় ও রপ্তানি এত বৃদ্ধি হইযাছে যে, পুরাতন চাউলাদি এক্ষণে বাজারে পূর্ব্বের মত সহজে পাওয়া যায় না। কানুনগো-আপিস হইতে সর্ব্বত্র এক বৎসর পুরাতন করিয়া শস্য বিক্রয়ের নিয়ম হইলে বাজারে পুরাতন শস্য পুনরায় সহজে পাওয়া যাইবে। (২) নূতন চাউলাদি অপেক্ষা পুরাতন চাউলাদির মূল্য অধিক। শস্য এক বৎসর ভাণ্ডারে রাখিয়া বিক্রয় করিলে, বোধ হয়, কানুনগো আপিস সংরক্ষণে গবর্ণমেণ্টের যত ব্যয় হইবে, সমস্তই উঠিয়া যাইবে। (৩) শস্য সমুদায়ের রপ্তানি বৃদ্ধি হওয়ায় গোলাজাত করিয়া শস্য রাখার প্রতি কৃষকদিগের আর পূর্ব্বের মত আস্থা নাই। এক্ষণে দেশের সর্ব্বত্র যদি ভাল ধান হয় ও কেবল একটী স্থানে মাত্র ধান ডুবিয়া বা জ্বলিয়া যায়, তখনই সেই স্থানের কৃষকগণের অন্নকষ্টে হাহাকার পড়িয়া যায়। কানুনগো আপিসে যদি এক বৎসর শস্য রাখিয়া বিক্রয় করার নিয়ম হয়, তবে দৈব দুর্ব্বিপাকে এইরূপ স্থানীয় অন্নকষ্টের বিশেষ লাঘব হয়। কৃষকগণ এরূপ অবস্থায় সরকারি শস্যভাণ্ডার গুলি হইতে উপযুক্ত মূল্যে বীজের বা আহারের জন্য শস্য ক্রয় বা ঋণ করিতে পারে। অন্নকষ্ট নিবারণ জন্য সরকারি শস্য-গোলা সকল স্থাপনের প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল হয়। (৭) সাধারণতঃ প্রজারা বীজের জন্য ঋণ লইতে আসিলেই কানুনগো পূর্ব্ব-কথিত মত পরীক্ষা ক্ষেত্রের অধ্যক্ষের অভিপ্রায় অনুসারে বীজ-শস্য-ভাণ্ডার হইতে প্রজাদিগের বীজ ঋণ স্বরূপ বিতরণ করিবেন। (৪) শস্য কীটের উপদ্রব হইতে কিরূপে সুনিয়মে রক্ষা করিতে হয়, এই সকল সরকারি শস্য-ভাণ্ডার এবিষয়ে শিক্ষা-স্থল হওয়া কর্ত্তব্য। কৃষক যদি কীট বীজের শস্য নিজেই রক্ষা করিতে পারিত, তবে সে মহাজনের উপর তাদৃশ নির্ভর করিত না। বীজের শস্য না রক্ষা করিতে পারাই তাহার মহাজনের নিকট যাওয়ার এক প্রধান কারণ। ধান্য ও মাসকলাই রক্ষা করা তাদৃশ কঠিন নহে। ডাউল, গোধুম, ভুট্টা, ছোলা, পেয়াজের বীজ প্রভৃতি কতক গুলি শস্য কৃষকগণ প্রায় রক্ষা করিতে পারে না। কার্ব্বণ বাইসালফাইড ব্যবহার দ্বারা কিরূপে সকল শস্য অতি সহজে ও স্বল্পব্যয়ে কীট হইতে রক্ষা করা যায়, সরকারি শস্যের ভাণ্ডারগুলি ইহারই আদর্শ হইবে। গবর্ণমেণ্ট মহাজনের স্থলাভিষিক্ত হইয়া কৃষককে বীজ দান করেন, ইহা ডাক্তার ভলকার সাহেবেরও অনুরোধ।

আমাদের দেশের কৃষকগণ যে ইংরাজ রাজত্বকালে অধিক ঋণগ্রস্ত বা হীনাবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বলা আমার অভিপ্রায় নহে। কৃষকশ্রেণীর যে ইংরাজ রাজত্ব

কালে উন্নতি হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষকদিগের ঋণগ্রহণ প্রথা যে হিন্দু রাজত্বকালেও বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ মনুসংহিতার অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ইংরাজিকারের প্রথমাবস্থায়ও যে কৃষকদিগের এই দশা ছিল, তাহারও প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত মিসনরি ডাক্তার কেরি যখন ভারতবর্ষীয় কৃষি উদ্যান সমিতি (Agricultural and Horticultural Society of India) স্থাপন করেন, তখন কৃষকদিগের উত্তমর্ণ হইতে মুক্ত করা তাঁহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষণে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নূতন প্রকারের শস্যের বা ফুলের বীজ ও ফল ও ফুলের চারা বিতরণই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে যে উপকার হইতেছে না, তাহা নহে, তবে প্রকৃত কৃষকদের উপকারের জন্য এক্ষণে যে বিশেষ কোনই বন্দোবস্ত নাই, তাহা স্থির। ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ জন লোকেরও অধিক কৃষিজীবী। ইহাদের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট সদুপায় সকল কার্য্যে পরিণত করিবাই যে মমতারূপ সুদৃঢ় শৃঙ্খলে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্থায়ীরূপে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবেন, ইহা লর্ড লিটন্ প্রভৃতি শাসনকর্ত্তা সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রজাহিতের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে নানা ব্যবস্থা ও নানা উদ্যোগ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে।

কৃষকগণ এত দরিদ্র, অজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী যে, তাহারা নিজের হিত নিজে কখনই করিতে পারিবে না। পদে২ তাহাদের সাহায্য করা আবশ্যক। ঋণ সম্বন্ধে কৃষকদের যে ঔদাস্য, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ফসল ভাল হইলে কৃষকদের হাতে হটাৎ সময় সময় অনেক অর্থ আসিয়া পড়ে। প্রথমেই সেই অর্থ হইতে ঋণ পরিশোধ না করিয়া, তাহারা গ্রামের দলাদলী, মোকদ্দমা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, ইত্যাদি নানা ব্যপদেশে অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলে, শেষ তাহাদের হাতে মহাজনকে সুদ দিবার টাকা পর্য্যন্ত থাকে না। স্বার্থপর মহাজনেরও লোভের পরিসীমা নাই; চৈতালী ধন্দ কাটিবার পরে কৃষক যদি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিল, অগ্রহায়ণী ধান কাটিবার পরে করিবে; এ বৎসর পরিশোধ করিতে না পারে, আগামী বৎসর করিবে, এইরূপ তাহারা ভাবে। ঋণদান ও আদায়ের ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিলে, পরিশোধ কালে এরূপ শিথিলভাব কৃষকের বা কানুনগোর হইবার উপায় নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না হইলে কৃষক ও কানুনগো উভয়েরই ক্ষতি। ফলতঃ মহাজনের উদ্দেশ্য যেন কৃষকগণ চিরকাল ঋণী হইয়া থাকে, গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যেন তাহারা লইয়া কৃষকগণ শীঘ্র ঋণের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে। ক্রমশঃ

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

৺ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বন মাঝে কত তরু চারু ফুল ধরে,
ভাবগ্রাহী পথিকের মন মুগ্ধ করে।
নগরবাসীরা কিন্তু, অহঙ্কার ভরে,
বন ফুল বোলে তার আদর না করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে এখন ভারত আলোকিত। ইংরাজীতে যাঁহারা কৃতবিদ্য, তাঁহারাই এখন দেশ-মান্য ও সম্মানিত। অমুক ব্যক্তি কৃতবিদ্য, এই কয়েকটী

কথা শুনিবামাত্র লোকের মনে ধারণা হয় যে এ ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী। ইংরাজী না জানিলে যে কেহ কৃতবিদ্য হয়, ইহা যেন কাহারো মনে স্থান পায় না। কোট পেণ্টুলনধারী ব্যক্তিই আজ কাল সভ্য। তাঁহারই বর্ত্তমান সময়ে সমধিক সম্মান; শিখাধারী ফোটাকাটা ভট্টাচার্য্য এখন অসভ্য, তাঁহার সম্মান এখন কে করে? বড় লোকের উদ্যানে প্রস্ফুটিত ফুলের কত সমাদর। তাহার শোভা দেখিয়া ও সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া লোকে বিহ্বল। কিন্তু বনফুল, শোভা ও সুগন্ধের আধার হইলেও, তাহার আদর অল্প লোকেই করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে কত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের আখ্যা "টুলোপণ্ডিত।" ইহাতেই বুঝা যায়, লোকের কাছে তাঁহাদের কত সমাদর। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিক্ষকদের কত আদর। কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে লোকে সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় দেয়। ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করে। এবং এই সকল ব্যাপার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়া চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহোদয়গণ ইংরাজী শিক্ষকদিগের অপেক্ষা বিদ্বান ও সদ্গুণান্বিত হইলেও, তাঁহাদিগকে এবম্প্রকার ভাবে সম্মানিত হইতে দেখা যায় না। আমাদের দেশের অধ্যাপকগণ নিঃস্বার্থভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা ছাত্রগণকে অতি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করান। তাহাদের নিকট হইতে অর্থ লওয়া দূরে থাক, তাহাদের সমগ্র ব্যয়ভার তাঁহারা বহন করিয়া থাকেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, অধ্যাপক মহাশয়দিগের যথেষ্ঠ সমাদর ছিল। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইতেন, ভদ্রলোক সকল তাঁহাদের শাস্ত্রীয় বিচার অতীব আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাঁহাদিগকে সাধ্যমত অর্থ দিয়া তাঁহাদের বিদ্যার গৌরব রক্ষা করিতেন। এতদ্ভিন্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রতি বৎসরে কিছু২ দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত ও আপ্যায়িত করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন মহোদয় এই মহামনা পণ্ডিতদের সমাদর রক্ষা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সাহায্য পর্য্যাপ্ত হয় না এবং তাহা দ্বারা কোন বিশেষ ফল ফলে না। আজ কাল ধনী ব্যক্তির অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদের মনের গতি অন্যদিকে ফিরিয়াছে। বড় বড় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের অভ্যর্থনা করা ও তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। তাঁহারা রাজসম্মানের প্রার্থী, অধ্যাপকদিগের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি কেন পড়িবে? আহ্লাদের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শুভদৃষ্টি অধ্যাপক মহাশয়দের উপর নিপতিত হইয়াছে। নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইতেছেন। আশা করি, অন্যান্য স্থানের অধ্যাপকগণ এবম্প্রকার সাহায্য পাইবেন। আজকাল বিখ্যাত পণ্ডিতগণ, রাজ উপাধির দ্বারা ভূষিত হইতেছেন। ইহাও তাঁহাদের পক্ষে উৎসাহজনক বলিতে হইবে। কিন্তু কেবল উপাধি লইয়া কি হইবে? যাহাতে তাঁহারা অধ্যাপনা কর্ম্ম সমাধা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু, [illegible]

গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অধিক আশা করা যায় না। যখন তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার ব্যয় লাঘব করিতেছেন, তখন সংস্কৃত বিদ্যালয়ের উন্নতি-জন্য যে তাঁহারা অধিক ব্যয় করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নহে। তবে তাঁহারা যাহা কিছু করিতেছেন ও করিবেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা এবং বেদ ও দর্শনাদি শাস্ত্র তাঁহাদের যশঃ সৌরভ পৃথিবীর চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়াছে। তাঁহাদের গৌরবেই আমরা গৌরবান্বিত। আমাদের নিজের গৌরব করিবার কিছুই নাই। ইহা আমাদের পক্ষে অতিশয় লজ্জার বিষয় যে, ইউরোপের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতেছেন, আমরা যে সমুদায়ের প্রতি হতাদর করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ হওয়াতে সেই সমুদয়ের মর্ম্ম অনেকে অবগত হইতেছেন বটে, কিন্তু অনুবাদে লেখকের হৃদয়ের ভাব উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয় না এবং তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা অতিশয় আদরের বস্তু। সার উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones) মহোদয় ইহাকে গ্রীক্ ও লাটিন ভাষার উপর স্থান দিয়াছিলেন। সুতরাং যাহাতে ইহার প্রকৃষ্টরূপে অনুশীলন হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। যাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহাদের সমধিক চেষ্টা করা উচিত। কারণ, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, সংস্কৃত না জানাতে কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। পুরোহিত মহাশয় যাহা সংস্কৃতে বলেন; তাহার অভিপ্রায় না জানিতে পারিলে মনের তৃপ্তি হয় না। বিশেষতঃ মন্ত্রের উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সংস্কৃতে যিনি অনভিজ্ঞ, তাঁহা দ্বারা মন্ত্রের বিশুদ্ধতা কি প্রকারে রক্ষা হইতে পারে? ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বড় বড় লোকের সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। সে সময়ে তাঁহারা যত্ন-পূর্ব্বক অধ্যাপক মহাশয়দিগকে নিজ নিজ গ্রামে থাকিবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেন এবং চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের অধ্যাপনা কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিতেন। সে সময়কার দৃশ্য অতি আনন্দজনক ছিল। অনেক গ্রামে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের আলোচনা হইত। এমন কি, কোন কোন গণ্ডগ্রামের প্রতি পল্লীতে দুই একটী চতুষ্পাঠী নয়নগোচর হইত। দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সকল গ্রামের মধ্যে, কোন কোন গ্রামে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে এবং কোন কোন গ্রামে তাহা একেবারে লোপ পাইয়াছে। একবার হালিসহরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমাদের উদাসীনতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ইহা কি ছিল এবং কি হইল, ভাবিতে গেলে হৃদয়-বিদীর্ণ হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মহোদয়ের সময়ে যে স্থান তাঁহার অধীনস্থ চারিটী সমাজের মধ্যে একটী সমাজ বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং যে স্থানে আগমন করত বড় বড় অধ্যাপকদিগের সহিত সদালাপ করিয়া তিনি তৃপ্তি লাভ করিতেন, সে স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া কাহার না মন বিচলিত হয়? এই মহাত্মা মহারাজার পরবর্ত্তী সময়েও হালি-

সহরে অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল, এবং সুবিখ্যাত অধ্যাপকগণ এখানে অবস্থিতি করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সে সময়ে সমৃদ্ধি-শালী গ্রামবাসীগণ তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট যত্ন প্রকাশ করিতেন এবং চতুষ্পাঠী সংস্থাপন জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের ঔদাস্য জন্য, অধ্যাপক মহাশয়গণ উৎসাহ না পাওয়াতে, চতুষ্পাঠী সকল একে একে বন্ধ হইতে লাগিল, এবং অবশেষে এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল যে, হালিসহরে একখানি চতুষ্পাঠীও স্থান পাইল না। ইহা কথঞ্চিৎ আনন্দের বিষয় যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে, কয়েক বৎসর হইল এতৎ গ্রামে একখানি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয় ইহাতে অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন। আশা করি, গ্রামের অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ এই সুদৃষ্টান্ত অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে সাহিত্য ও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা জন্য আরো কয়েকখানি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এক সময়ে হালিসহরে অনেকগুলি খ্যাতাপন্ন অধ্যাপক বিরাজ করিতেছিলেন। আমরা ৺ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লিখিব। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, চূড়ামণি মহাশয়, হালিসহর অন্ধকার করিয়া, পুণ্য-ধামে গমন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২০৫ বঙ্গাব্দের পৌষমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্যামসুন্দর তর্কভূষণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বংশটীকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সে বংশে বহুকাল হইতে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ রামগোপাল তর্কপঞ্চানন মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্তনির্ণয় নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রতিলিপি স্থানে স্থানে আছে। পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রামনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকটে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পরে ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমে হরধামে গমন করতঃ, তথায় কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া বিখ্যাত অধ্যাপক কালীকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে সাহিত্য, অলঙ্কার ও চিত্র কাব্যের সঙ্কেত শিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি নিজ গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর। এখানে আসিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হয়েন। তাঁহার বাসগৃহের কিয়দংশ শিক্ষালয়ে পরিণত হইল এবং তিনি ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই অল্প বয়সেও তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, কারণ ক্রমে ক্রমে ২০ জন বিদ্যার্থী তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। প্রায় তিন বৎসর অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি শিক্ষুর গোপালনগরে গমন করিলেন, এবং তথাকার খ্যাতনামা অধ্যাপক রামধন ন্যায়ভূষণের নিকট প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি অধ্যয়ন করিলেন। পাঠ সমাপনান্তে, তিনি বিদ্যাসাগর উপাধী লাভ করিয়া হালিসহরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার অভিপ্রায় হইল যে

একখানি চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত করিয়া রীতিমত অধ্যাপনা কার্য্য করেন। ইহা অবগত হইয়া হালিসহরনিবাসী অমরনাথ শিরোমণি মহাশয়, খাঁসবাটীর ঘাটের উপর, চতুষ্পাঠীর জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং তিন চারি জন ছাত্রের সমগ্র ব্যয় ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই মহৎ কার্য্যের অনুকরণ করিয়া, বলরাম বসু, গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রভৃতি কয়েকজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি এই চতুষ্পাঠীর উন্নতির জন্য অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই চতুষ্পাঠীতে প্রায় ২০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ইহার মধ্যে ১০।১২ জন পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। তিনি এই সকল ছাত্রকে, তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে, ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স অনুমান ৫৩ বৎসর, তখন কলিকাতা নগরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মহিষাদলের রাজার দেওয়ান রামনারায়ণ গিরি মহাশয় কর্তৃক এই সভাটী আহুত হয়। দেওয়ান মহাশয় সে সময়ে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজ সভার সভাপণ্ডিত মনোনীত করাই এতৎ সভার উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গদেশের নানা স্থানের অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে সাহিত্য ও শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা প্রকার বিচার হইয়াছিল। এই বিচারসংগ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয় জয়লাভ করিয়াছিলেন। দেওয়ান মহাশয় আনন্দের সহিত তাঁহাকে সভাপণ্ডিতরূপে বরণ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পদটি গ্রহণ করিলেন। এতৎপদে অভিষিক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রকৃত কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে তিনি অধ্যাপনা কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ঋতুমালা রচনা করেন, এবং নানা প্রকার চিত্র-কাব্য, যথা পৃথ্বীবন্ধ, ছত্রবন্ধ, বেণীবন্ধ, নৌকাবন্ধ, নাগবন্ধ, পদ্মবন্ধ, মহাপদ্মবন্ধ এবং যোগবন্ধ লেখেন। শ্যামা-শতক ও বিদ্যাসুন্দর সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শূলরোগগ্রস্ত হওয়াতে, তিনি এই দুইখানি কাব্য সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। অনুমান ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমে, তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া নিজ গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। এখানে আসিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। তিনি আনন্দের সহিত তাহাদিগকে বিদ্যা দান করিতেন। শূলরোগে তিনি অতিশয় ক্লেশ পাইতেন, তথাপি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নাই। যখন বেদনা বৃদ্ধি হইত, তখন বুকে বালিস দিয়া তাহাদের পড়াইতেন।

ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল। অবশেষে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, তিনি বঙ্গদেশকে বিশেষতঃ কুমারহট্ট সমাজকে তমসাচ্ছন্ন করতঃ, তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া যোগধামে গমন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চারিটি পুত্র এবং একটি কন্যা রাখিয়া গমন করেন। তন্মধ্যে, দুইটি পুত্র তাঁহাদের পিতার সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে

পারদর্শিতা লাভ করত শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন-যাপন করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া কয়েকটি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি এখনও হালিসহরের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। পরলোক গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁচটি শ্যামা বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি এই শ্লোক কয়েকটি মুখে মুখে বলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহা লিখিয়া লয়েন, শ্লোক কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

মাতর্বাহিরতঃ প্রয়াণ সময়ে তারেতি বাচং মুদা
গঙ্গাতীর তরঙ্গ সঙ্গত তনোঃ প্রাণাযথা যান্তিমে।
যাচেহং ভবতীং ভবাব্ধি লহরীং দৃষ্টাতি ভীতস্তমা
দেবিত্বং কৃপয়া কুরুষ্ব পচতে ভারোস্ত দাস স্তচ॥

তাৎপর্য্য—আমি ভবসমুদ্রের লহরী দেখিয়া ভীত হইয়াছি, এই নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি যে, গমন সময়ে, তারা বাক্য উচ্চারণের ফলে যাহাতে তরঙ্গায়িত গঙ্গা তীরে আমার প্রাণ নির্গত হয়, তাহা আপনি করুন।

(২)

তারে ত্বচ্চরণাঞ্চলেতি বিমলে দাতব্য মেবো মনাক
মূঢ়ং মাম কৃতিং বিহীনং সুকৃতিং দীনং ধরাশায়িনং।
দৃষ্টাচেৎ কুরুতে ঘৃণাং সহৃদয়ে ত্রৈলোক্য সারেঽপরে
অঙ্কং নাস্মি দয়াময়ীতি ভবিতা মাতর্নিরঙ্কেহধুনা॥

তাৎপর্য্য—হে তারে, হে ত্রৈলোক্যসারে, হে অপরে, তোমার যে নির্ম্মল চরণপ্রান্ত, তাহাতে আমাকে একটু স্থান দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য। আমি মূঢ়, কৃতি ও পুণ্য বিহীন, দীন ও ধরাশায়ী দেখিয়া যদি আমার প্রতি ঘৃণা কর, তাহা হইলে হে নিষ্কলঙ্কে, তোমার দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হইবে।

(৩)

মৎপাদাম্বুজ মেকদাপি ভবতাভক্ত্যানবা পূজিতং
নধ্যাতং নচ সেবিতং নচ সমাখ্যাবাপি জপ্তা স্মৃতা।
এতদ্দোষগণং বিমর্শয়সি মাং জহ্যাদ্যদীশ প্রিয়ে,
অঙ্কং নাস্মি দয়াময়ীতি ভবিতা মাতর্নিরঙ্কেহধুনা॥

তাৎপর্য্য—যদি মা, এ প্রকার বল যে, আমার পাদপদ্ম একবারও ভক্তি পূর্ব্বক পূজা কর নাই, ধ্যান ও কর নাই, সেবাও কর নাই এবং আমার নামও জপ কর নাই ও স্মরণ কর নাই, হে মহাদেবপ্রিয়ে, আমাতে যদি এ সকল দোষ দেখে আমাকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হইবে।

(৪)

মাত ব্রহ্মময়ী পুনর্জ্জগদিদং সর্ব্বং শিবে ত্বন্ময়ং
যত্র কাপি মন স্থিতের্ম্ম মদাত্বয্যেব তদ্বর্ত্ততে।
নির্দোষে ময়ি দূষণং যদি শিবে সংদর্শ্য জহ্যাস্তদা
অঙ্কং নাস্মি দয়াময়ীতি ভবিতা মাতর্নিরঙ্কেহধুনা॥

তাৎপর্য্য—মাতঃ আমাকে এ সকল দোষে দোষী করিতে পার না, যে হেতু তুমি ব্রহ্মময়ী এবং জগৎ তোমার স্বরূপ। আমার মন যেখানে থাকুক না কেন, তাহা তোমাতেই আছে। সুতরাং আমি দোষহীন। তথাপি যদি আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে, তোমার দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হইবে।

(৫)

প্রাসাদেবা বনেবা হিমকর কর পাতো যথা তুল্য এব
সর্ব্বাশ্বিন দৃষ্টিপাত স্তব ভবতি তথা নাস্তি কুত্রাপি তত্বং।
নির্দোষেবা সদোষে নাহি তব করুণা নিশ্চিতো দৃষ্টিপাত
অঙ্কং নাস্মি দয়াময়ীতি ভবিতা মাতনিরঙ্কেহধুনা॥

তাৎপর্য্য—অট্টালিকাতেই হউক অথবা বনেতেই হউক, চন্দ্র যেমন সকল স্থানেই সমভাবে কিরণ দান করেন, সেই প্রকার আপনার ও দৃষ্টিপাত সর্ব্বত্রেই সমভাবে করা উচিত। কোথাও ন্যূনাধিক হওয়া উচিত নহে। মাতঃ আমি নির্দোষী হই অথবা দোষী হই, আমার প্রতি যদি তোমার করুণাকটাক্ষ না হয়, তাহা হইলে তোমার দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হইবে।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে হিন্দুদিগের চেষ্টা।

বর্ষাকালীন বেগবতী নদী এক দিকে বহমানা হইলেও, জলের গভীরতার অল্পাধিক্য প্রভৃতি কারণে, তাহার স্রোত কোথাও প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত মৃদু গতিতে চলে; কোথাও উচ্চ উর্ম্মি উত্তোলন করে; কোথাও বা নত ও একাগ্রভাবে সাগরাভিমুখে গমন করিতে থাকে। বঙ্গীয় সমাজের উন্নতির স্রোতে সেইরূপ বিভিন্ন গতির লক্ষণ লক্ষিত হইবে। অথচ উদ্দেশ্য একই; অর্থাৎ ধর্ম্মোন্নতি—দেশোন্নতি। অতএব এই সমাজস্থ লোকদিগের বিবিধ গতির বিবরণ বলিতে গেলে কোন পক্ষের বিরাগের কারণ থাকিবে না।

১৮৬০ অব্দে যে যুবকবৃন্দ ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সাক্ষাৎ সমাধান নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন, আমরা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্ম বলিতেছি। কারণ, তাঁহারা "ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে" সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, এবং তাঁহারা ঐ নাম চাহেন। অতঃপর দেখা যাইবে যে, এই যুবকদল পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া আবার দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দল ব্রাহ্ম নাম ধরিয়া রাখিলেন; আর এক দল নামান্তর পরিগ্রহ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত যে সকল লোক এই দুই দলের বিশেষ লক্ষণযুক্ত হইতে না পারিলেন, তাঁহারা যেমন ছিলেন, তেমনি রহিয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে একেশ্বরবাদী বা বৈদান্তিক হিন্দু নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যখন সেরূপ কোন নামের দাবী করেন না, অথবা কোন বিশেষত্ব রাখেন না, তখন তাঁহাদিগকে প্রচলিত হিন্দু আখ্যা ভিন্ন আর কিছু দেওয়া যায় না। তাঁহাদের ধর্ম্মমত ও কর্ম্ম-প্রণালী যে একই প্রকার, তাহাও নহে; সুতরাং তাঁহারা অনন্ত আখ্যাধারী হিন্দু-সম্প্রদায় মধ্যেই নিবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

আমরা দেখিয়াছি যে, এই সকল একেশ্বরবাদী বা বৈদান্তিক হিন্দু-প্রমুখ হিন্দুদিগের চেষ্টাতেই ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে বেথুন স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পর ১৮৭০ অব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসর। এই কুড়ি বৎসরে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নানা সম্প্রদায়স্থ লোকে যে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। এই কুড়ি বৎসরের শেষ দশ বৎসর ব্রাহ্মেরা অধিকতর উদ্যম সহকারে যাহা করিলেন, তাহাও বিবৃত হইল। এই কুড়ি বৎসরে পূর্ব্বোক্ত হিন্দুরা কি করিতেছিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। তাঁহারা যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একান্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের উন্নতি স্রোতে তরঙ্গমালা দেখা যায় নাই বটে, কিন্তু তাঁহারাও কল্যাণ উদ্দেশে উন্নতির পথে অবিরামগতিতে চলিতেছিলেন। নিস্তরঙ্গ নদী-প্রবাহ অতি গভীর হইলেও হইতে পারে। দেখা যাউক, তাঁহারা এই কুড়ি বৎসরে কি কি কার্য্য করিয়াছেন।

বিবিধার্থ সংগ্রহ,—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি, আই, ই।

স্কুলবুক সোসাইটি এবং বর্ণেকিউলার লিটরেচর সোসাইটি দ্বারা যে সকল পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কথা পূর্ব্বে ব্যক্ত

হইয়াছে। বর্ণেকিউলর লিটরেচর সোসাইটর মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত এই সকল সভ্যের নাম দৃষ্ট হয়,—শ্রীযুক্ত ওয়াইলি, শ্রীযুক্ত সিটন-কার, শ্রীযুক্ত বেলি, শ্রীযুক্ত কাল্‌বিন্‌, শ্রীযুক্ত প্রাট্‌, শ্রীযুক্ত পাদরী লং, শ্রীযুক্ত উড্‌রো, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব, শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রসময় দত্ত, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। * পূর্ব্বোক্ত ক্লাইব সাহেবের জীবনচরিত্তের লেখক শ্রীযুক্ত রসময় দত্ত। সেকলে সাহেবের ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। যে সকল পুস্তক ও পুস্তিকা স্ত্রীদিগের অধ্যয়ন উদ্দেশে প্রকটিত হইয়াছিল,তন্মধ্যে নুরজিহাঁর চরিত্র, জাহানিরার চরিত্র এবং সুশীলার উপাখ্যান প্রধান।

বর্ণেকিউলর লিটরেচর কমিটি বা সোসাইটী কেবল গ্রন্থানুবাদ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সেই সভা কর্ত্তৃক "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ১৭৭৩ শকের কার্ত্তিক মাস (১৮৫১ খ্রীঃ অব্দ) হইতে এই পত্রিকা বাহির হয়। উত্তরকালে যিনি সাহিত্য সংসারে বঙ্গবাসীদিগের শিরোমণি স্বরূপ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সুবিখ্যাত পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার প্রথম লেখক, সম্পাদক ও জন্মদাতা। "বিবিধ প্রকারে বাঙ্গালা ভাষার

* ১৮৫৩ অব্দে এই সভা এই নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন ;—মুদ্রাঙ্কণ উদ্দেশে কেহ কোন গ্রন্থ রচনা করিলে তাহার আদর্শ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পাদরি রবিনসন্‌ সাহেব দেখিবেন ; তাঁহারা মনোনীত করিলে সেই আদর্শ পাদরি লং সাহেবের নিকট অর্পিত হইবে ; পাদরি লং "তাঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় তাহা পাঠ করিয়া নিরূপণ করিবেন, ঐ রচনা গ্রাম্য বালকদিগের বোধ গম্য হয় কি না।"

উন্নতিসাধন ও পুরাবৃত্ত, ভূগোল, জ্যোতিষ, ভূতত্ব, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ও শিল্প সাহিত্যাদি অপরাপর বিবিধ প্রকার বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করাই বিবিধার্থ সংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য" ছিল। যদিও এই পত্রিকা উক্ত সভার আনুকূল্যে পরিচালিত হইত, কিন্তু ইহার লিখন বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল অনেক পরিমাণে স্বাধীন ছিলেন। উক্ত সভাকে "বঙ্গভাষার অনুবাদক সমাজ" বলা হইত।* এই গ্রন্থ-সংগ্রহকারদিগের মধ্যে ইংরাজেরা প্রধান। বিবিধার্থ সংগ্রহে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইত, তাহা, অনুবাদক সমাজের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায়, ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র না হইলেও, ইংরাজীর আদর্শ হইতে সঙ্কলিত, তাহার সন্দেহ নাই। উহাতে অতি সুন্দর চিত্র সকল থাকিত। বোধ হয়, সে সকল চিত্র বিলাতের কোন কোন কাগজে প্রকাশিত হইলে এখানে তাহার প্রতিরূপ উদ্ধার করা যাইত।

এই পত্রিকার অভিলক্ষিত বিষয় আর একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। প্রথম ভূমিকাতেই লিখিত ছিল :—

"যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করে, যাহাতে বণিক্ এবং মোদক আপন আপন কর্ম্ম হইতে অবকাশমতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালকবালিকাগণ গল্পবোধে ক্রীড়াছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপনাপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থ সকল পরিহরণ পূর্ব্বক উপকারক বিষয়ের চর্চ্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য।"

* উহার অবলম্বিত বাঙ্গালা নামের সংশোধন জন্য রাজেন্দ্র লাল এক স্থলে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন :—

"গ্রন্থ সংগ্রহ কারেরা অকিঞ্চনদিগের পরামর্শ গ্রাহ্য করিলে "গার্হস্থ্য বাঙ্গালা" শব্দের পরিবর্ত্তে "বাঙ্গালা গার্হস্থ্য" শব্দ লিখিতে অনুরোধ করিতাম।"

এই উদ্ধৃতাংশে বিদিত হইবে যে, এই পত্রিকা বালক ও বালিকা উভয়ের জ্ঞান বিস্তার জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। আট বৎসর কাল এই পত্রিকা রাজেন্দ্রলাল মিত্র দ্বারা উপরোক্ত উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার সহিত সাধন করিলে পর (১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে) বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অর্থ কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। তাহাতে এই পত্রিকা ইহার জন্মদাতার হস্ত হইতে সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে আইসে। ১৭৮২ শকের বৈশাখ মাসে সিংহ মহোদয় ইহার নূতন (২য়) কল্পের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—

"বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল, কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত সমাজ, সর্ব্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে, এমন কি, বর্ণপরিচয় বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্রদর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশকাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।"

বিবিধার্থ সংগ্রহে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইত, তাহা পুরুষদেরই জ্ঞান বিজ্ঞান, শৌর্য্যবীর্য্য, ও শিল্পনৈপুণ্যাদি বিষয়ে উন্নতি লাভের উপযোগী। রাজেন্দ্রলালের গাঢ় ভাব ও গভীর রচনা বুঝিতে পারেন, তখন এ দেশীয় স্ত্রীদিগের ততদূর ভাষা জ্ঞান জন্মে নাই।* তথাপি সেই পত্রিকার পরিপাটি চিত্র দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনেক স্ত্রীলোক তাহার মর্ম্ম ও অন্যান্য আশ্চর্য্য বিবরণ জানিয়া লইতেন। ১৭৭৯ শকের মাঘমাসের পত্রিকায় "স্ত্রীর পরাক্রম" নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। ইংলণ্ডের বোয়াডেশিয়া, এডওয়ার্ড পত্নী ফিলিপ', সুরিয়া দেশের সেমিরামিস ও নাইটুক্রিস্, আরব্যের অন্তর্গত পালমিরা নগরের রাণী জেনোবিয়া, চিতোরের রাজমাতা জবাহির বাই, রাণা উদয়সিংহের ধাত্রী পান্না, উৎকলের গড়মণ্ডল প্রদেশের রাণী দুর্গাবতী, লাসিডিমন দেশীয়া টেকশিলা, ষষ্ঠ হেনরীর পত্নী মার্গেরেট, সম্রাট শার্লমেনের পত্নী কার্কাস, ফরাসিস দেশের বোবেনগরবাসিনী জেন্ হাশেট্ এবং জোয়ান অব্ আর্ক,—এই সকল বীরাঙ্গনার বিবরণ উক্ত প্রবন্ধে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল। সীতা কর্ত্তৃক শতস্কন্ধ রাবণ বধ বৃত্তান্তও উল্লিখিত হইয়াছিল। পর বৎসরের (১৭৮০ শকাব্দের) পৌষ মাসের পত্রিকায় গ্রীস্ দেশের ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের স্ত্রীগণের বেশ ভূষার দুইটী চিত্র সহ বর্ণনা আছে। তৎপ্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল এতদ্দেশীয় স্ত্রীদিগের প্রতি প্রীতি ও সম্ভ্রম সহকারে যশঃকীর্ত্তনচ্ছলে কয়েকটী কথায় কিছু উপদেশও দিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলিতে হইবে। তাহা এই :—

"কাশস্ দ্বীপের বেণী বিনাইবার প্রথা দেখিবামাত্র আমাদিগের বঙ্গদেশের উপবেশন-প্রণালী অবশ্য সকলের মনে উদিত হইবে; এবং গ্রীক-কন্যার মুকুট দৃষ্টে আমাদিগের ময়ূরপাতি বিস্মৃত থাকিবেক না। আমাদিগের প্রশংসাবাদে বিবিধার্থানুরাগিণী পাঠিকারা আমাদিগকে অত্যুক্তিবাদের নিমিত্ত তিরস্কার করিতে পারেন; অতএব এই প্রস্তাবের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইহাদ্বারা আমরা তাঁহাদিগের প্রতি ৫

---

* স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের কোন পুস্তক নাই। অতএব বিবিধার্থের কথা ধরিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় ও চেষ্টার পরিচয় লওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে সেই মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ লেখকের প্রতি সমুচিত ব্যবহার হয় না। বিবিধার্থের রচনা এখনকার ভাষাভিজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা উত্তম বুঝিতে পারিবেন এবং তৎপাঠে বিস্তর জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই পত্রিকা কিম্বা ইহার পরবর্ত্তী "রহস্য সন্দর্ভ" এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বঙ্গভাষার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বিবিধার্থ সংগ্রহকে 'রত্নভাণ্ডার' বলিয়াছেন। রত্নভাণ্ডারের প্রতি এক্ষণে আর উপযুক্ত যত্ন হইতেছে না।

মূর্ত্তি যেষভাবে কটাক্ষ করিতে অভিপ্রায় নাই, এবং তাঁহাদের পাতিব্রত্য ও সৌন্দর্য্য ও লালিত্য ও সদ্গুণের অনুকীর্ত্তন আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি।"

বাঙ্গালা ভাষার গদ্য রচনা প্রণালী।

নব্যেরা খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বড় মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করেন। অন্য বিষয়ে যাহা হউক, বঙ্গভাষা সম্বন্ধে তাহার সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গভাষার গদ্য গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়। এক্ষণে এই ভাষা বহু-অংশে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে। গদ্য রচনার প্রণালী বিষয়ে যে একটু গোলযোগ এখনো চলিতেছে, বোধ হয়, বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তাহার সমাধান হইয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইবে।

১৮০০ খ্রীঃ অব্দে সিবিলিয়ান সাহেব-দিগের এ দেশীয় ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে যাঁহারা এ দেশের পণ্ডিত শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা সংস্কৃত রচনায় নিপুণ হউন বা না হউন, বাঙ্গালা ভাষায় কিছু লিখিতে পারিতেন না। প্রচলিত বাঙ্গালা লিখনের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা ছিল। পরে দেখা যাইবে যে, সেই ঘৃণা অপগত হইতে বহু কাল লাগিয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংলণ্ডের কৃত-বিদ্য সাহেবেরা অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহা-দের প্রয়োজন এই যে, তাঁহারা এ দেশের পণ্ডিত মূর্খ সর্ব্ব প্রকার লোকের ভাষা বুঝিতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহারা অত্রত্য সুলেখকদিগের দ্বারা প্রচলিত কথায় গ্রন্থ লেখাইয়া মুদ্রিত বা অমুদ্রিত অবস্থায় তাহা পাঠ করিতেন। তাহাতেই বাঙ্গালা গদ্য-নার আরম্ভ হয়। এই গদ্য রচনায় প্রথম পুস্তক—রামরাম বসু কৃত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। তাহা নিতান্ত চলিত ভাষাতেই "লিপিবদ্ধ" হইয়াছিল। সাহেব-দিগের ভাষাজ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তত তাঁহারা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল রচনাপ্রতি আগ্রহান্বিত হইলেন। এই কালেজের প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি উক্ত সাহেবদিগের অধিকতর বিদ্যা-বৃদ্ধির উপ-যোগী করিয়া প্রবোধচন্দ্রিকা নামে এক পুস্তক রচনা করেন। প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থে এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ভাষা মূলক জ্ঞানগর্ভ উপাখ্যান সকল বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাহার রচনা সংস্কৃতেরই প্রতিরূপ মাত্র। তাহা যিনি লিখিয়াছিলেন, তিনিই বিনা ক্লেশে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেন।*

সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের অনুপ্রাসাদি শাব্দিক অলঙ্কার, উপমানাদি আর্থিক অলঙ্কার এবং লিঙ্গভেদাদি বৈয়া-করণিক শৃঙ্খলা বাঙ্গালা ভাষায় অবিকল রাখিতে গিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে যেমন জটিল করিয়া তুলিতেন, তেমনি ইহার পরবর্ত্তী ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালার গ্রন্থকারেরা ইংরাজীর ব্যাবৃত্ত বাক্য (Paranthetical sentence) বাঙ্গালার শব্দে অবিকল অব-তারণ করিয়া তাঁহাদের রচনাকে দুর্ব্বোধ করিয়া ফেলিতেন। বাঙ্গালা কথা কহিবার রীতি অনুসারে সংস্কৃত মূলক শব্দে কোন ভাব প্রকাশ করিলেই ঠিক হয়। এই নিয়ম

---

* প্রবোধচন্দ্রিকা কিছুকাল এই জটিল পরিচ্ছদেই ছিল, পরে তাহার ভাষা সংশোধিত হইয়াছিল। ১৮৬২ অব্দের এক নূতন সংস্করণ দৃষ্ট হয়।

অনুসারে বাঙ্গালা গদ্য রচনা ক্রমে ক্রমে সংশুদ্ধ হইতে লাগিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ স্থাপনের ২০ বৎসর পরে রাজা রামমোহন রায় বেদান্তাদি শাস্ত্র ও তাহার বিচার বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে বাঙ্গালা গদ্য রচনা প্রণালী বহু অংশে পরিশুদ্ধ হয়। ইহার আর ২০ বৎসর পরে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ কতকগুলি সাহেব ও বাঙ্গালী বাঙ্গালার গ্রন্থকার হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজীর ভাব সকল বাঙ্গালায় সমাহরণ করিতে গিয়া ইংরাজী বাক্যের একান্ত অনুকরণে বাঙ্গালা গ্রন্থকে যে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলিতেন, পূর্ব্বোক্ত অনুবাদক সমাজ শেষকালে সেই রচনা প্রণালী পরিষ্কার করিয়া লইলেন এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বালক বালিকার জন্য গ্রন্থ লিখিবার পথ পাইলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীতে এই পর্য্যন্ত হইল।

সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা এখনো বাঙ্গালা গদ্য রচনা ভালবাসিতেন না। মহার্ঘ সংস্কৃত শব্দের সহিত প্রচলিত অপভ্রংশ ও গ্রাম্য শব্দের মিশ্রণ তাঁহাদের বড়ই শ্রুতিকটু বোধ হইত। এজন্য অনুবাদক সমাজের গ্রন্থকারদিগকে পদে পদে সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের আক্রোশের নিমিত্ত কম্পিত হইতে হইয়াছে। তাঁহারা উক্ত পণ্ডিতগণকে "বঙ্গভাষাদ্রোহী" বলিতেন। সেই বিদ্বেষীদিগের "উপহাস সহ" করিয়া এবং "অপভ্রংশ মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্রসমাজের কথোপকথনে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে," তাহাই অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা ও 'গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ' নামে কতকগুলি পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন

বাঙ্গালার যে সকল গ্রন্থকার সংস্কৃত শব্দের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন, অথবা যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলীকে ভয় করিয়া গ্রন্থ লিখিতেন, তাঁহারা প্রচলিত কথা বা গ্রাম্য ভাষা যত পারেন, ত্যাগ করিতেন। অতঃপর আর একদল গ্রন্থকার অভ্যুদিত হইলেন। সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা কহে, অবিকল সেই ভাষায় গ্রন্থরচনা করিতে তাঁহারা সাহস অবলম্বন করিলেন। প্যারী চাঁদ মিত্র সে বিষয়ে অগ্রণী। ১২৬১ সালে (খ্রীঃ ১৮৫৪ অব্দে) তিনি কয়েকটী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া "মাসিক পত্রিকা" নামে ক্ষুদ্রাবয়বে এক সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা "সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীদিগের জন্য" লিখিত হইত। তাহার রচনায় মিত্রজ মহাশয়, যতদূর সাধ্য, অপভ্রংশ শব্দ, প্রচলিত কথা ও গ্রাম্যভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। এই ভাষায় ইহার পরে তিনি কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। "আলালের ঘরের দুলাল" নামক পুস্তক তন্মধ্যে প্রথম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনেক সুলেখক এই ভাষার অনুকরণে গ্রন্থ লিখিতে লাগিলেন। এই প্রণালীতে বাক্য যোজনা করিয়া নাটক ও উপন্যাস রচনা আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ এই ভাষার আদর বাড়িতে লাগিল। এক্ষণে এইরূপ ভাষায় লিখিত পুস্তকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গ ভাষার ইতিহাস সমালোচকেরা এই ভাষাকে আলালী ভাষা বলেন।

এস্থলে একটী সত্যের বিলোপ বা অপলাপ হইতেছে। যাহাকে আমরা আজ আলালী বলিতেছি, বাঙ্গালা গদ্যের [illegible], অপ্রসিদ্ধ [illegible]

প্রতাপাদিত্য চরিত্র রচনা করিয়াছিলেন। অতএব ইহাকে আলালী ভাষা না বলিয়া "প্রতাপী" ভাষা বলা অধিক সঙ্গত। দুর্ভাগ্য ক্রমে রামরাম বসু এই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত-শব্দ-প্রিয় বাঙ্গালা গ্রন্থকার-দিগের নিকট চির দিন তিরস্কার পাইয়া আসিতেছেন। সেই নিন্দাবাদের আবর্জ্জনায় তাঁহার যশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অনুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য চরিত্র পুনর্লিখিত হইয়াছিল। তাহার সমালোচনাবসরে বিবিধার্থসংগ্রহসম্পাদক সেই ৫০ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত প্রতাপাদিত্য চরিত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তাহা বিস্মৃতির জলে ডুবিয়া না যায়, এই উদ্দেশে, এবং বর্ত্তমান সময়ে পাঠকগণের দৃষ্টির নিমিত্ত আমরাও সেই অংশ যথাবৎ নিম্নে পুনরুদ্ধার করিলাম।

"ইহা ছাড়াইলে পুরির আরম্ভ। পূর্ব্বে সিংহ দ্বার পুরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহারদের সাতে২ আর২ অনেক২ পশুগণ।

এক পোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজ পুরী। তার চারিদিগে প্রস্তরে রচিত দেয়াল। পূবরদিগে সিংহ দ্বার তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা। শোভা কর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎ-খানা তাহাতে অনেক২ প্রকার যন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়ানুক্রমে যন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।

নওবৎ-খানার উপরে ঘড়ি ঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রেই তারা তাহারদের কাঁজের উপর মুগ্‌দর ...া জাত করায় সকলকে।

...বি ভাগে মন্দিরের চূড়ায় তার ঘণ্টা ঘর নির্ম্মিত ...দি উক্ত সে ঘর বিলক্ষণ দেখায় তাহার মধ্যে সপ্ত ধাতীয় ঘণ্টা ঘর লোকেরা তাহার সময়েতে কল ফিরাইয়া দেয় প্রতি দণ্ডে সে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে ঘণ্টার ঠনঠনি শব্দ গড়ের মধ্যে পাঁচ কোশ পর্য্যন্ত শুনা যায়।

ঘণ্টা ঘরের চূড়ার উপরে ধ্বজ। তাহাতে উড্ডীয়-মান পতকা শোভা পাইতেছে কৃষ্ণবর্ণ পতকা উড়িতেছে সে ধ্বজের উপরে তাহা অন্য লোকেরা দ্বারে থাকিয়া দেখিতে পায় যে মত মেঘ পবনের তেজে গতি করিতেছে। এমত আশ্চর্য্য সিংহ দ্বার গঠন করিয়াছে হেন্দো স্থানের মধ্যে এমত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।

দ্বারে দ্বারপাল সের আলির্খা নামে পাঠান ভয়ঙ্কর তাহার মূর্ত্তি দুর্দ্দশ কায় মহা পরাক্রমে। আফিম চরস ইত্যাদি খায় সদাই ক্রোধি শত২ পাঠান তাহার পরিবার অতি দম্ভেতে সে দ্বার রক্ষা করে তাহাকে দেখিলেই বিপক্ষ লোক পলায়নপর হয়। সে দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার পর অপূর্ব্ব সুশোভিত নগর চারি দিগেই দোপটি সহর ছেমহলা বালাখানা তাহাতে পৃথক্২ স্থানে বেস মূল্য সামিগ্রির মহাজন লোকের দোকান। বহুমত প্রকার বস্তু সেখানে বিক্রি হয়।"

বিবিধার্থ সংগ্রহকার এই রামরাম বসুর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তদ্দ্বারা তাঁহার বংশ, বিদ্যা ও নিন্দা-ভাগ্য, তিনেরই পরিচয় হইবে। উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশের উপরে—

"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। মহাকবি ভারতচন্দ্র স্বকীয় গ্রন্থে উক্ত রাজার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছেন এবং তাঁহার পরে এখন প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইল, উক্ত রাজকুলজাত রাম রাম বসু নামক ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের একজন শিক্ষক কর্ত্তৃক ইহা প্রথমত লিপি-বদ্ধ হয়। যদিচ রাম রাম বিজ্ঞান ও সাহিত্য শাস্ত্রে উত্তম উপদিষ্ট ছিলেন, তথাপি তাঁহার রচনা প্রণালী অতি জঘন্য ছিল।"

উদ্ধৃতাংশের পরে—

"এই কর্কশ ও কুৎসিত মূল গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত-কালেজের এক জন পূর্ব্বতন ছাত্র শ্রীযুক্ত হরীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক প্রত্যাবৃত্ত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে।"

বাঙ্গালা ভাষার সমালোচক পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন বাঃ ১২৯৪ সালে তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন; তাহাতেও এই উক্তি দেখা যায়:—"রামরাম বসু অতি কদর্য্য গদ্যে 'প্রতাপাদিত্য চরিত' নামে এক পুস্তক লেখেন।"

রামরাম বসু 'ইতর লোকের দৈনন্দিন ব্যবহারিক বাক্যে' গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার এই অপবাদ। তখনকার এবং এখনকার "সাধু ভাষা" ব্যবহারীরা এপর্য্যন্ত ঐ দোষে তাঁহার প্রতি ন্যক্কার করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, উক্ত অংশ, যেমন উদ্ধৃত হইয়াছে, তেমনি যদি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে ক্রটি এই যে, এখনকার প্রচলিত কমা, সিমিকোলনাদি বিরাম চিহ্ন দেওয়া হয় নাই। তাহা দিলে এবং আর কয়েক স্থানে পূর্ণচ্ছেদ-চিহ্ন দাঁড়ি বসাইলে ঐ রচনা (কোন কোন শব্দ বাদে) এখন উপাদেয় বোধ হইতে পারে।

প্যারী চাঁদ মিত্র কৃত গ্রন্থাবলী।

রাজেন্দ্রলাল যখন পণ্ডিতদিগকে সমীহা করিয়া গাঢ় সাধু ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিতেছিলেন; তখন মদনমোহন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বালক বালিকাগণের নিমিত্ত অতি সহজ ভাষায় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ভাব ও বাক্য প্রকাশ করিতে হইলে তদুপযোগী আরো কিছু সহজ প্রকার ভাষা আবশ্যক হয়। প্যারী চাঁদ মিত্র, "টেক চাঁদ ঠাকুর" এই কৃত্রিম নাম ধারণ পূর্ব্বক, সেইরূপ ভাষায় স্ত্রীদিগের নিমিত্ত কয়েক খানি গ্রন্থ প্রচার করেন। তাঁহার পূর্ব্ব প্রচারিত মাসিক পত্রিকার সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি সাধারণতঃ গ্রন্থকারদিগের যে ভয় ভয় ভাব ছিল, প্যারী চাঁদ তাহা স্পষ্ট বাক্যে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক পত্রিকার প্রতি মাসের প্রথম পত্রের শিরোদেশে এই কথা গুলিন থাকিত:—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে; যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"

মাসিক পত্রিকার নিম্নলিখিত প্রকারের শীর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল।

"স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা" "মাতা ভাল হইলেই পুত্র ভাল হয়।" "মাতার প্রতি ভদ্র কন্যার স্নেহ।" "বিপদকালে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্নেহ প্রকাশ পায়।" "লজ্জা" "কুলীনে মেয়ে দেওয়ার ফল" "ঈশ্বরোপাসনা" "মদ্যপান" "পরাধীন হওয়া কোনমতে কর্ত্তব্য নয়।" "সুখ দুঃখ কেবল ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য হইয়াছে" "বৃদ্ধ লোকের সম্মান" "সাধ্বী স্ত্রী মহারত্ন।"

প্যারীচাঁদ রামারঞ্জিকা ও বামাতোষিণী প্রভৃতি যে কয়েক খানি পুস্তক স্ত্রীদিগের পাঠের জন্য লিখেন, তাহার মর্ম্ম উপরোক্ত মাসিক পত্রিকাতেই ছিল। পুস্তকগুলির ভাষা পূর্ব্বানুরূপ তরল; কিন্তু ভাব ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার "আধ্যাত্মিকা" নামক পুস্তকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

তাঁহার আর একখানি গ্রন্থের নাম "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা"। এই পুস্তকে তাঁহার ভাষা আলালী তরলতা পরিহার করিয়া গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে কথোপকথন প্রণালীতে নানা বিষয়ে আলাপ, বিচার ও তদুপলক্ষে শাস্ত্রীয় মূল শ্লোক ও অনুবাদ বাক্যের এবং দেশীয় প্রবচনের ভূরি প্রয়োগ আছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থে কেবল সাধু ভাষা, সরল কথা এবং সার সিদ্ধান্ত।

ইহাতে তিনি দেবহূতি, অনসূয়া, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, রুক্মিণী, সংযুক্তা, অহল্যা বাই, প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত এবং ইতিহাসোক্ত স্ত্রীদিগের চরিত-মালা অপেক্ষাকৃত বিশদ রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ, সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্য, পাতিব্রত্য, বহির্ভ্রমণ, রাজ্যশাসন, বীরভাব, দায়ব্যবস্থা ও সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

১২৬১ সাল হইতে যাঁহাদের শিক্ষার নিমিত্ত মিত্রজ মহাশয় এক নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়া এত গ্রন্থ লিখিলেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার চরম উপদেশ এই :—

"আর্য্যজাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী, প্রভৃতি ঈশ্বর পরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্ব্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় শম, দম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও। বিষয়ানন্দ বাসনানন্দ ত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ কর।"

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

পরম হংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (৩)

পাঠকগণ, আপনারা স্থির চিত্তে গম্ভীর ভাবে সৎ ও অসতের বিচার করিয়া অসৎকে ত্যাগ ও সৎ অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মকে গ্রহণ করিলে, এবং পরস্পর একমত হইয়া তীক্ষ্ণ ভাবে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে, পরমানন্দে থাকিতে পারিবেন, আর তাহাতে জগতেরও বহু পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হইবে। আপনারা প্রথমতঃ বিচার করিয়া দেখুন যে, ভারতবাসী আর্য্যদিগের আজ নানাপ্রকার দুর্গতি, বলহীনতা, এক মতাবলম্বী না হইবার ও একতা না থাকিবার কারণ কি?

আমি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়কে এই সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া দেখিতে পাইতেছি।

১ম। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ।

২য়। নিরাকার ও সাকার উপাসনা।

৩য়। সাকার—পঞ্চ প্রকার উপাসনা, এবং উপাস্য ও উপাসনার প্রভেদ।

৪র্থ। জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপসানাখ্য ভক্তির পৃথকত্ব।

এই সকল বিষয় লইয়া পরস্পরে বাদ বিসম্বাদ করিয়া মরিতেছে, কিন্তু যথার্থ পক্ষে তাহাদের কর্ত্তব্য যে কি এবং তাহাদের ইষ্টদেবতা কে এবং কোথায় আছেন এবং তাহারা যে কে, তাহা কেহই বিচার করিয়া দেখিতেছে না, এবং দেখিবার চেষ্টা করে না। কেবল অন্যের মুখে শুনিয়া স্থির হইয়া আছে। যদ্যপি সকলে বাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করত পরস্পর একমত হইয়া তাহাদের সকলেরই দেবতা যে কি, একবার বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সকলেরই উন্নতি ও মঙ্গল হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

আপনাদের সকলেরই দেবতা সেই একই পুরুষ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার ও সাকার রূপে এই চরাচর-বিশ্বকে লইয়া অখণ্ডাকার পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। এই সার ভাবটি সকলে অবগত নহেন, আবার যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারাও স্বার্থপ্রযুক্ত গোপন রাখাতে আর্য্য জাতির আজ এত দুরবস্থা হইয়াছে। যদ্যপি জ্ঞানীগণ কুই স্বীকার ও পণ্ডিতগণ নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ আগ্র

করিয়া অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে জগতের যে কি সর্ব্বাঙ্গ মঙ্গল হয়, তাহা বলিতে পারি না। অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া জ্ঞানীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কেন না, তাঁহাদিগের নিকট সকলেই সমান, তাঁহাদের আত্মা এবং অন্যের আত্মা একই;—সুতরাং একজনে আনন্দ উপভোগ করিবে, আর একজনে নিরানন্দে ডুবিয়া থাকিবে, ইহা তাঁহাদের দেখা উচিত নহে। যাঁহারা এইরূপ সমদর্শী হইয়া জন সাধারণে জ্ঞান বিতরণ করেন, জগতে তাঁহারাই ধন্য।

দ্বৈত অদ্বৈত মত সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি এবং আরও অনেকে নানা প্রকার বলিয়াছেন,এক্ষণে পুনরায় আমি আপনাদিগকে স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, আপনারা সূক্ষ্ম ভাবে ইহা গ্রহণ করিবেন। যেমন পিতা হইতে পুত্র জন্মে। এস্থলে পিতা হলেন কারণ, আর পুত্র হলেন কার্য্য। কারণ হইতে, কার্য্যের উৎপত্তি সুতরাং কারণে ও কার্য্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধ। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে কারণ ও কার্য্য,—পিতা ও পুত্র উভয়ই এক ও অদ্বৈত। অদ্বৈতবাদে উপাধি ভেদ নাই। উপাধি ভেদ কেবল মাত্র দ্বৈতবাদে। কারণ ও কার্য্য, পিতা ও পুত্র, উপাধি ভেদ দ্বৈতভাব জানিবেন।

এস্থলে পিতা হইলেন উপাস্য, আর পুত্র হইলেন উপাসক। পুত্রের ধর্ম্ম যে পিতার আজ্ঞানুসারে ভক্তি পূর্ব্বক কার্য্য করেন ও তাঁহাকে উপাসনা ও ভক্তি করেন; এবং তাঁহার নিকট ভক্তি পূর্ব্বক প্রার্থনা করেন যে, হে পিতঃ, আমি অজ্ঞান, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা আমি জানি না, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন, যাহাতে আমি উভয় কার্য্য বুঝিয়া উত্তমরূপে সম্পন্ন করতঃ সদা পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারি। পিতা পুত্রের এইরূপ ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা শুনি। পুত্রকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন; এবং যাহাতে সে সদা পরমানন্দে থাকিতে পারে, সেইরূপ উপদেশ দেন।

এই পিতা শব্দে সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু, আর পুত্র শব্দে আপনারা অর্থাৎ জীব সংজ্ঞা জানিবেন।

সৃষ্টির প্রকরণ হেতু, কারণ ও কার্য্য ভাবে, মায়া উপাধি অজ্ঞান অবস্থায় ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞা দ্বৈত ভাব জানিবেন। সৃষ্টির মায়া উপাধি পরিত্যক্ত জীব ও ঈশ্বর স্বরূপ পক্ষে এক, অনাদি, অদ্বৈত ও অভেদ জানিবেন। যেমন জলবিম্ব কিম্বা বরফ জল হইতে পৃথক বস্তু নহে; অথচ উপাধি ভেদে পৃথক হইয়াছে; সেইরূপ ঈশ্বর ও জীব পৃথক নহে, কেবল উপাধি হেতু পৃথক বলা যায়। যেমন জল ও জলবিম্বের কিম্বা বরফের মধ্যে পৃথক ভাব দ্বৈত ভাব, আর ইহাদের একীভাব অদ্বৈত ভাব, সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মে পৃথক ভাব দ্বৈত ভাব এবং ইহার অভাব অর্থাৎ একই ভাব অদ্বৈত ভাব। স্বরূপ পক্ষে দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাব নাই; কেবল অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য দ্বৈত ও অদ্বৈত কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। যিনি স্বরূপ পক্ষে অনাদি অদ্বৈত, তিনিই দ্বৈত ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় ভাসিতেছেন, ইহা মানিতে হইবে। যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ জ্ঞান হইবে, তখন দ্বৈত ও অদ্বৈত সংজ্ঞা লয় হইয়া কেবল যাহা, তাহাই অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে স্বয়ং ভগবান

ভেদাভেদ রহিত হইয়া বিরাজমান আছেন উপলব্ধি হইবে। দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাব আপনারা এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। হে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী পাঠকগণ, আপনারা পরস্পর মনের বাদ বিসম্বাদ, জয় পরাজয়, ও মান অপমান পরিত্যাগ করত সার ভাব গ্রহণ করুন ও একমত হউন। তাহা হইলে পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারিবেন, অন্যথা কখনও মনে শান্তি পাইবেন না; বরং ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্যেই বিঘ্ন ঘটিবে।

আর্য্যদিগের দ্বারা পৃথক পৃথক পাঁচটি দেবতার নাম কল্পিত হইয়াছে, যথা;—সূর্য্যনারায়ণ, বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, গণেশ ও দেবীমা। এ স্থলে গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্ব্বক বুঝা চাই যে, ঐ পাঁচটি উপাস্য দেবতা নিরাকার না সাকার। যদ্যপি নিরাকার হয়েন, তাহা হইলে নিরাকার ত একই অখণ্ডাকারে আছেন। নিরাকার ত পৃথক ভাবে নাই যে তাহাতে পাঁচটি পৃথক দেবতা আছেন। কেবল সাকার বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পাঁচ তত্ত্ব কিম্বা পাঁচ দেবতা বলা হয়। কিন্তু সাকার ব্রহ্ম একই অনাদি বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন; ইহার মধ্যে পাঁচটি নাই। বেদে ও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, বিরাট ব্রহ্মের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, আকাশ তাঁহার মস্তক, বায়ু তাঁহার প্রাণ, অগ্নি তাঁহার মুখ, জল তাঁহার নাড়ী, ও পৃথিবী তাঁহার চরণ। এই কয়েকই অনাদি রূপে জগতপিতা, জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা ও জগৎমঙ্গলকর্ত্তা ভিতর বাহির প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। ইহার মধ্যে পাঁচটি উপাস্য দেবতা কোথায় আছেন যে, উপাসকগণ আপন আপন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন মানিয়া পরস্পরে বিরোধ করিয়া থাকেন? ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা নিজে নিজে ইহা বুঝিবার কোন চেষ্টা করেন না, কেবল অন্যের মুখে শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

জগতের দেবতা সেই একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, নিরাকার ও সাকার বিরাট রূপে প্রত্যক্ষ অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন। এবং সেই বিরাটরূপী ভগবানের নামই সূর্য্যনারায়ণ, বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, গণেশ, শালগ্রাম, দেবীমাতা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও ওঁকার আদি। কেবল ভিন্ন ভিন্ন ঋষিমুণিগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তিনি ভিন্ন নহেন, একই পুরুষ অনাদি কাল হইতে বিরাজমান আছেন। যেমন জল একটি পদার্থ, দেশ ও ভাষা বিশেষে তাহার নানা প্রকার নাম আছে, যথা জল, পানি, নীর সরিৎ, তোয়, ওয়াটার ইত্যাদি, সেইরূপ দেশ ও ভাষা ও মত বিশেষে মুনিঋষিগণ তাঁহার কত প্রকার নাম যে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তিনি একই পুরুষ অখণ্ডাকারে অনাদিকাল হইতে বিরাজমান আছেন।

যদ্যপি আপনারা বলেন যে, আমাদিগের দেবতা পৃথক পৃথক এবং নামও পৃথক পৃথক, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, নিরাকার ব্রহ্মে ত পাঁচটি দেবতা নাই, কেবল সাকার বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাঁচটি দেবতা নাম কল্পনা করা হইয়াছে। বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণকে যে কোন স্থান হইতে দেখিবেন, সেই স্থানেই ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে লইয়া পূর্ণ

দেখিতে পাইবেন। যদ্যপি ইহার পাঁচটি নাম না হয় এবং আর চারিটি পৃথক দেবতা থাকেন, তাহা হইলে আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, তাঁহারা কোথায় আছেন? কাহারও ভয়ে কি তাঁহারা লুকাইয়া আছেন? যদ্যপি এরূপ দেবতা হয়েন যে, তাঁহাদিগকে সাকার ও নিরাকাররূপে পাওয়া যায় না, তবে উপাসকগণের কি প্রকারে ভক্তি ও বিস্ময় জন্মিবে? ও কিরূপেই বা মনের চঞ্চলতা দূর হইয়া শান্তি লাভ হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি, নিরাকার এক বই দুই নহেন, যাহা কিছু দ্বৈত ভাব সে কেবল সাকার ব্রহ্মে। যখন সাকার ব্রহ্মেও এক ব্যতীত দুইটি পৃথক দেবতা দেখিতে পাইতেছি না, কেন না, সাকার হইলেই প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন, যখন তাহা দেখা যাইতেছে না, তখন আর কাহারও অস্তিত্ব আছে, ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। সুতরাং সাকার ব্রহ্মও এক। বেদে বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দেবতা বা দেব বলে। যথা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বিদ্যুৎ, তারাগণ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। ইহা ছাড়া আর কোন দেবতা বা দেবী নাই। কেবল কল্পনা দ্বারা পৃথক পৃথক করিয়াছেন, আর আপনারা বিনা বিচারে সেই সকল মত গ্রহণ করিয়া বাদবিসম্বাদ করিয়া মনের অশান্তিতে পুড়িয়া মরিতে ছন ও জগৎকেও পোড়াইয়া মারিতেছেন। ইহাতে যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা চক্ষে দেখিয়াও দেখিতেছেন না। এ বিষয়টি আপনারা স্থির চিত্তে একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আপনাদের পরস্পরের ইষ্টদেবতা কে, উপাসনার উদ্দেশ্য কি, এবং গন্তব্য পথ কোন্‌টা?

প্রকৃত পক্ষে আপনাদের দেবতা পৃথক নহেন। যিনি আপনাদিগের দেবতা, তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা সাকার ও নিরাকার স্বরূপ ভিতর বাহির আপনাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। ইহাকে ধারণা করিলে সকলের মনের চঞ্চলতা ও ভ্রম দূর হইয়া যাইবে এবং সদা পরমানন্দে থাকিবেন। সাম্প্রদায়িকতার ঘোর তমসে পড়িয়া আর আত্মহারা হইবেন না।

জ্ঞানবাদিগণ কর্ম্ম উপাসনাকে নিন্দা করেন এবং কর্ম্মী ও উপাসনাবাদিগণ জ্ঞানবাদীকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করেন। জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপাসনাবাদিগণের মধ্যে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান কিম্বা ভগবানে যথার্থ পক্ষে নিষ্ঠা নাই এবং যথার্থ জ্ঞানও হয় নাই, সেই সকল লোক পরস্পর পরস্পরকে নিন্দা করে। কিন্তু যে ব্যক্তির যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, আর যিনি যথার্থ কর্ম্ম ও উপাসনা করেন—ভগবানে যাঁহার প্রকৃত নিষ্ঠা আছে, সে ব্যক্তি কখনও কাহাকে নিন্দা করে না। তিনি জ্ঞান চক্ষুতে দেখেন যে, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম পরস্পর তিনটিই মুক্তির সাহায্যকারী। একটি থাকিলেই তিনটি তাহার সঙ্গে থাকিবে, আর একটির অভাবে তিনটির অভাব ঘটিবে। কারণ জ্ঞান থাকিলে ভক্তি ও কর্ম্ম সঙ্গে সঙ্গে হয়। জ্ঞান না হইলে কাহাকে যে ভক্তি করিব, তাহা জানিতে পারি না। জ্ঞান হইলে চিনিতে পারি যে ইনি আমার পিতা, ইহাঁকে আমার ভক্তি করা কর্ত্তব্য। যাহা দ্বারা পিতাকে জানিলাম, সেইটাই হইতেছে জ্ঞান, আর পিতাকে জানিতে

ইচ্ছা মনে উদয় হইল যাহা দ্বারা সেইটাই হইল কর্ম্ম, এবং ভক্তি পূর্ব্বক পিতার আজ্ঞা পালন করাই হইতেছে ভক্তিও কর্ম্ম। এই তিনটি ব্যতীত ব্যাবহারিক কি পারমার্থিক কোন কার্য্যই উত্তমরূপে শৃঙ্খলাপূর্ব্বক সম্পন্ন হয় না। যথা, অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, উহার সঙ্গেই প্রকাশ গুণ ও উষ্ণতা ও বর্ণাদি সকলই প্রকাশ হয়। যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তখন ঐ তিন গুণই উহার সঙ্গেই নির্ব্বাণ হয়। এইরূপ যাহার জ্ঞান হয়, তাহার সঙ্গে কর্ম্ম ও ভক্তি সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ হয়।

হে পাঠকগণ, শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ও উপাসনা, যতক্ষণে জ্ঞান অর্থাৎ মুক্তি না হয়, ততক্ষণ পরিত্যাগ করিও না, মুক্তি হইলে আর ইহাদের আবশ্যক নাই। যে যে কর্ম্ম করিলে তোমাদের ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য সিদ্ধ হয়, যাহা দ্বারা তোমরা সকল বিষয়ে সুখে থাক, সেই কর্ম্ম করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যতক্ষণ নদী পার না হওয়া যায়, ততক্ষণ নৌকার প্রয়োজন থাকে, নদী পার হইলে আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না। সেইরূপ এই অজ্ঞান মায়ারূপী নদী পার হইবার জন্য জ্ঞানরূপী নৌকা পূর্ণ পরব্রহ্মরূপী মাঝির প্রয়োজন, যখন আপনারা মুক্তিরূপ ভবপারে যাইবেন, তখন আর নৌকা ও মাঝির প্রয়োজন থাকিবে না। তখন এই বিশ্ব সংসার আপনিময় দেখিবেন। দ্বৈত, অদ্বৈত, জ্ঞান কর্ম্ম, ভক্তি, সাকার, নিরাকার তখন আর কিছুই থাকিবে না। —তখন ব্রহ্মে ও আপনাতে অভেদ হইবেন। অতএব আপনারা বিচার করিয়া সকল কার্য্য করুন, তাহা হইলে মুক্ত হইতে পারিবেন, অন্যথা নহে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যদি কাহারও কোন বিষয় ভ্রম হয়, অর্থাৎ কোন বিষয় বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে নব্যভারত সম্পাদককে লিখিলে তাহার যথাযথ উত্তর পাইবেন।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষা। (২)

সাধারণ ভ্রম।

গত বারের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে ভাবিয়াছেন, আমরা সংস্কৃতের নিয়মানুসারেই বঙ্গভাষাকে চালিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। যাঁহাদের ঐরূপ আশঙ্কা, তাঁহারা একটু সহিষ্ণু হইয়া, আমাদের গতি পর্য্যবেক্ষণ করুন, বুঝিতে পারিবেন—আমরা কোন্ পথের পথিক। "সংস্কৃত" শব্দের অর্থ মার্জ্জিত। কোনও বস্তু প্রথম হইতেই মার্জ্জিত হইতে পারে না। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা, এক্ষণে যাহা লোকের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা কোন মতেই প্রথমাবস্থার—বস্তু নয়। সংস্কৃত-ভাষা-সম্পর্কে যাহা বলা গেল, একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। সংস্কৃতে শত শত অযোগ্য ব্যক্তি, লিপি চালনা করিতে আরম্ভ করিলে কোন কবি, এই প্রকার আক্ষেপ করিয়াছিলেন—

> বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
> বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরং।
> যাহস্তামরসিংহশম্ভুধনিকান্ সেয়ং জরাজীর্ণসা
> শূন্যালঙ্করণা স্খলন্মৃদুপদা কং বা জনং নাশ্রিতা॥

উহার ভাবার্থ এই—

বাল্মীকি, কবিতা-দেবীর, পিতা। ভারতবর্ষে সংস্কৃত কবিতার তিনিই আবিষ্ক-

অভ্যর্থনার সূত্রপাত করেন। বেদব্যাস, তৎপরে কবিতার গুণ-ব্যাখ্যা করিয়া যান। মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে এই দেবী কবিতার বিবাহ হইল। অমরসিংহ, শঙ্কু, ধনিক প্রভৃতি ঐ বিবাহের ফল। তৎপরেই কবিতার বার্দ্ধক্য হইল—সুতরাং তাঁহার কান্তি-লাবণ্য কোথায় রহিল! সেই সময় তিনি সকলেরই শরণাপন্ন হইলেন।

ইহাতেই কি জানা গেল না, এককালে সংস্কৃত ভাষাতেও বিশৃঙ্খলা চলিয়াছিল? "অলঙ্কার"-শাস্ত্রের সমালোচনায়, দার্শনিক বিচারে, বাদানুবাদে, তর্ক যুক্তিতে তবে তাহার শোধন হইয়াছে। অতএব আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি,—এখন যে সংস্কৃত বর্ত্তমান, তাহা প্রথমের সংস্কৃত নয়। বাঙ্গালাও এই দৃষ্টান্তে মার্জ্জিত, পরিপুষ্ট, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হউক—ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

৪। "পরিবার" মৃত।—ভার্য্যা, ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন, ইহা বলিবার সময় অনেকে কহিয়া থাকেন—"আমার পরিবার মরিয়াছেন।" রেলওয়ে কোম্পানির অভিধানে জেণ্টল্‌মেন্ (Gentlemen) শব্দের অর্থ ইংরেজ। রেলওয়ে শকটে যিনি বিহার করিয়াছেন, ইহা সত্য কি না তিনিই অবগত। "জেণ্টল্‌মেন্‌স ওয়েটিংরুম্ (Gentlemen's waiting room) তাহার সাক্ষী। তথায় ভারতবর্ষজাত কোন জাতিরই বিশ্রামের জন্ম প্রবেশাধিকার নাই! কেন না, ভারতীয়েরা যতই কেন সভ্য ভব্য হউন না, তাঁহারা 'ভদ্র' আখ্যা পাইবার যোগ্য নন! রেলওয়ে সম্বন্ধে এটী যেমন অদ্ভুত, উক্ত পদ ব্যবহার-কারীদের পক্ষে "পরিবার" অর্থে পত্নীও তেমনই অদ্ভুত। ফলতঃ "পরিবার" অর্থে যাহা যাহা বুঝায় পত্নী তাহার একতম বটে। পরিবার শব্দে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, কন্যা, পিসী, মাসী, খুড়ী, জেঠাই, ইত্যাদি বোধ হয়। এই শ্রেণীর লোকেই আবার বলিয়া থাকেন, "আই হেভ্ ব্রট্ মাই ফেমিলি (I have brought my family) অর্থাৎ আমি পরিবার আনিয়াছি। পাঠকেরা ভাবিতে পারেন, তিনি বাস্তবিকই পুত্রাদি-সমেত আপন বনিতাকেও আনিয়া থাকিবেন। যেখনে আমরা ঐ প্রকার বলিতে শুনিয়াছি, তল্লাস করিয়া জানিয়াছি, ঐ সকল স্থলে কেবল পত্নীকে আনা হইয়াছে। ইঁহারাই ইংরেজি ভাষায় অপূর্ব্ব পদ-বিন্যাস করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ক্লাস ফ্রেণ্ড (Class friend), ভেনারেবল্ এক্‌সেপশন্ (Venerable exception) ইত্যাদি ব্যবহারে তাঁহারা নিপুণ। ক্লাস ফ্রেণ্ড স্থলে ক্লাসফেলো (Class fellow) বা ফেলো ষ্টুডেণ্ট (Fellow-student) বলাই রীতি। অনারেবল্ এক্‌সেপ্‌শন্ (Honourable exception) হয় বলিয়া, তদ্দৃষ্টে ভেনারেবল্ এক্‌সেপশন্ প্রচলিত হওয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অনারেবল্ ও ভেনারেবল্ শব্দের অর্থ, প্রায় তুল্য; তথাপি একের পরিবর্ত্তে অপর ব্যবহৃত হইবে না। ইহাই ভাষার বিশেষত্ব। ইহাকেই ভাষার নিয়ম বলে। ফলতঃ গৃহিণী অর্থে "পরিবার" বলা অপপ্রয়োগ, সুতরাং উহা ভুল।

৫। এদিগে, পূর্ব্বদিগে, চতুর্দ্দিগস্থ।—এই তিন শব্দের ভ্রম শোধিত হইয়া, 'এ দিকে' 'পূর্ব্বদিকে' 'চতুর্দ্দিকস্থ' হইবে। সংস্কৃত ভাষায় যে "দিশ্" শব্দের সত্তা আছে, তাহারই প্রথমায় "দিক্" হয়।

"দিক্" সর্ব্ব বিভক্তিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "দিক" বিশুদ্ধ, কি "দিগ" বিশুদ্ধ—তাহার মীমাংসায় অধিক বাগ্‌জাল বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। লোকে "পূর্ব্বদিক্" "দক্ষিণদিক্" "এ দিক্" "ওদিক্" লেখেন, না, ঐ সকলের স্থলে "পূর্ব্বদিগ" "দক্ষিণদিগ" "এদিগ" "ওদিগ" লিখিয়া থাকেন? আমরা ইহার প্রসঙ্গ আদৌ করিতাম কি না সন্দেহ, যদি আমরা "ঐতিহাসিক রহস্যে" "পদ্যমালায়" "ভাষা প্রবন্ধে" ঐ গুলির অস্তিত্ব না দেখিতাম। "ঐতিহাসিক রহস্য"-প্রণেতা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নন; কিন্তু সুপণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয় কর্ত্তৃক উহা পরিশোধিত হইয়াও, উহাতে ঐ ভ্রম স্থান পাইয়াছে। প্রথম সংস্করণে ঐ ভ্রান্তি দেখিয়া, গ্রন্থকর্ত্তা ও সংশোধনকর্ত্তা—উভয়কেই ক্রমে ক্রমে মুখে ও লেখায় জানাইয়া আশা পাইয়াছিলাম, উহা সংশোধিত হইবে। ভুল এখনও রহিয়াছে দেখিতেছি, তাই এখানে তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইল। "ভাষা-প্রবন্ধ"-প্রণেতার সুলেখক বলিয়া এখনও খ্যাতি হইবার বিলম্ব আছে সত্য, কিন্তু তিনি না কি সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, সুতরাং তাঁহার এই দোষ ঘটা অবৈধ। তদ্ভিন্ন তিনি ভাষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পুস্তক লিখিয়াছেন, অতএব ঐরূপ পুস্তকে ত্রুটি থাকা কি সহনীয়? "পদ্যমালার" ষড়বিংশ সংস্করণেও ঐ ভুল আছে।

৬। **দেশীয় ঔষধ।**—নেটিভ্ (Native) শব্দের অনুবাদে "দেশীয়" শব্দটী চলিত হইতেছে। সাহেবেরা ভারতবর্ষের লোকদিগকে নেটিভ্ বলেন। সুতরাং আমরাও সম্যক্ হিতাহিত বিচার না করিয়াই, উহা চালাইতে বসিয়াছি। ইহা ঠিক্ নয়। সাহেবেরা আমাদিগকে যাহা বলিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, থাকুন। তাঁহারা আমাদের অধিপতি। রাজা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন—গালাগালি দিতে পারেন, অপমান করিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ ভাবিয়া দেখিলে, ইহার ত্রুটি বোধগম্য হইবে। নেটিভ্ শব্দ সচরাচর অন্য শব্দ-সহযোগেই ব্যবহৃত হয়। তদ্রূপ হওয়াই আবশ্যক। যথা, নেটিভ্ অব্ ইণ্ডিয়া (Native of India), নেটিভ্ অব্ ইংল্যাণ্ড (Native of England)। বঙ্গদেশের লোকেরাও নেটিভ্, আর ইংরেজেরাও নেটিভ্। বঙ্গদেশের লোকেরা যেমন নেটিভ্ অব্ বেঙ্গল (Native of Bengal), ইংরেজেরাও সেইরূপ নেটিভ্ অব্ ইংল্যাণ্ড (Native of England)। তবে যে সাহেবেরা, এদেশের অধিবাসিসমূহকে নেটিভ্ বলিয়া অবজ্ঞা করেন, সেটা তাঁহাদের গায়ের জোরে চালান হয়। খ্রীষ্টানেতর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তাঁহারা হিদেন্ (Heathen), পেগান্ (Pagan) বলিয়া থাকেন; আবার হিন্দুরাও অহিন্দুকে ম্লেচ্ছ, যবন, বিধর্ম্মী, ভ্রষ্টাচার, নাস্তিক ইত্যাদি বলিতেও ত্রুটি করেন না। মুসলমানেরাও অপর অপর ধর্ম্মাশ্রিতদিগকে কাফের বলেন। এস্থলে সকল জাতির এক একটা গালি দিবার বস্তু আছে। কিন্তু সাহেবেরা, এ দেশের হিন্দু-মুসলমানকে নেটিভ্ বলিয়া যাইতেছেন, আর আমরা তাহার অর্থ-গ্রহ না করিয়াই, তাহাই গৌরবে বক্ষে ধারণ করিতেছি।

এখন উহা অবজ্ঞাদ্যোতক হইয়াছে। নিগার (Nigger) যেমন অশ্রদ্ধাবিজ্ঞাপক, নেটিভ্ও প্রায় তদ্রূপ ভাব-প্রকাশক

তথাপি আমরা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৈ কার্য্য করি? অবিবেচনার দোষে গালিও আমাদের শিরোভূষণ হইতেছে। আমাদের স্মরণ আছে, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সংস্কৃত কালেজ-গৃহে যুবকদের "নেটিভ সোসাইটীর" এক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'নেটিভ সোসাইটী' এই নামের পরিবর্ত্তে 'ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটী' বা 'বেঙ্গল সোসাইটী' নামকরণ করা কর্ত্তব্য ছিল। নেটিভ্ শব্দ, সাহেবেরা হেয় ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তদবধি সেই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর এক কথাও বিবেচ্য। অনুবাদে ঠিক্ অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। যেখানে "দেশীয়" লেখা হয়, বা বলা হয়, তথায় 'এদেশীয়' 'এতদ্দেশীয়' বা 'অস্মদ্দেশীয়' এই শব্দ-ত্রিতয়ের অন্যতম শব্দ ব্যবহার করিলে, অর্থ পরিস্ফুট হয়। কেন না, যথায় ঐরূপ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তথায় লেখকের বা বক্তার, জাতি বা স্বদেশ নির্ণয়ের পন্থা থাকে এবং তদ্দ্বারা "এদেশীয়" প্রভৃতি শব্দের কে লক্ষ্য, স্পষ্ট বুঝিবার কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। নচেৎ "দেশীয় ঔষধ" শব্দে সকল দেশের ভেষজই সূচিত হইতে পারে। কেন না, "দেশীয়" শব্দের অর্থ দেশ-সংক্রান্ত। ইহাতে যে কোন দেশ বোঝা যাইতে পারে; উহা দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের নাম, পাঠকের হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইবে না।

৭। সন ১২৯৯ সাল।—এখানে "সন" ও "সাল" দুই শব্দই একার্থক। দুয়েরই অর্থ—'অব্দ'। অতএব হয় "সন ১২-৯৯" না হয়, "১২৯৯ সাল" বলা উচিত। বিবক্ষী লোকের হাতে পড়িয়া, এত কাল উহার অর্থ নির্ণয় হইতে পায় নাই। বিবক্ষী লোকের নিকট হইতে যেন উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ প্রয়োগটী, সাধুভাষা-ভাষী গ্রন্থকর্ত্তাদেরও সমাজে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছিল। এখন উহা সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে নির্ব্বিবাদে কি প্রবল প্রাধান্যই বিস্তার করিতেছে! উহার অসঙ্গত প্রাদুর্ভাবে ভাষা-দেবীর অকপট উপাসকদিগকে বিমনাঃ করিয়া দিয়াছে। উহা আবহমান কাল চলিয়া আসায় "গড্ডলিকা প্রবাহ" ন্যায়েরই একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইয়াছে।

৮। ১১ই কার্ত্তিক, ১২৯৯ সাল।—আমাদের দলিল-দস্তাবেজে অনেক দোষ, ত্রুটি, ভ্রান্তি চলিতেছে বটে, কিন্তু একটী বিষয়ে যথার্থ সজাতীয় ভাব রক্ষিত হইতেছে। সেটী এই,—বাঙ্গালা ভাষাতে অগ্রে বৎসর, তৎপরে তারিখ লিখিয়া সর্ব্বশেষে মাসের নাম লেখার রীতি আছে। যথা—১২৯৯ সাল, ১১ই কার্ত্তিক। "সন ১২৯৯ সাল, ১১ই কার্ত্তিক" না লিখিয়া "১২৯৯ সাল ১১ই কার্ত্তিক" কি নিমিত্ত বলা যাইতেছে, তাহার যুক্তিটা পাঠকদিগকে জানান আবশ্যক। ঐরূপ বলিবার যুক্তি, উপরেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রত্যেক ভাষারই প্রকৃতি-গত একটা রীতি বা নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালারই এই একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাউক না কেন:—"জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ"। জন্মের পর বিবাহ, তৎপরে মৃত্যু, ইহা সকলেরই জ্ঞাত বিষয়। তথাপি 'জন্ম বিবাহ মৃত্যু' না বলা হয় কেন? ইহার উত্তর—ভাষার নিয়ম। ইংরেজিতেও এই রূপ। যথা—ব্রেড্ এণ্ড বরন্ (Bred and born) ইহার অর্থ শিক্ষিত ও জাত।

এখানেও অগ্রে "বয়স্" (জাত), তদনন্তর "গ্রেড" (শিক্ষিত) বলা হয় না। ইহা যেমন রীতিসিদ্ধ, ১২৯৯ সাল, ১১ই কার্ত্তিক সেইরূপ। কেন না, এক জন ইংরেজ "১২৯৯ সাল ১১ই কার্ত্তিক" এই অংশের অনুবাদ-কালে '11th Kartik, 1299 (Bengali Era)' [ইলেভেন্থ কার্টিক, ১২৯৯ (বেঙ্গলি ইরা)] লিখিয়া থাকেন, কিন্তু বাঙ্গালীর নিয়মানুসারে '1299 (Bengali Era, 11th Kartik' ১২৯৯ (বেঙ্গলি ইরা) ইলেভেন্থ কার্টিক) কোন ইংরেজকে এবম্ভূত লিখিতে বা বলিতে শুনি নাই। তবে আমরা "25th October 1892" (টোয়েন্টি ফিফ্থ অক্টোবর, ১৮৯২) এই অংশের অনুবাদ-কালে '২৫শে অক্টোবর, ১৮৯২' কেন লিখি? এখানে অবিকল ইংরেজি প্রথার অনুমোদন নিন্দনীয়। আমাদের লেখা উচিত—'১৮৯২ খৃষ্টাব্দ ২৫শে অক্টোবর'। ইংরেজের ভাষাই যদি অবিকল অনুকরণীয় হয়, তবে আমরা এই মাত্র বলিয়া নিরস্ত হইব,—আমাদের জাতির ধর্ম্ম কার্য্য, রুচি প্রকৃতি, রীতি নীতি, প্রভৃতির মূলোচ্ছেদ করিয়া একীভূত করিয়া ফেলা হউক না। তবে ইংরেজের খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম হউক। ইংরেজের পরিচ্ছদে সকল হিন্দু-সন্তান, আপনাদের দেহ আচ্ছাদিত করুন না কেন? ইংরেজ বিড়ালাক্ষীকে গৃহলক্ষ্মী মনে করেন, হিন্দুরা তাঁহাকে লক্ষ্মী মনে করা দূরে থাকুক, বরং বিপরীতই ভাবিয়া থাকেন; অর্থাৎ অলক্ষ্মী মনে করেন। মৃগশাবাক্ষী, পদ্মায়তাক্ষী, আকর্ণনয়না, হরিণ-লোচনা—হিন্দুর লক্ষ্মীস্বরূপা। প্রশস্ত-কেশী গৃহিণী, প্রশস্তকেশা তনয়া হিন্দুর গৃহ-লক্ষ্মী। পক্ষান্তরে স্বল্প-কুন্তলা বালা, ইংরেজের উপাস্যা। রমণীর ক্ষুদ্রতম চরণ, চীন-জাতির আরাধন-দ্রব্য বলিয়া উহা কি সকলের অনুকরণ-যোগ্য? কদাচ অন্য জাতির পক্ষে ঐ প্রকার পদ, প্রিয়তম নয়। সুতরাং বলিতে হইবে, উহা কদাপি সুপ্রথা হইল না, অতএব উহা কদাচ অনুকরণীয়ও হইবে না।

বামাবোধিনী-পত্রিকার সম্পাদক বি, এ উপাধিধারী বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত এই বিষয়ের আন্দোলন চলিয়াছিল। তিনি বলেন, অগ্রে তারিখ, পরে বৎসর থাকিলে, দেখিবার সুবিধা হয়। তদুত্তরে আমরা বলিয়াছিলাম, সকল স্থানেই কি এই সুবিধা হয়? আর অসুবিধাই বা কত ক্ষণের জন্য? এক মিনিটের মধ্যেই সালের পর তারিখ দেখা যায়। অকিঞ্চিৎকর অসুবিধার জন্য স্বজাতীয় ভাব ত্যাগ করা কি সঙ্গত? এই কথা শুনিয়া তিনি আর প্রতিবাদ করিলেন না।

আরও একটী স্থল, বিশেষ বিবেচ্য। লোকে কখনই বলেন না, বা লেখেন না, 'এই ঘটনা, ৩রা শ্রাবণ ১২৩২ সালে ঘটিয়াছিল।' এরূপ স্থানে যাহা লিখিত বা কথিত হয়, তাহা এই,—

"এই ঘটনা, ১২৩২ সালে ৩রা শ্রাবণে ঘটিয়াছিল।"

এখানে কেহই ভ্রমাত্মক দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই কেন? যুক্তি সর্ব্বত্রই সমঞ্জসীভূত হওয়া কি প্রয়োজনীয় নয়? আমরা যে নিয়মের আলোচনা করিলাম, কোন সংবাদপত্রে ও সাময়িক-পত্রে তাহার পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেখিয়া সুখী হইয়াছি, সংবাদ-পত্রের মধ্যে "সোমপ্রকাশ" "হিতবাদী" "সমাজ ও সাহিত্য"

পত্রিকা ঐ নিয়মের পক্ষপাতী। তাঁহারা অগ্রে সাল, পরে তারিখ ও মাস লিখিয়া থাকেন, কিন্তু ইংরেজির নকল করিয়া অগ্রে তারিখ, পরে বৎসর লিখিতে ইচ্ছা করেন না। সাময়িক পত্রের মধ্যে "সাহিত্য" এবং "জন্মভূমি" ঐ নিয়ম আংশিক প্রতিপালন করেন, সর্বত্র নয়। আশার অর্দ্ধেক ফল। ইহাদের নিকটে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই লাভ। সুপ্রসিদ্ধ বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় শেষাবস্থায় এই সংস্কৃত মত অবলম্বন করিয়া "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগে" ঐ নিয়মে লিখিয়া গিয়াছেন। "সুচিন্তা" ও "পুরোহিত" নামে মাসিক পত্র দুইখানি, পূর্ণমাত্রায় এই নিয়মাবলম্বী।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ভক্তি কথা।

৪১৪। সাধক মঙ্গলময়ের অনন্তস্বরূপ মনন করিবার কালে যতদিন না প্রতীতি করিতে পারিবেন যে, বাহ্য জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ সেই ভূমার অনন্তস্বরূপ-সাগরে মগ্ন, ততদিন তিনি সেই অনন্ত মহিমার্ণবের অনন্তত্ব প্রকৃতিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না।

৪১৫। বাহ্য জগতের সকল দৃশ্যমান শূন্য স্থান বায়ু অথবা বাষ্পরাশিতে পূর্ণ, কোন একটী স্থান নিঃশেষিতরূপ শূন্য হয় না। সেইরূপ মানব প্রাণের কোন স্থান একেবারে শূন্য হইবার নহে। তথায় হয় সংসার, না হয় ঈশ্বর থাকিবেনই থাকিবেন। ভক্তের প্রাণ এই নিয়মে ঈশ্বর দ্বারাই অধিকতর অধিকৃত। সংসার তাঁহার পদতলে, তথায় তাঁহার ইচ্ছামত একটু স্থান পায়। এজন্য কথিত আছে— "ভোগ বাসনা যত যায়, প্রাণ তত তাঁহারে পায়।"

৪১৬। জ্ঞান ও প্রেমের বিবাদ সম্বন্ধে এক জন ভক্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

"দেখরে রঙ্গ দ্বন্দ্ব জ্ঞান ও প্রেমে।
জ্ঞান বলে আমার হরি সকলের কর্তা।
প্রেম বলে আমার হরি জন্মদাতা পিতা॥
(সুবাদ মিষ্ট কেমন)
জ্ঞান বলে আমার হরি ব্যাপ্ত চরাচরে।
প্রেম বলে আমার হরি অন্তরের অন্তরে॥
(শীতল করে প্রাণ)
জ্ঞান বলে আমার হরি অনন্ত অপার।
প্রেম বলে আমার হরি প্রেমের পাথার॥
(নইলে ভজ্‌ব কেন?)
জ্ঞান বলে আমার হরি স্বতন্ত্র স্বাধীন।
প্রেম বলে আমার হরি ভক্তের অধীন॥
(বাঞ্ছা করে পূরণ)
জ্ঞান বলে আমার হরি অগম্য অগোচর।
প্রেম বলে আমার হরি বন্ধু সহাকার॥
(নইলে ডাক্‌ব কেন?)
জ্ঞান বলে আমার হরি অসঙ্গ নির্লিপ্ত।
প্রেম বলে আমার হরি প্রাণের মূলে স্থিত॥
(নইলে বাঁচ্‌ব কেন?)
জ্ঞান বলে আমার হরি অচিন্ত্য নির্গুণ।
প্রেম বলে আমার হরি সৃষ্টিতে নিপুণ॥
(কৌশল জানে কেমন)
জ্ঞান বলে আমার হরি কেবা ধ্যানে পায়।
প্রেম বলে আমার হরি যে চায় সে পায়॥
(যে জন ডাক্‌তে জানে)

জ্ঞান বলে আমার হরি দেখা যায় ওই।
প্রেম বলে আমার হরি নিকটেতে এই॥
(তাই লই শরণ)
জ্ঞান বলে আমার হরি আছে স্বর্গধামে।
প্রেম বলে আমার হরি হৃদি বৃন্দাবনে॥
(লীলা করে কেমন)
জ্ঞান বলে আমার হরি পুণ্য পবিত্রতা।
প্রেম বলে আমার হরি পাপীজন ত্রাতা।
(নিরাশ হব কেন)
জ্ঞান বলে আমার হরি ন্যায় দণ্ডদাতা।
প্রেম বলে আমার হরি স্নেহময়ী মাতা॥
(অভয় করে দান)
এইরূপে জ্ঞান প্রেমের দ্বন্দ্ব হয়ে ছিল।
সাধু বলে তর্ক ছেড়ে হরি হরি বল॥
(নইলে মিটবে কেন)

৪১৭। শারীরিক কোন কোন রোগ সংক্রামক কিন্তু আধ্যাত্মিক সকল রোগই সংক্রামক। ঐ সকল রোগ বুদ্ধি, নৈতিক আচরণ ও ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে হইয়া থাকে। অতএব যাহারা আধ্যাত্মিক রোগাক্রান্ত, তাহাদিগের সহবাস বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

৪১৮। যিনি পোকামা, যাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই ঈপ্সিত বিষয় সম্পাদিত হয়, যাঁহার পাদস্পর্শে এই বিশাল বিশ্ব সত্ত্বাবান্ হইয়া সজীব রহিয়াছে, যিনি এই বিশ্বের আধার হইয়াও স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি বৈকুণ্ঠধাম, আনন্দধাম ছাড়িয়া অবতার রূপে মানব শরীরধারী হইবেন!! অবতার সম্বন্ধে এ প্রকার চিন্তা সেই মহান্ ভূমা ঈশ্বরের নিতান্ত অনুপযোগী ও তাঁহার মহান্ ভাবের বিরোধী। ঐরূপ চিন্তায় পাপ হয়। সুতরাং যাহারা এমন কুসংস্কার বিশিষ্ট বিষয়কে আপনাদিগের মনোমধ্যে স্থান দেয়, তাহারা সংকীর্ণমনা হইয়া অতীব কৃপাপাত্র হয়।

সময়ে সময়ে জন সমাজের বিশেষ বিশেষ অভাব মোচনার্থ। ঐশ্বরিক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে মহাজনগণ সেই সেই কালোচিত গুণ-সম্পন্ন হইয়া এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু তাঁহারা একেবারে মানব ক্ষীণতার অনধীন হইতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদিগের সময়ের প্রয়োজন সাধন জন্য উদয় হন বলিয়া সেই সময়ের ফলস্বরূপে প্রকাশিত হন ("They are the products of the age, they are born in") তাঁহাদিগকে ঐশ্বরিক সম্মান প্রদান করা অথবা তাঁহাদিগকে ঈশ্বর সম পূজা করা নিতান্ত ভ্রমসূচক ও দূষনীয় কার্য্য। তাঁহারা মহাজনোচিত সম্মানেরই যোগ্য।

৪১৯। আমরা আমাদিগের সুখের জন্য যত শারীরিক, মানসিক, লোক ও ধন বলের উপর নির্ভর করি, ততই শোকাধীন হই। আর তন্নিমিত্ত যতই সেই পূর্ণ মঙ্গলময়ের উপর নির্ভর করি, ততই শোকবিহীন হই।

৪২০। যাঁহারা জীবিতাবস্থায় আমাদিগের সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থানীয় হন, তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর, আমরা তাঁহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ, মননাদি করিব। কখনও তাঁহাদিগের চরিত্রের দোষের দিকে আমাদিগের মনকে যাইতে দিব না; যদি দিই, তবে আমাদিগের মনোবিকার উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে বড়ই দুঃখ দিবে। আমরা তখন আমাদিগের পাপের ফল হাতে হাতে পাইব। তাঁহারা আমাদিগের আশীর্ব্বাদক; আমরা তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদই চাহিব, কদাচ

তাঁহাদিগের অবমাননা সূচক কোন বিষয় আমাদিগের বাক্য ও মনে আসিতে দিব না।

৪২১। বিজ্ঞান শাস্ত্র সৃষ্ট বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান করি। জগদীশ্বরের অস্তিত্ব, স্বরূপাদির জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস ও প্রত্যাদেশ (Intuition & Inspiration) যোগে লাভ হয়।

৪২২। যিনি নীতিপরায়ণতা, আত্ম-সংযম, বৈরাগ্য, ব্রহ্মোপাসনা, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি সমুপায়ে সেই পূর্ণ মঙ্গলময়ের সত্বাসাগরে মগ্ন হইয়া আপনাকে হারাইতেছেন, তিনি বলেন যে, "ব্রহ্ম আমাতে আর আমি তাঁহাতে," আর অধিকতর সাধন বলে, যখন সেই সাধক প্রেমময়ের প্রেম-সাগরে গভীরতর রূপে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহিত নিজের অভেদ জ্ঞানের অধীন হইতে থাকেন, তখন তিনি বলেন "পূর্ণ মঙ্গলালয় আমি ও আমিই তিনি"। এই রূপে আপনাকে তাঁহাতে হারাণই যথার্থ অদ্বৈতবাদ; ইহাই অতিশয় প্রার্থনীয় সাধনের সর্ব্বোচ্চ অমৃতময় ফল। ইহা গ্রন্থাধ্যয়নে লব্ধ হয় না।

৪২৩। যতদিন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারকগণ পূর্ণ মঙ্গলময় কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদিগের মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই বিশ্বাসের অধীন হইয়া চলিতে থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রাণোৎসর্গ ও ব্রহ্মোপাসনা ও প্রচার কার্য্য সজীব করিতে সমর্থ হইবেন। বৈরাগ্যে যত্ন-শিথিল ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের সজীবতা রক্ষা করিতে কখনই পারিবেন না।

৪২৪। যাহার জীবন যে পরিমাণে বৈরাগ্য-প্রধান, সে সেই পরিমাণে ধর্ম্ম সাধনে সমর্থ।

৪২৫। যিনি সংসার অপেক্ষা জগদীশ্বরকে অধিকতর ভালবাসেন, তিনিই বৈরাগী। তিনি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার বলে, প্রেমময়ের আদেশ পালন নিমিত্ত একদিকে যেমন ঘোরতর ক্লেশভোগ করেন, অপরদিকে তেমন অপার সুখ ও শান্তি সলিলে ভাসিতে থাকেন। যে এইরূপে বৈরাগী হইতে না পারে, সে-ই ধর্ম্ম জগতের বাহ্যদর্শক হয় ও জে ঠতাত, কিম্বা খুল্লতাতদিগের পদারোহণ করিয়া আপনার অন্তরের অসারতা প্রকাশ করে।

৪২৬। ভৌতিক জগতে ব্যয় ক্ষয়, আধ্যাত্মিক জগতে ব্যয় বৃদ্ধি। অমর আত্মার এরূপ আশ্চর্য্য গতি না হইলে কি অনন্ত উন্নতি লাভ হইত?

৪২৭। যে গালাগালির পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করে ও মন্দকারীর মঙ্গল চায়, সে ইহলোকে থাকিয়া স্বর্গবাসের ফল পায়।

৪২৮। মাটীতে নির্ম্মিত দেহ, হতে
হবে মাটী।
মাটী হবার আগে কেন হও না তুমি মাটী॥

৪২৯। সবল চায় আসল (অনন্ত দেবতা)
দুর্ব্বল চায় নকল (পরিমিত দেবতা)।

৪৩০। পিতা গো! কাতরে করি এই
নিবেদন।
যেন তব ভক্তের মত হয় গো মরণ॥

সমাপ্ত।

শ্রীকানাইলাল পাইন।

৺মহাত্মা কানাইলাল পাইন।

মহাত্মা কানাইলাল পাইন আর এ সংসারে নাই। ভক্ত, ভক্তিকথা লিপিবদ্ধ করিয়া অনন্তধামে মায়ের কোলে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন জীবন্ত ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তি ও বিশ্বাস, তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের লোক হিন্দুসমাজে হীন পদবীতে থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থা-মতে গুণানুসারী সম্মান প্রাপ্ত হইলে লোকের কত গুণ কেমন উপচীয়মান হয়, পরলোকগত এই মহাত্মার চরিত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্য কথায়, অকপট ব্যবহারে, চরিত্রের বিশুদ্ধতায় যে ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, সেই ধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা। এই মহাত্মাকে সেই চেষ্টার বিশিষ্ট ফল বলিতে হইবে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার সময়ে এমন কোন সৎকাজ অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল না। ধর্ম্মে তিনি প্রদীপ্ত ছিলেন, সত্যে ভূষিত, অনুরাগে প্রাচীন হইয়াও নবীন, কাজে বীরের ন্যায় সদা সতেজ ছিলেন। নব্যভারতে প্রকাশিত কোন একটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, জীবনের শেষাংশে, তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমরা তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ দেখিয়া অবাক্ হইলাম, তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইলাম। তিনি আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আপনার মত পাঁচটী লোক পাইলে আমি ব্রাহ্মসমাজে অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারি (I can work out miracles)." চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার বদনমণ্ডল উৎসাহে, বীরত্বে উদ্ভাসিত হইয়াছে, এক স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। বন্ধুবর ৺জগদীশ্বর বাবুর সহিত তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল, উভয় বন্ধু আজ স্বর্গে বসিয়া না জানি ব্রাহ্মসমাজের হীনাবস্থা দর্শন করিয়া কতই ব্যাকুল হইতেছেন। এই মহাত্মার আত্মবিবৃত জীবনকাহিনী হইতে নিম্নলিখিত মহামূল্য বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। এই মহাত্মা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না ; যাঁহারা মনোযোগ সহকারে ভক্তি-কথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার গভীর আত্মদৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি বিধাতার প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত সন্তান হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। যে সকল মহাত্মার আবির্ভাবে ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইয়াছে, মহাত্মা কানাইলাল পাইন তাহার মধ্যে একজন। তাঁহার পুণ্যবলে ব্রাহ্মসমাজ অনেক সৎকাজ করিতে পারিবেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের নিকটবর্ত্তী কলুটোলায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺ মধুসূদন পাইন। ৪ বৎসর বয়সে পিতৃ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। বাল্যে পিতৃ মাতৃ হীন হওয়ায় শিক্ষার বড়ই ব্যাঘাত হয়। শীলদিগের কলেজে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। ঐ কলেজ এখন শীলস্ ফ্রিকলেজ নামে খ্যাত। ঊনবিংশ বৎসর বয়সেই একাউণ্টেণ্ট জেনেরেলের আফিসে চাকুরী করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর গৃহ পাঠ ভি

বিজ্ঞাপন।

জমিদারী কার্য্যের নিয়মাবলী। শ্রীযুত বাবু কৈলাসনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা। সহর কলিকাতা সামপুখর রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ২৬।১ নং গ্রন্থপ্রণেতার নিজবাড়ী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উত্তর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২১০।৪ নং নব্যভারত কার্য্যালয়, শ্রীযুত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর নিকট এবং সিমলা বলরাম দে ষ্ট্রীট ৮৮ নং শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন কবিরাজ, মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিস্যনরের সাবেক পার্ছেনেল এসিষ্টাণ্ট ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজেষ্টর ও কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন তাহার অবয়ব নকল নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়।

মহাশয়!

আমি আপনার জমিদারী কার্য্য প্রণালী পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনার কার্য্যে যেরূপ বহুদর্শিতা ও পারদর্শিতা আছে এই পুস্তকখানি তাহার বিশেষ পরিচয়স্থল হইয়াছে, ইহার দ্বারা যে জমিদার ও তাঁহাদের কার্য্যকারকদিগের বিশেষ উপকার হইবেক তাহার সন্দেহ নাই কারণ ইহাতে জমিদারী কার্য্য প্রণালী অতি সরল ভাষায় ও সংক্ষিপ্তরূপে লিখিত হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। আপনি যেরূপ শ্রম সহকারে এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, ইহার মূল্য তদনুরূপ অধিক হয় নাই।

কলিকাতা
রামচাঁদ মৈত্র লেন, ১৭নং বাটী
১৪ নবেম্বর ১৮৯৩।

শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য।

জিলা মালদহের মেজেষ্টর ও কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অবয়ব নিম্নে লিখিত হইল।

মালদহ—
৯ই নবেম্বর ১৮৯৩

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনার "জমিদারী কার্য্যের নিয়মাবলী" পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। আপনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া জমিদারী সেরেস্তার কাজ কর্ম্ম পরিদর্শন করিয়া এবং মামলা মোকদ্দমার তত্ত্বাবধারণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, পুস্তকখানি তাহারই ফল। ইহার রচনা সরল হইয়াছে, অতিচুম্বকে সার সার অবশ্য জ্ঞাতব্য বিস্তর কথা ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। জমিদার এবং জমিদারের কর্ম্মচারিগণ আপন আপন বিষয় কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে বা দেখিতে হইবে তদ্বিষয়ে এই পুস্তকে মূল্যবান উপদেশ প্রাপ্ত হইবেক। প্রত্যেক জমিদারী সেরেস্তায় এই বহি থাকা কর্ত্তব্য। ইহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়েরই হিত সাধন হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

আর তাঁহার স্কুলে অধ্যয়ন হয় নাই। এই সময়ে একটী ১০ বৎসরের বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। ১৮৫১ খ্রীঃ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ আফিসে কার্য্য গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে উভয়ের সহিত গাঢ় হৃদ্যতা জন্মে। এই মহাত্মা'র সহবাসেই তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মে। তাঁহার উত্তেজনাতে ১৮৫৩ খ্রীঃ প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে কানাই বাবু যোগ দেন। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্র বাবু সমাজের প্রধান আচার্য্য হইলেন। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কানাই বাবু সমাজের উন্নতির জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমাজের উপাসনা প্রণালী সংশোধনে ৺মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার প্রধান সহায় হন। অক্ষয় বাবু এই সময়ে সমাজের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে হিতৈষিণী সভা স্থাপিত হয়। কানাই বাবু এই সভার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হন। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে এই সভার কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। তারপর দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া এই কাজ পরিত্যাগ করেন। ইহার কিছু দিন পর এই সভা উঠিয়া যায়। এই সভার দ্বারা সেই সময়ে অনেক মঙ্গলদায়ক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কানাই বাবু এই সময়ে ইংরাজি গ্রন্থ হইতে ভাল ভাল চরিতমালা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া সভার বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করিতেন। ইহার কয়েকটী প্রবন্ধ চরিতমালা নামক পুস্তকে ছাপা হয়, অবশিষ্ট গুলি বামাবোধিনী পত্রিকায় ছাপাইতে দেওয়া হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ড্যাল সাহেব আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি অনেক বিষয়ে কানাই বাবুর সাহায্য করিতেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ মহাত্মা ড্যাল সাহেব ৺কেশববাবু এবং অন্যান্য বন্ধুগণের সম্মুখে প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ৺কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের সহিত কানাই বাবুর পরিচয় হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিমলা পাহাড়ে গমন করিলে কানাইলালবাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতি হন। এই সময়ে হিতৈষিণী সভার কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া, লালবাজারে, নিবধই নিবাসী বাবু কালীকৃষ্ণ দত্তের ঔষধালয়ে একটী প্রার্থনা সমাজ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইহার কাজ চলে। কানাই বাবুর চেষ্টায় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জন্য, এই সময়ে, তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে মাসিক ২৫ সাহায্য প্রদানের বন্দোবস্ত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য গুরুতর পরিশ্রম করায় তিনি মস্তিষ্ক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইহার পূর্ব্বেই কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অক্ষয় বাবুর ইচ্ছানুসারে এই বৃত্তি বন্ধ হয়।

লালবাজারের প্রার্থনা সমাজ উঠিয়া গেলে, ১৮৫৯ খ্রীঃ, কানাইবাবু পঞ্চাননতলা, হাড়কাটা গলির প্রাচীন আবাসে প্রার্থনা সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। কানাই বাবুর পত্নী এবং কোন কোন মহিলা ইহাতে যোগ দেন। ব্রাহ্মসমাজে মহিলার যোগদানের সূত্রপাত এই প্রথম। সুতরাং ঘোরতর প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। প্রার্থনা সমাজ স্থানান্তরিত করিতে হইল। এই শেষোক্ত স্থানে ১৮৫৯ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সমাজের কাজ চলিয়াছিল। মহিলাগণ পর্দ্দার ভিতরে বসিতেন। ১৮৬০ খ্রীঃ কলিকাতা মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে

কানাই বাবু অর্থ সাহায্য করেন এবং ইহার ডিরেক্টর পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি এই স্কুলের শিক্ষকগণকে উপদেশ দিতেন এবং মহাত্মা কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত দুটী রজনী বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষা দিতেন। কেশব বাবুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দানের পরই, তাঁহার বাটীতে, কলুটোলায় তিনি সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই খানে অনেক মহাত্মার নবজীবনের সূত্রপাত হয়। ১৮৬১ খৃীঃ কানাইবাবুও ৬১ নং পঞ্চানন তলা হাড়কাটায় এইরূপ আর একটী সভা গঠন করেন।

অর্থ উপার্জ্জনের জন্য এই সময়ে কানাই বাবু ব্যবসা বাণিজ্য করিতে মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ লাভ হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যেই ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতির আশা পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে আফিসে ৪৫৲ বেতন পাইতেন। অনেক চেষ্টার পর ১৮৬২ খৃীঃ ৬০৲ বেতন হয়। আফিসে ভাল কাজ করিয়াও কর্ম্মচারীগণের পক্ষপাতিতায় বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ১৮৮৮ খৃীঃ ১৭৫৲ টাকা বেতন পাইতেন। বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় ৭৯।৶০ পেন্সন লইয়া মনোক্ষোভে কাজ ছাড়েন। ১৮৬২ খৃীঃ হইতে ১৮৬৭ খৃীঃ পর্য্যন্ত নানা সৎ কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং সোমপ্রকাশে ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং সত্যান্বেষণ পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগের নানা কাজে তিনি লিপ্ত ছিলেন। সে সকল ঘটনা পুঞ্জের বিশেষ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার পূর্ণ জীবনীতে এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে। এই সময়ে তিনি যেন কার্য্যস্রোতে ভাসিতেছিলেন। কখনও নূতন প্রার্থনালয় সংস্থাপন করিতেছেন, কখনও ডিবেটিং ক্লব প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, কখনও পত্রিকা (সত্যান্বেষণ) লিখিতেছেন, কখনও রজনী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও নানাস্থানে প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং সমাজে উপাসনা করিতেছেন। পঞ্চাননতলায় বরাবর তাঁহার চেষ্টায় প্রার্থনা সমাজ চলিতেছিল। ১৮৬৫ খৃীঃ কেশব বাবু আদি সমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন হন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৬১ খৃীঃ ৺ঠাকুর দাস সেনের সহিত মিলিত হইয়া, কানাই বাবু কেশব বাবুকে লইয়া বহুবাজার ব্রহ্মোপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপাসনা পদ্ধতি ঠিক করিয়া দেন। এই সমাজ হইতে সত্যান্বেষণ প্রকাশিত হয়। এই সমাজে বালকদিগের নীতি শিক্ষার জন্য দুটী শ্রেণী খোলা হয়। উচ্চ শ্রেণীতে বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ধর এবং নিম্ন শ্রেণীতে কানাই বাবু শিক্ষা দিতেন। কিন্তু ঘটনা ক্রমে অনেক দিন কাজ চলিল না, ১৮৬৬ খৃীঃ ইহার কাজ বন্ধ হইলে ৺হরিমোহন পাইনের বাড়ীতে দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করা হইল। এই খানেই প্রার্থনা সমাজ চলিতে লাগিল। ১৮৬৯ খৃীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সমাজের সমস্ত দ্রব্যাদি ঐ সমাজে দান করা হয়। কানাই বাবু ইহার পরও কিছুদিন বাবু হরিমোহন পাইনের বাড়ীতে সমাজ করিতেন। সাম্বৎসরিক উৎসবে কেশব বাবু ও দেবেন্দ্র বাবু আসিতেন। ১৮৬৪ খৃীঃ "A brief History of the Brahma Somaj" প্রকাশ করেন। ইহার পর পীড়া প্রযুক্ত অসমর্থ হওয়ায় প্রার্থনা সমাজের সহিত সম্বন্ধ পরি-

ত্যাগ করেন। ইহার পর আর প্রকাশ্যে তিনি উপাসনা করিতে পারিতেন না।

সকলেই অবগত আছেন, কেশব বাবু বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া ভারত-সংস্কারক সভা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার অধীনস্থ মদ্যপান নিবারণী বিভাগের কার্য্যভার ৪ বৎসর কানাই বাবুর উপর ছিল। এই বিভাগ হইতে "মদ না গরল" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তৎপরে বাবু নীলমণি ধর সম্পাদক হন, তৎপরে কানাই বাবু সম্পাদক হন। পীড়াপ্রযুক্ত শেষে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের হস্তে ইহার ভার দিয়া কানাই বাবু অবসর লন। প্রতাপ বাবুর বিলাত গমনের পর এই পত্রিকা উঠিয়া যায়। তৎপর সুরাপান সম্বন্ধে তিনি কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮৭০ খৃঃ শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়ের বাড়ীতে একটী ডিবেটীং ক্লব প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার মহোদয়ের অনুরোধে কানাই বাবু ইহাতে যোগ দেন। এখানেও তিনি বক্তৃতাদি করিতেন। ১৮৭০ খৃঃ কেশব বাবু দেশে ফিরিয়া আসিলে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি বন্ধুগণ সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত মিস্টিক সোসাইটির পুনর্গঠন করেন। কানাই বাবু এই সভার সভ্য হন এবং নানা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভা ৬ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে নাই। ১৮৭৩ খৃঃ আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ করেন, তাহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। কানাই বাবু ১৮৭৭ খৃঃ হিন্দু-এমুইটি ফণ্ডের ডিরেক্টর মনোনীত হন এবং এক বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত ঐ কাজ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ ফণ্ডের অডিটার মনোনীত হন। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আপন জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করেন। শেষ জীবন পীড়ার সেবা-তেই অতিবাহিত হয়। এই সময়ে বাবু রসিকলাল পাইনের নিকট যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, তাহা অতি সুন্দর ধর্ম্মভাবপূর্ণ। শেষ জীবনে স্বাস্থ্য লাভের জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করেন। বাল্যকালে রীতিমত ব্যায়াম করিতেন। কিন্তু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পর আর করিতে পারেন নাই। যখন তাঁহার শরীর রোগে ও বার্দ্ধক্যে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল, এমন সময়ে আমাদের সহিত আলাপ হয়। এই সময়ে ভক্তিকণা লিপিবদ্ধ হয়। ইহা তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় দিবার জন্য জগতে রাখিয়া, ৬০ বৎসর বয়সে, ১২৯৮ সন, ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ইং ১২ই জুন, ১৮৯১ খৃঃ বেলা ৩ ঘটিকার সময় তিনি বন্ধুবর্গকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহণ করেন। যে বীর ব্রাহ্মসমাজের নানা সঙ্কটের অবস্থায় প্রধান সহায় ছিলেন, তিনি আর এ জগতে নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার নামও নাই। মহতের পূজা যে দেশে হয় না, সে দেশ মরণের কোলে চির নিদ্রিত। যে সমাজে মহতের সম্মান নাই, সে সমাজ চিরমৃত। মহাত্মা কানাইলাল পাইনের কথা বঙ্গদেশ ও ব্রাহ্মসমাজ বিস্মৃত হইলে, এদেশ ও এই সমাজের মঙ্গল নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট কিছু ঋণী, ব্রাহ্মসমাজ নানাবিষয়ে বিশেষরূপ ঋণী। বিধাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

কোজাগরে শুকতারা।

১

জ্যোতিঃ-বসনে,
গোধূলি-আসনে
বসি, একমনে
কারে চাও?
ধীর আঁখিতে
কাহারে দেখিতে
কনক কিরণ
ঢেলে দাও?
গোধূলি মিশায়
আকাশের গায়,
নয়ন পলক
তবু নাই,
আঁখি অনিমিখ্
চেয়ে এক-ই দিক
কার আশাপথে
ভাবি তাই।
সুষমা ঝলকে,—
যামিনী-অলকে
গাঁথা রতনের
ফুল প্রায়,—
যাহার লাগিয়ে
রয়েছ জাগিয়ে,
কোন দেব সেই
অমরায়?

২

পূরবে চন্দ্রমা
পূর্ণ সুষমা
ধীরে ধীরে ধীরে
ওঠে ওই,
যামিনী, অঞ্চলে
বাঁধি কুতূহলে,
বলে,—"আমি উষা,
নিশি নই!"
শ্রান্ত নয়ান,
উদাস পরাণ
মলিন বয়ানে
দেখা যায়,
যেন বা কাহারে
আলোক-আঁধারে
চেয়ে চারিধারে
খোঁজে, হায়!
কিরণ-মালিকা
তারকা-বালিকা
ফুটি একে একে
বলে,—"কও
কথা মোর সনে,"—
শশী আনমনে
বলে,—"ওগো সেত
তুমি নও!"

৩

প্রণয়-নিরাশে
লুকায় আকাশে
মলিন-সুষমা
তারাচয়;
শশী উঠে ধীরে,
চাহে ফিরে ফিরে
আকুল পরাণে
নভোময়।
সুদূর পশ্চিমে,
গগনের সীমে
মাঝে সোণামাখা
নীলিমার,
বিমল কিরণ,
রতন-বরণ,
থির আঁখি হতে
ঝরে কার?

করি। জগৎ বাদ দিয়া আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। এতদ্ভিন্ন আমাদের তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞান অসম্ভব। এ পর্য্যন্ত মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যত জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা এই তিনটী ভাবে সীমাবদ্ধ—তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি জগতের পালনকর্ত্তা, তিনি জগতের সংহারকর্ত্তা। এই জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে নাই; কখনও পারেও না। যদি পারে, ও যখন পারে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, তাহার তখনকার জ্ঞান আর মানুষের জ্ঞান নহে, তখন সে ব্রহ্ম হইয়া যায়। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে একরূপ তার্কিক জ্ঞান (speculative knowledge) হইতে পারে; যেমন নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পড়িয়া ঈশ্বরের নিরাকারত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। কিন্তু তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। কার্য্যকালে সে জ্ঞানের কোনই উপকারিতা নাই। সে জ্ঞান লইয়া আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারি না। অতএব দেখা গেল, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান (as opposed to speculative knowledge) আমাদের জগতের জ্ঞানের সহিত না হইয়া হইতে পারে না। এখন আমরা দেখিব, এই জগতের জ্ঞান আমাদের সাকার জ্ঞান বলিয়া, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও আমাদের সাকার না হইয়া পারে না। জগৎ বলিতে দুইটী বস্তুর সমষ্টি বুঝায় —এক, স্থূল বা জড়জগৎ (material world), দ্বিতীয়, সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক জগৎ (mental world). আমরা প্রথমে দেখিব, স্থূল জগতে আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাকার না হইয়া পারে না। আমরা পরে দেখিব, সূক্ষ্মজগতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আমাদের জ্ঞানও সাকার না হইয়া পারে না।

জড় জগতে ব্রহ্মজ্ঞান।

কি Empirical কি Intuitional উভয় সম্প্রদায়ই বলেন, আমরা স্থূল জগতে জাতিবাচক (concrete) বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে না অভ্যাস করিলে কখনই গুণবাচক (abstract) বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। আমাদের কোন গুণবাচক বস্তুর চিন্তা করিতে হইলে, সেই জাতিবাচক বস্তুর চিন্তায় অভ্যস্ত না হইলে তাহা পারা যায় না। বৃক্ষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাবার পূর্ব্বে বৃক্ষের জ্ঞান জন্মা আবশ্যক। একটী বালকের জ্ঞান হওয়া অবধি সে বৃক্ষই দেখিতেছে। বৃক্ষত্ব কি, সে তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে না। যখন তাহার জ্ঞানবৃদ্ধি পাইবে, যখন সে নানা রকম বৃক্ষ দেখিয়া, তাহাদের সাধারণ গুণ বা ভাব বুঝিতে পারিবে। তখনই সে বৃক্ষত্ব কি, তাহা চিন্তা করিতে পারিবে। এবং পূর্ব্ব সংস্কার বলে বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে হইলেই, তাহাকে একটি (বিশেষ) individual বৃক্ষের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। অতএব দেখা গেল, আমাদের গুণবাচক পদার্থের জ্ঞান জাতিবাচক পদার্থের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, ও তাহা হইতে অভিন্ন ভাবে অনুভূত হয়। এখন যদি গুণবাচক পদার্থকে নিরাকার বলা যায়, তবে তাহার জ্ঞান, সাকার জাতিবাচক পদার্থের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রমাণিত হইল। এখন, এই জড়জগতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান, হয় জাতিবাচক বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া হইবে, না, হয় গুণবাচক বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া হইবে। এই উভয় প্রকার জ্ঞানই সাকার; সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও

সাকার হইবে। অতএব নগেন্দ্রবাবু "এই অদ্ভুত কৌশলময় বিশ্ব ও তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থে ও শিশুর সরলতায়" যে নিরাকার ব্রহ্মদর্শনের কথা বলেন, বাস্তবিক তাহা সাকার ব্রহ্মদর্শন। এই জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোরম, যাহা কিছু তেজস্বী, তাহাই বিশ্বপতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাদিগের মধ্যে আমরা সেই "আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" পরমপুরুষের দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইলে, আমরা কখনও তাহাদিগকে বাদ দিয়া কেবল তাঁহাকে দেখিতে পারি না। তাঁহাকে আমরা এই সকল জড় পদার্থের সহিত মিলিত ভাবে দেখিতে পাই। এই সকল পদার্থের সহিত মাখামাখিভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকি। ইহাদের আকার, অবয়ব, বর্ণ প্রভৃতি গুণের সহিত ঈশ্বরের সত্তা মাখামাখিভাবে আমরা ভাবিয়া থাকি। এখন এই সকল জড়পদার্থের আকারাদির সহিত মাখামাখিভাবে ঈশ্বরের চিন্তা ও তাহার উপাসনা, এবং প্রতিমার আকারাবয়ব ও রূপের সহিত মাখামাখিভাবে ঈশ্বরোপাসনা, এই উভয়ের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। সুতরাং প্রতিমা পূজা পৌত্তলিকতা হইলে, নগেন্দ্রবাবুর এই নিরাকার উপাসনা পৌত্তলিকতা না হইবে কেন? তারপরে, গুণবাচক পদার্থে, যেমন শিশুর সরলতায়, ঈশ্বরের চিন্তা করিতে হইলেও আমরা এই পৌত্তলিকতার হাত এড়াইতে পারি না। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে হইলে, অবশ্যই বৃক্ষ চিন্তা করিতে হইবে। শিশুর সরলতা চিন্তা করিতে হইলে সাকার সাবয়ব শিশুর মুখশ্রী অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে। এবং সেই "সরলতায়" ঈশ্বরের চিন্তা করিতে হইলে, শিশুর মুখাবয়ব সেই ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। অতএব ইহাও প্রতিমাতে ঈশ্বর চিন্তার ন্যায়, সাকার উপাসনা বা পৌত্তলিকতা হইল।

এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে, হিন্দুর প্রতিমা পূজা ও নিরাকারবাদীর জড়জগৎ সাহায্যে ঈশ্বর উপাসনা এক নহে। কারণ হিন্দু জড়মূর্ত্তিকেই পূজা করেন, আর ব্রাহ্ম জড়বস্তুর সাহায্যে তন্মধ্যস্থিত নিরাকার ব্রহ্মকে পূজা করেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া, কেবল জড় মূর্ত্তির পূজা করেন, ইহা কে বলিল? ক্ষুদ্র মৃত্তিকা খণ্ডের নিকট হিন্দু প্রণাম করেন—

> নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
> নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড শালগ্রামকে স্নান করাইতে করাইতে হিন্দু মন্ত্র পাঠ করেন—

> সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
> সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা ত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল মন্ত্র দ্বারা কি সেই মৃত্তিকাখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডকেই পূজা করা হয়, না অন্য কাহাকেও তাহাতে অধিষ্ঠিত জানিয়া তাঁহার পূজা করা হয়? অবশ্য এ কথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে, যে সকল ব্যক্তি এই সকল মন্ত্রদ্বারা পূজার বিধান করিয়াছিলেন, কিম্বা যাঁহারা তদ্দ্বারা পূজা করেন, তাঁহারা এতদূর গণ্ডমূর্খ যে, সামান্য মৃত্তিকাখণ্ডকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, অথবা প্রস্তরখণ্ডকে "অনন্তবাহূদর বক্ত্রনেত্র" সর্ব্বব্যাপী বিরাট পুরুষ জানিয়া তাহার পূজা করিবেন। মূল কথা এই যে, যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা এক

পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই নাই, ইহা জানিয়া যদি আমি সামান্য পাথরখণ্ডকেও এই সকল গুণান্বিত বলিয়া পূজা করি, তবে আমি যে সেই পরমেশ্বরকেই তদ্দ্বারা পূজা করিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই বুঝা যায়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার। (১০)

জন্ম কথা।

শ্রীমতী বর্ণ-পসবিণী লেখনী দেবীর বদনকমল বিনিষ্ক্রান্ত বর্ণ নিচয় অপবিস্ফুরিত হইলে লেখকের কি মস্যাধারের দুর্ভাগ্য, ইহা নিরূপণ করা সুদুষ্কর নহে। পক্ষান্তরে চিন্তাশীল লোকের মস্তকে একটি উপমস্তক স্থাপিত আছে, তদ্দ্বারাই তিনি কার্য্য করেন, সে মস্তক সকলের নাই, সেই হেতু সকলেই অশোক, জুলিয়স্ সীজর এবং শার্লেমাঁ নহেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যেমন এক একটী অতিরিক্ত মস্তক বিশিষ্ট, সেইরূপ তাঁহাদের অতিরিক্ত চক্ষুও থাকে, ইহা দ্বারা তাঁহারা অতিরিক্ত দর্শন করেন। ইহাকে অন্তর্দৃষ্টি বলিলে হানি নাই। যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আছে, তিনিই এ জগতে ধন্য ও সৌভাগ্যশালী। এরূপ মহত্তর ব্যক্তিবৃন্দের এ জগতে সুকর সকলি, সুদুষ্কর কিছুই নাই। আমার এমন কি সৌভাগ্য যে কোন অনধিগম্য চিন্তা দ্বারা সত্যমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করি; কিন্তু সত্যে প্রীতিই সংসারে মহাসৌভাগ্যের মূল। সত্য বলেই ইউরোপ মহামুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছে। আমার এই অনুসন্ধানে পরিশ্রম উৎপ্লাবিত হইলেও আমি কুণ্ঠিত হইব না। সত্যানুসন্ধানে আত্মাকে চরিতার্থ ও মনকে পবিত্র জ্ঞান করিব। হইতে পারে, খ্রীষ্টের জন্মালোক আলোকনে আমি অন্ধ, আমার দিব্য দৃষ্টি নাই। নেত্রাগ্রে আলোক ভেল্কী আসিয়া লাগিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্ট জন্মিলেন, ভুবন আনন্দকর তেজ দ্বারা নিখিল বিশ্বনিকেতন জ্যোতির্ম্ময় হইল; চন্দ্রকে নিবাইল, সূর্য্যের প্রচণ্ড জ্যোতিকে উপহাস করিল, বাইবেলকে মহিমান্বিত না করিয়া উপবাস্ত্রের ভগ্ন কুটীর দ্বারে উদাসীন্ত হইল কেন? ইহার অর্থ কি, আপনি বলুন। খ্রীষ্টের প্রধান ভক্ত ইবাঞ্জেলিষ্টগণ খ্রীষ্টের জন্ম সংক্রান্ত সকল কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন, বাইবেলে জমাও হইয়াছে, কিন্তু জন্মালোকের পরম আশ্চর্য্য ঘটনা খরচে বাদ দেওয়া হইয়াছে কেন? তবে কি উপশাস্ত্র যথার্থই ভৌতিক কাণ্ড? কৃপা করিয়া আমায় বলুন, আমি প্রাণে অনন্ত সুখ অনুভব করিব; সংশয় নির্য্যাতনে আমি ব্যথিত হইতেছি। ইবাঞ্জেলিষ্টগণ যাহা বলেন নাই, তাহাই কাল্পনিক, ইহাই ত শাস্ত্রীয় কথা, এ কাল্পনিক প্রসঙ্গ উপশাস্ত্রে কি হেতু উদিত হইয়াছিল? হয় বৌদ্ধ কিম্বদন্তিতে খ্রীষ্টোপাসকগণের ভ্রম হইয়াছে, কিম্বা যাহারা উপশাস্ত্র রচয়িতা, তাঁহারা ভিন্ন ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। কোন ভ্রান্তভাব তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টোপাসক বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। আমার অনুমান হয়, হুক এবং গাবে তিব্বতে যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্মকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মনে করিয়াছিলেন, উপশাস্ত্রে খ্রীষ্টোপাসকগণের সেইরূপ মতিভ্রংশ হইয়া থাকিবে। উপশাস্ত্রটা বৌদ্ধ শাস্ত্র বোধ হয়। ইহার বর্ণনাও সেই প্রকার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটী স্থল উদ্ধৃত করি-

রাশি। অনল সদৃশ উজ্জ্বল, সূর্য্য অপেক্ষা তেজস্বী এবং সুন্দর পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভাকর সেই রাজশিশুটীকে রাজা মহর্ষির সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

"The king took the child of a body radiant as fire, more resplendent than the sun, glorious as the full moon."
Lalita Vistara.II 147.

উল্লিখিত বর্ণনা ললিতবিস্তরের, ললিতবিস্তর গদ্য পদ্যময় সংস্কৃত গ্রন্থ, এবং বুদ্ধদেবের জীবন তত্ত্ব। ইহাতে ইবাঞ্জেলিষ্টদের ঐশিক বোধ প্রকাশ নাই। বৌদ্ধ স্থবির দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে বুদ্ধের যে আশ্চর্য্য রূপের বর্ণনা আছে, উপশাস্ত্রে ঠিক খ্রীষ্টের সেইরূপ রূপই বর্ণিত হইয়াছে।

"Repleta illa erat luminibus * * *
* "Filled with the lights, greater than the lights of lamps, candles, and greater than light of the sun itself"
Jone's Canonical Authority II. 160.

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, উহা উপশাস্ত্রেরই খ্রীষ্টরূপ বর্ণনা। খ্রীষ্টোপাসকেরা উহাকে উপশাস্ত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। উভয় লিপি উদ্ধৃত হইয়াছে, বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ উপশাস্ত্রটা কি?

গভীর চিন্তা ব্যতীত গভীরতর বিষয়ের নিরূপণ হয় না। বসুমতীর গর্ভে কোন্ স্তরের নিম্নে কোন্ স্তর আছে, এক দিনেই তাহা নিরূপণ হয় নাই, কল্য যে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা কোন্ বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া গিয়াছে, কে বলিতে পারে? বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের কথা সেইরূপ। সুতরাং তাহা দুশ্চিন্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তত্ত্ব কথা শৈবাল সহ তুলনা হয় না। মগ্ন হইয়া দেখুন, কোন্ সরোবরে মহাপদ্ম বিকশিত হইয়াছে। শিবগৃহ অবারিত, যাঁহার ইচ্ছা আছে, তিনিই প্রবেশ করিতে পারেন। ইহাই মহামন্দিরের মঙ্গলময় ব্যবস্থা। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অনার্য্য। প্রবেশ করিয়া দেখুন, অনার্য্য এবং আর্য্য ধর্ম্মের সম্মিলনের ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মহারাজা অশোকের ধর্ম্ম প্রসারণ, উক্ত ধর্ম্ম-বিস্তৃতি অনার্য্য দেশে, অনার্য্যগণের মধ্যে ঘটিয়াছিল, সেই ঐতিহাসিক ঘটনা, বোধ হয়, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সন্নিকর্ষ ঘটাইবার হেতু, ইহাই উপশাস্ত্রীয় অর্থব্যঞ্জক বোধ হয়। যাঁহারা ইতিহাসের বিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারাই ইহার পোষকতা করিবেন। আমি ক্রমে দেখাইব, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

বৌদ্ধেরা বলেন, নানা সুলক্ষণযুক্ত হইয়া সিদ্ধপুরুষেরা ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত পাঠে দুঃশীল দুরাত্মার কঠিন অন্তঃকরণে ভক্তিরস উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ বিশ্ববেদাঃ মুনীন্দ্র বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হইয়া তেজোময় মূর্ত্তিধারণ করিয়া পরিনামে সেই মূর্ত্তি পৃথিবীর হিতের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উপশাস্ত্রে ইহার সেই রূপের প্রতিবিম্ব পড়ে নাই কি? বুদ্ধের ধীরোদাত্ত ভাব খ্রীষ্টে কথনই তুলনীয় নহে। খ্রীষ্ট দরিদ্র কারিগরের শ্রম-সাধ্য কারখানায় প্রায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, কোন্ খনির খনি হইতে এ সন্ন্যাস রত্নের উদ্ধার হইয়াছিল, যোহন তাহা জানিতেন, কিন্তু, ইহুদীয় মনুষ্যেরা তাহা পরিজ্ঞাত ছিল কি? খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের সহিত ইহুদী বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মে নিকট-সম্বন্ধ বোধ হয় না, কিন্তু বৌদ্ধ কমণ্ডলু গ্রহণ এবং কাপালিক সন্ন্যাস

ধর্ম্মানুসরণ, এতদুভয়ের স্পষ্ট সন্নিকর্ষ দৃষ্টে বোধ হয় যেন উভয় সুহৃদে পরস্পর গাঢ় প্রেমালিঙ্গন হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য কি, আমায় বলুন। শুধু ইহাই নহে, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে বাইবেলে বৌদ্ধ পূর্ব্ব পরম্পরাগত বুদ্ধেতিবৃত্তের ন্যায় ঘটনা দৃষ্ট হয়। লুক্ লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়, পঁচিশের পদে লিখিত হইয়াছে—"আর দেখ জেরূশালেমে শিমিয়োন্ নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে ধার্ম্মিক ও শ্রদ্ধাশালী লোক, এবং ইস্রায়েের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিত এবং পবিত্র আত্মা তাহাতে অধিষ্ঠান করিতেন। আর্ প্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইলে 'তুমি মৃত্যু দেখিবেনা" এই কথা পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক তাহাকে জানান গিয়াছিল। সে আত্মার আদেশ ক্রমে মন্দিরে আইল এবং শিশু যিশুর মাতা পিতা যখন তাঁহার বিষয়ে ব্যবস্থানুযায়ী উচিত ক্রিয়া করিতে তাঁহাকে মন্দিরে আনিল, তখন সেও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিল, হে নাথ, এখন আপনি নিজ বাক্যানুসারে আপন দাসকে কুশলে বিদায় করিলেন। কেননা, আমার নেত্র যুগল আপনার এই ত্রাণোপায় দেখিতে পাইল।" খ্রীষ্টই পবিত্রাণের উপায়, ইহার সাক্ষ্য প্রদান জন্য শিমিয়োনের জন্মটা ঈশ্বরের একটী বিশেষ সৃষ্টি-কল্পনা। পাপীর পরিত্রাণের জন্য ত্রাণ-কর্ত্তা ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহুদীয়দিগকে এ পর্যান্ত এ কথা কেহই স্বীকার করাইতে পারে নাই, এখনও তাহাদের বিশ্বাস আছে, ত্রাণকর্ত্তা অবতীর্ণ হন নাই; জানিতে চাই, শিমিয়োন কে এবং ইহুদীয় লোকদিগকে কি সান্ত্বনা প্রদান করা হইয়াছিল? ইহার নাম পূর্ব্বে কেহ জ্ঞাত ছিলনা, ইহাকে কেহ চিনিত না, খ্রীষ্ট মন্দিরে নীত হইলে ইহার নাম তখন লোকে শুনিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইহার কোন পরিচয় নাই। ইহুদীয়দের গ্রন্থে যদি থাকে, বলিতে পারি না। শিমিয়োন্ আত্মার আদেশ ক্রমে মন্দিরে আসিয়াছিল। ইহা বড়ই বিবেক-বিরুদ্ধে, বুদ্ধি-প্রলোপকারী বাক্য। আত্মার আদেশ কি আমায় বুঝাইয়া বলুন, এরূপে বুঝাইয়া বলুন যেন বর্ব্বরেরা কুসংস্কারে না ডোবে। আত্মা কি সর্ব্বসময়, সর্ব্ব কালে সকলকে ঘুরাইতেছেন? মানিলাম, শিমিয়োন্ আত্মার আদেশ দ্বারা মন্দিরে আসিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে অভিষিক্ত ব্যক্তিকে কোলে লইয়া বিদায় প্রার্থনা করিতেছে। শিমিয়োনের কথার সার অংশটী এই, কিন্তু, বোধ হয়, ললিত বিস্তরের মহর্ষি অসিতের কথা অবিকল এইরূপ। শিমিয়োন জিয়ন পর্ব্বত বাসী, অসিত হিমালয় বাসী। শিমিয়োন্ আত্মার আদেশে খ্রীষ্টের নিকট আগমন করেন। মহর্ষি অসিত যোগবলে বুদ্ধের জন্ম জ্ঞাত হইয়া কপিলবাস্তু নগরে আগমন করেন। অসিত বৃদ্ধ, শিমিয়োন বৃদ্ধ। শিমিয়োন খ্রীষ্টকে ক্রোড়ে লইয়া ভগবদ্দর্শন জন্য হর্ষযুক্ত; অসিত বোধিসত্ত্বকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার বুদ্ধাবস্থা দেখিতে পাইবেন না, ভাবিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সাইমন্ ও অসিতের কথা গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখুন।

মথি-লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়, ৯ম পদে লিখিত আছে, যিশুর জন্ম হইলে বিদেশীয় জ্ঞানী মনুষ্যগণ তাঁহাকে ভজনা করিবার জন্য জেরুশালেম নগরে গমন করিয়াছিলেন। এই আগমন সম্বন্ধে কথিত আছে যে, পূর্ব্বদিকে আকাশে একটী তারা দৃষ্ট হইয়াছিল। শুনিয়াছি, ঐ তারাই তাহাদিগের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল, অর্থাৎ আকাশস্থ ঐ তারা দৃষ্টি করিয়া

তাঁহারা ঐ নগরে গমন করেন। পাঠকবর্গের সুগোচর আছে, বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিলে মহর্ষি অসিত ধ্যানে জানিতে পারিয়া নরদত্তের সহিত কপিলবাস্তু নগরে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে আগমন করেন। সচরাচর লোকে যে পথে যাইয়া থাকে, মহর্ষি তাহা করেন নাই, শূন্যে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদেশস্থিত জ্ঞানী লোকদিগের আকাশস্থ তারা লক্ষ্য করিয়া ভ্রমণের সহিত অসিত ঋষির আকাশ মার্গে যাত্রাটায় কেমন একটা নিকট সম্বন্ধ বোধ হয় না? বস্তুতঃ উভয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত অতি বিস্ময়জনক। কিন্তু উভয় ভ্রমণে আকাশ প্রধান অবলম্বন, স্থিরই আছে। যৎকিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ কষ্ট কল্পনা মাত্র বোধ হইতেছে। সুবিজ্ঞ ষ্ট্রস্ সাহেব একটী কাজের কথা বলিয়াছেন, ইহুদীয় রাজার জন্মগ্রহণের শুভ সংবাদ দূরবর্ত্তী বিদেশীয় জ্ঞানীদিগের কি প্রকারে কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহার কেহ কিছু নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন?

"How could heathen magi in a remote country of the east know anything of a Jewesh king about to be born? This is the first difficulty." Strauss I. 229.

ললিতবিস্তরে উক্ত আছে, বুদ্ধদেব পুষ্যা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। পণ্ডিত প্রবর কোলব্রুক্ লিখিয়াছেন, কর্ক্কট রাশিতে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল।* খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে কেবল এই কথা প্রচার আছে যে, পূর্ব্বদিকে একটী তারা উদয় হইয়াছিল এবং ঐ তারটী লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানী লোকেরা জেরুশালেমে আগমন করেন। তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহুদীয়দের যে রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? আমরা পূর্ব্বদিকে তাঁহার তারা দেখিয়াছি।" যে সময়ে তাঁহারা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎকালে ঐ তারা তাঁহাদের মস্তকের উপরেই ছিল। ইহা মস্তকের উপরে বিদ্যমান থাকিতেও তাঁহারা পূর্ব্বদিকে তারা দেখিয়াছি, এরূপ বলিলেন কেন? ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করতঃ ঐ অত্যুজ্জ্বল তারাটী লক্ষ্য করিয়া আমরা জেরুশালেমে আসিয়াছি, একথা না বলিয়া অলক্ষ্য ভাবে বলা হইল কেন? বোধ হয় যেন পূর্ব্বে অন্য কোন সময়ে জ্ঞানী লোকেরা তারা দেখিয়াছেন, এক্ষণে তারা অদৃষ্ট হইয়াছে, কেবল মনের সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, তারা তাহাদের মস্তকের উপরই বর্ত্তমান ছিল। আর এক কথা, গ্রহাদির ন্যায় নক্ষত্রের গতি এত ক্ষিপ্র, এরূপ কথা কখনও শুনি নাই। নক্ষত্রের এত ক্ষিপ্র গতি হইলেও মনুষ্য গতি তাহার সমরূপ বা তুল্য নহে। জ্ঞানী লোকেরা নক্ষত্রের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া জেরুশালেমে উপনীত হইয়াছিলেন, এ কথা আমার বিবেচনায় নিতান্ত বিস্ময়কর। মনুষ্যের নক্ষত্র সহ তুল্য গতি, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, ক্ষুদ্র মানব নক্ষত্রের অনুগমন করিয়াছিল, ইহা কি আশ্চর্য্য কথা নহে? ইহা যদি সম্ভব হয়, মানব সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া এক দিবসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে বাধা কি? আকাশস্থ গ্রহের অনুসরণ করিয়া কত কালে মনুষ্য তাহার নাগাল ধরিতে পারে? বাইবেলে উল্লিখিত আছে, "পূর্ব্বদিকে তাহারা তারা দেখিয়াছিল, সেই তারা তাহাদের অগ্রে অগ্রে গিয়া যে স্থানে শিশুটী আছেন, তাহার উপরে স্থগিত হইয়া রহিল, তারাটী দেখিয়া তাহারা মহানন্দে উল্লাস করিল।" এ গুহ্য তত্ত্বকথা বোধ হয় মহাদেবতা জানিতেন না। তাহা হইলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ভগবতীকে অবশ্যই ইহা বলিতেন। নব্য

* "Essays," Vol. II. P. 334.

দার্শনিক কিম্বা জ্যোতির্ব্বিদ্ এ তত্ত্ব-মহিমা কিছুই বুঝেন না, আবু পর্ব্বতের শিখরের ঊর্দ্ধে যে তারাটী অবস্থিত বোধ হইল, তাহার ব্যাস কি বাস্তবিক এত ক্ষুদ্র যে পর্ব্বতের নিম্নস্থ অধিবাসীর নিকট হইতে তাহা অনেক দূরে অবস্থিত বোধ হইতে পারে? শিশুটী যে স্থানে ছিলেন, তারাটী ঠিক তাহার উপরে স্থগিত হইয়া রহিল। ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ক্রমশঃ

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চণ্ডীদাস। *

আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর হইল বীর-ভূমে রাঢ়দেশে নান্নুর গ্রামে, এক বিপ্রবটু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ চাষ বাস করিতেন, রাতের বেলা চণ্ডীমণ্ডপে মাদুর পাতিয়া, মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়া, তুলট কাগজে খাগের কলমে কি হিজিবিজি লিখিতেন। আর লোকে বলে, এক ধোপা-নীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করিতেন। ধোপানীর নামটী ঠিক জানা যায় নাই, কেহ বলে তাহার নাম রামী। বোধ হয় যেন "রজকিনী রামা" সম্বোধন হইতে রামীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণের অবস্থা ত এইরূপ, স্বভাব চরিত্রও এই রকম। কিন্তু সেই হিজিবিজি অক্ষরে নাকি এমন মধু ঝরিত যে, বিশালাক্ষী দেবী সেই কথা-গুলি শুনিতে লালায়িত হইতেন এবং এই পাঁচশত বৎসর বাঙ্গালী সেগুলি বুকে পুরিয়া রাখিয়াছে। রসিকশেখর শ্রীচৈতন্য যত শুনিতেন, ততই উন্মত্ত হইতেন। তথাপি তাঁহার পূর্ণগ্রন্থ কৃষ্ণকীর্ত্তন পাওয়া যায় নাই, কয়েকটী খণ্ড কবিতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ত তবে সামান্য নয়। এই কবিকুল চূড়ামণির নাম চণ্ডীদাস। কত নবাব-সুবোর নাম লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কেহ ভুলিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র বিদ্যাপতির কবিতা সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। তাহার সূচনায় তিনি সংক্ষেপে চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ নামক গ্রন্থে চণ্ডীদাসের কতকগুলি পদ পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে একত্র করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবাসী-যন্ত্র হইতে ঐ গ্রন্থ পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে প্রেমহার নামক সংগ্রহ গ্রন্থে চণ্ডীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও কয়েকটি পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাবু রমণীমোহন মল্লিক সম্প্রতি "বিস্তৃত জীবনী, টীকা ও সমালোচনা-সমেত" চণ্ডীদাসের পদাবলী আবার প্রকাশ করিয়াছেন।

অতি আগ্রহে আমরা এ সংস্করণটী সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু নিতান্ত দুঃ-খের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা গ্রন্থ

---

* মেহেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রমণী মোহন রায় সংকলিত, মূল্য ১৲।

গতবারে ভুলক্রমে "কাব্য কুসুমাঞ্জলির" নাম "কবিতা কুসুমাঞ্জলি" লেখা হইয়াছে। এই কাব্যকুসুমাঞ্জলি নব্যভারত কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১৲।

দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি। বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র চণ্ডীদাসের যে জীবন বৃত্তান্ত বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, মল্লিক মহাশয়ের "বিস্তৃত জীবনীতে" তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু দেখিতে পাইলাম না। তাহার সমালোচনা অতি অকিঞ্চিৎকর। তিনি প্রেমের মহিমা অনেক কীর্ত্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পড়িলেই বোধহয়, তিনি এখনও জলের উপরে সাঁতার দিতেছেন। না ডুবিলে কি কখন প্রেমের মাধুর্য্য বুঝা যায়? সে স্বর, সে আবিষ্ট নয়ন, সে কম্পিতদেহ, সে ত্রাসিত চমক এখনও তাহার হয় নাই। এখন চণ্ডীদাসের কবিতা সংগ্রহ করিবার অধিকার মল্লিক মহাশয়ের জন্মে নাই।

এ গ্রন্থে বর্ণাদিক্রমে পদাবলীর একটী তালিকা দেওয়া থাকিলে পাঠকের পড়িবার সুবিধা হইত। এ গ্রন্থে যে টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোন সাহায্য হয় না। পরিহরি মানে পরিত্যাগ, দরিয়ায় মানে নদীতে, লেখা আছে। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই "গঞ্জনা সহিতে,নারি আচরিতে, মরম কহিনু তারে" লেখা আছে, তাহার কি অর্থ মল্লিক মহাশয় নিজেও বুঝেন নাই, অন্যকেও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই।

দুই খানি গ্রন্থের তুলনা করিয়া বোধ হইল, বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকারের সংস্করণ দেখিয়া এ গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা ইহাতে প্রায় এক-শত পদ অধিক সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু পদগুলির পাঠ ও সজ্জা দেখিয়া বোধ হইল, যেখানে পথ পাইয়াছেন, রমণী বাবু সেই-খানেই মহাজন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে পাঠান্তর লক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু সে গুলি তাঁহার ভ্রমে বা মুদ্রাকরের ভ্রমে ঘটিয়াছে, আমরা বলিতে পারিলাম না। অশুদ্ধি পত্র না থাকাতে আমাদের এই সন্দেহ জন্মিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকারের গ্রন্থে যে পাঠ অশুদ্ধ আছে, রমণী বাবুর গ্রন্থেও সেই অশুদ্ধি জন্মিয়াছে, কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া গেল :—

	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৮পৃঃ	তিলে তিলে এসে যায়	...	আসে
	ভবণ খসায়ে পরে	...	খসিয়ে পড়ে
৫৭পৃঃ	বন্ধুর পিরীতি আপনা বেচিনু	...	বঁধুর পিরীতি
৯৪পৃঃ	পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া	...	দড়বড়ে
১৬৬পৃঃ	পিরীতি রতন লভিল সে জন	...	যে জন
১৭৮পৃঃ	আহ ২ পড়েছে রূপে কাজরের শোভা	...	মুখে
,,	বরমণ দংশনে অঙ্গ জরজর	...	দশনে

দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে মল্লিক মহাশয় গ্রন্থ খানি ছাপাইলে আমরা বিশেষ প্রীত হইতাম। কবিতা সঙ্কলনে তাঁহার সামান্য পরিশ্রম হয় নাই, এবং যে গ্রন্থ বিক্রয়ের সম্ভাবনা অল্প, অনুরাগ না থাকিলে কেহ যত্ন পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তাহা মুদ্রিত করিতে চাহে না। তথাপি চণ্ডী-দাসের পদাবলি সঙ্কলনে যে অনুরাগ, যে প্রীতি, যে ভক্তির প্রয়োজন ছিল,রমণী বাবুর তাহা অদ্যাপি জন্মে নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার গ্রন্থে অক্ষয় বাবুর সঙ্কলন অপেক্ষা প্রায় একশত (৯৮) পদ অধিক আছে। এ কয়েকটী পদ নূতন সংগ্রহের জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক গুলি অন্য কবির পদ আছে। সংগ্রহে আর একটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্ডিতার পদ রসোদ্গারে, রসোদ্গা-রের পদ বিপ্রলব্ধায়, এইরূপ কয়েকটী পদ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। রমণী বাবু যথেষ্ট পরি-

শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পদ সমুদ্র ও গীতচন্দ্রোদয় মিলাইয়া দেখিলে তিনি আরো প্রায় একশত পদ নূতন সংগ্রহ করিতে পারিতেন। আমরা গীতচন্দ্রোদয় হইতে পাঁচটী নূতন পদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলাম। তাঁহার আবশ্যক হইলে অন্য অনেকগুলি ভবিষ্যতে দিতে পারিব।

১ তোড়ী।

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত অন্তরে নয়ন ঝবে।
বুঝি অনুমানি কালারূপ খানি তোমারে করিয়া ভোরে॥
দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা নাহত এবড় ভারে।
সে বর নাগর গুণের সাগর কিবা না করিতে পারে॥
শুন শুন রাই কহি তুয়া ঠাই ভাল না দেখি যে তোরে।
সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি আছয় গোকুল পুরে॥
ইহাতে এখন দেখি যে কেমন নাহিলাজ গুরু ভরে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নব রসে বুঝিলে বুঝিতে নারে॥

২। শ্রীরাগ।

তরুণী হরিণী রাই দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দেখিয়া দিয়া ছানিয়া গড়িল কুল বা রূপে॥
সখি কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কটোরি কুচ যুগ গিরি কনক মন্দির লাগে।
তাহার উপর চূড়াটি বানাইলে সে আর অধিক ভাগে॥
কেমন কারিকর বানাইলে ঘর দেখিতে না পালো তারে।
দেখিতে পাইতু নিরূপা করিতু এমন মন যে করে॥
এমন মন্দিরে শয়ন করয়ে সে মেন নাগর কে।
হৃদয়ে আছিল বেকত হইল দেখিতে না পালু সে॥
হিয়ার মালা যৌবন ডালা পশারি পশারে যেন।
চাঁদ যে কাটিয়া চাকা যে করিয়া তাহে বসাইল তেন॥
অধরসুধা পরিলে জুলা দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয় এমতি করয় তাহাতে যাইয়া পশি॥
চণ্ডীদাসে কয় ও কথাটী হয় মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে কহ জানি পাছে তবে সে কুতাহ রটে॥

৩। কামোদ।

সখিগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ মণির কিরণ সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরী সদাই মনেতে জাগে॥
সই সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া অব ত এ হিয়া ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন তোমারে কহিনু দড়।
কহে চণ্ডীদাস পুরাহ লালস নাগর আতুর বড়॥

৪। ধানসী।

নাগর গুণের ধাম। জপয়ে তোহারি নাম।
শুনিতে তোহারি বাত। পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করে শির। লোচনে ঝরয়ে নীর।
যদি বা পুছয়ে বাণী। উলট করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তোহায় রীতে। আন না বুঝবি চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়। বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

৫। ধানসী।

সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্রমন্ত্র কিছুই না মানে॥
কালার লাগিয়ে হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল, প্রাণ নিল বাঁশী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে?
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ঋষির ভ্রম।

(বিপাশাতীর—প্রাতঃকাল।)

১

"আছি ত একই আশে, উদিবে বিমল-ভাসে,
অমানিশীথিনী-পারে সহস্র কিরণ;
কি তীরে, কি নীলাম্বরে, অদ্বৈত মাধুরী ঝরে,
পলে পলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ব্রীড়া-আবরণ।
আছি তাই অনুদিন, চাহিয়া পলকহীন,
থমকি বিপাশা সেও ভুলে গেছে নাট;—
খুলিবে প্রভাত-রাণী, হীরক-অর্গল টানি;
দীপ্ত পদ্মরাগময় আকাশ-কপাট।
চড়িয়া হিরণ্য-সেতু, উড়ায়ে বিচিত্র কেতু,
আনন্দে পশিব মেয়ে জ্যোতির্ম্ময় ধাম;

অগস্ত্য-গণ্ড্ষে শুষ্কি চুমায় লবে সে চুষি—
রাঙা ঠোঁটে হব হাসি—অমৃত নির্ব্বাণ!"
প্রতীক্ষা-বিহ্বল ঋষি, গায় আঁখি জলে ভাসি,
প্রস্ফুরিত-কম্বুকণ্ঠে সরমা-আহ্বান;
তমোগ্রন্থি একে একে, টুটিছে সে মন্ত্র-ডাকে,
অগ্রলক্ষ্যা ফাঁকে ফাঁকে ঘুরায় নয়ান!
গড়ায়ে সুমেরু-বুকে, ঢেকেঁদে যেন শতমুখে,
ভাঙিছে উদয়-তটে গায়ত্রী-হিল্লোল;
নলিন-কোরক-করে চেপে' হাসি রাখে ধরে;—
চকিতে ফাটিয়া হাসি খসে দিঙ্‌নিচোল!
তবু হেসে' কুট্‌কাট্‌, তবু সে অনন্ত ঠাট—
খোলে-খোলে-খোলে দ্বার, খোলে না আবার;
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তা'র, তাপস-হৃদয়ে আর
ঘাটে ঘাটে বাজে বীণা আশা-নিরাশার!

২

সহসা,
ধ্বনিছে উদয়-পথ— আসে ওই উল্কাবৎ,
নাচায়ে বঙ্কিম গ্রীবা, সপ্ত তুরঙ্গম!
ক্ষিপ্ত দৃপ্ত খুরঘা'য়, ভেঙ্গে' চুরে' মেঘকায়,
ঝলকে কনকধূলি ছাইছে গগন!
ত্রস্ত উষা ছুটে,—করে, শ্লথ কটিবাস ধরে,
যেতে শ্রস্ত নভোময় চিকুর-প্রপাত!—
লাজে ভয়ে গুলজার, খোলে দ্রুত প্রাচীদ্বার,
ঊর্দ্ধবাহু ডাকে ঋষি, "দাঁড়াও, প্রভাত!"
নিমেষে সকলি ফাকি— অবরুদ্ধ দ্বারে ঠেকি'
বিলোড়িছে মহাশূন্য প্রতিধ্বনি তার!
হানে চণ্ড দিবাকর অজস্র আগ্নেয়-শর,
প্রহরে প্রহর ডোবে,—যোগী নির্ব্বিকার!—
"একি স্বপ্ন? একি মায়া?— এ শুধু উষার ছায়া?
জ্বলেছে কি মোরি হিয়া, নহে নীলাকাশ?
হাসেনি সে অপ্সরী, এ শুধু সোণার ছুরী,
স'তারে কধিরে মোরি, ধাঁধিয়া নিশ্বাস?"

৩

অস্তাচলে নামে রবি, রোষে রক্ত জবাছবি,
নিশ্বসি' পশ্চিম-সন্ধ্যা আসে ধীরে ধীরে;
দেবতার অশ্রুবারি, গলিয়া পড়িল ঝরি;
রোমাঞ্চিয়া বনস্পতি, তাপসের শিরে!—
সে ত্রিদিব-রসায়নে, আবার চেতিলা প্রাণে;
ভাবিলা ফিরিয়া—কণ্ঠ কোমল, তরল!—
"তুমি কি উষার দিদি?— আর আসিব না কাঁদি,
ক'ও তারে—খুলিয়াছে হীরক-অর্গল!
পশিয়াছি, বহু ঘুরে,' সেই হিরণ্ময়-পুরে,
কোটী সূর্য্য সে জ্যোতির কণা কণা ছার!
সে তীক্ষ্ণ-চুম্বনে, মোর ছিঁড়েছে বিষয়-ডোর—
সব ভুলে' তারে লয়ে আছি অনিবার!"

৪

ঈষৎ মধুর হাসি' আশ্রমে চলিলা ঋষি;
মূঢ় কবি করে মুহুঃ মাথা-কণ্ডুয়ন,—
চপলা প্রভাত-রাণী দেছে ধরা হার মানি!!—
পাঠক! বকিল কিও, বিটলা বামণ?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

বিলাত ফেরত ও জাতিচ্যুতিকর্ত্তা।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মে অকপট বিশ্বাসী, তাঁহারা বিলাত-ফেরত হিন্দুকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য প্রয়াসী নহেন। তাহাতে এই প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হয়, তবে বিলাত-ফেরত হিন্দুকে সমাজ-চ্যুত করা পক্ষে উদ্‌যোগী ও প্রয়াসী কে? সেই প্রশ্নের উত্তর এই প্রবন্ধে দিতেছি।

সকল সমাজেই হিংস্রক ও পরশ্রীকাতর লোক আছে। কাহারও কোন বিষয়ে উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হইলে, এই সকল লোক অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। কোন গতিকে অন্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথে বাধা দিতে পারিলে, অথবা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে বিপন্ন করিতে পারিলে, এই সকল দ্বেষ্টাগণের অন্তর্দাহ কতক পরিমাণে উপশমিত হয়। ইহারা, একজন উন্নত ব্যক্তিকে নত করিবার জন্য, দশজন লোককে লইয়া দল বাঁধে। ইহারাই

গ্রামে দলাদলির আগুন জালিয়া দেয় এবং গ্রাম ছার খার করে। যে সকল হিন্দু বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহারা প্রায়ই, কেহ সিভিলিয়ান, কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ ডাক্তার ইত্যাদি উচ্চপদ লাভ করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করেন। বিলাত না গিয়া কেহ উন্নতি লাভ করিলে, তাহাকে বিপন্ন করা সহজ নহে। কেননা তাহার একটা ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইবে। আবার সেই ছিদ্র এমন হওয়া চাহি, যাহা সমাজের অধিকাংশ লোকের নাই। কারণ অধিকাংশ লোকের যে দোষ আছে, কেবল মাত্র তাহা উপলক্ষ করিয়া একজনকে পীড়ন করিতে যাইলে অধিকাংশ লোকই তাহাতে সম্মত হইবে না। কিন্তু বিলাত-ফেরত হিন্দুকে পীড়ন করিবার জন্য হিংস্রক লোকদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কেননা বিলাত যাওয়া ছিদ্র বা (কল্পিত) দোষ সমাজের অধিকাংশ লোকের নাই। ইহা নূতন এবং অনেকের মতে হিন্দুশাস্ত্র-বিরোধী। হিন্দু-শাস্ত্র, বিরোধী কার্য্য যথা কুক্কুট ভোজন, যবনান্ন ভক্ষণ ইত্যাদি কার্য্য ত এখানে থাকিয়া অনেকে করিতেছেন, তাহাতে তাহারা একঘরে হন না কেন? তাহার উত্তর (১) তাঁহারা 'হাজার ঘরে' অর্থাৎ বহুসংখ্যক। হয়ত হিংস্রক ব্যক্তিরা নিজেই কোমল কুক্কুট মাংসলোলুপ, হয়ত নিজেই যবনান্ন-ভোজী। (৫) আর কুক্কুট বা যবনান্ন ভোজন কিছু সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করে না। সুতরাং হিংসা প্রবৃত্তি তাহাতে উদ্দীপিত না হইতে পারে। কিন্তু বিলাত গমনে অধি-কাংশস্থলে সাংসারিক উন্নতি আছে,(২) ছিদ্র আছে, (৩) এবং ছিদ্র অল্প লোকের আছে। সুতরাং হিংস্র ব্যক্তিদিগের বড়ই সুবিধা। খবর আসিল, কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বিনয় কুমার বিলাত হইতে আসি-য়াছে। কেবল বিলাত হইতে আইসে নাই, সিবিলিয়ান হইয়া আসিয়াছে। পরশ্রীকাতর ব্যক্তির হিংসার শিখা দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল। হিংসাদাসের মুখ আঁধার হইয়া যাইল। সে ভাবিল, [গোল পাকাইতে হইবে ; এখন হইতে তাহার সূত্রপাত করিয়া রাখা যাউক। সে তখন হন হন করিয়া কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাইল। কেদার বাবুর ওখানে খুব পাশার ধুম। যখন "কচে বার" শব্দ থামিয়া গেল, পাশা উঠিয়া গেল, তখন একথা সে কথার পর হিংসা-দাস বাবু হুঁকা হাতে করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে, বলিলেন "ওহে, কৃষ্ণনাথের পুত্র বিলাত হইতে আসিয়াছে, শুনিয়াছ কি?" শ্যামাচরণ ভাদুড়ী বলিলেন, "হা শুনিয়াছি ছেলেটী বেশ।" তখন হিংসাদাস বাবু বলি-লেন ছেলেটী ভাল, তাও তুমিও জান আমিও জানি। আর সিবিলিয়ান হইয়া আসিয়াছে। পরম সুখের বিষয়? তবে সমাজে চলিবে কি?" তখন ভোলানাথ গাঙ্গুলী বলিলেন "আমরা দশ জন চালাইলেই চলিতে পারে"। হিংসাদাস বাবু তখন তাঁহার ললাট কুঞ্চিত করিয়া, মুখ গম্ভীর করিয়া, বলিলেন মহাশয় আপনি ত বলিলেন, কিন্তু দশ জন চলে কই? আমার বড় আশঙ্কা হয়, ছেলেটীকে লইয়া বড় গোল হইবে।" সেই বৈঠকে হীনকাণ্ড ঘটক মহাশয় ছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি গরিব গুণহীন, আমাকে কেহ গ্রাহ্যই করে না। এইবার দেখিব, আমাকে গ্রাহ্য করে কি না; শর্ম্মারাম

একটা ব্যক্তি কি না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধুগণ আমাকে পায় না ধরিলে আমি কখনই তাঁহার পুত্রকে সমাজে লইতে দিব না। এ দিকে অর্থ-মুগ্ধ স্মৃতিরত্ন মহাশয় বসিয়া আছেন। কেদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,"স্মৃতিরত্ন মহাশয়,বিলাত-ফেরত চলিতে পারে কি? তিনি উত্তর দিলেন,চলিলেই চলিতে পারে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আশ্রয় লইলে তাঁহারা অবশ্য ইহার প্রতিকার করিতে পারেন। তবে ব্যয় বাহুল্যে কাতর হইলে এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।" তখন হীনকান্তি বাবু বলিলেন সে" হাঁ, ব্যয় করা চাই বই কি? তাহার উপর নরম হওয়া চাহি, দশ জনের বাটীতে যাওয়া চাহি, একটু কাকুতি মিনতি করা চাহি। তাহা না হইলে লোকের মন ভিজিবে কেন? সে সে দোষ নহে। বিলাত যাওয়া দোষ। সহজে কি তা কাটিয়া উঠা যায়?" তখন হিংসাদাস বলিলেন "তা বটেইত"। হীনকান্তি বাবু উঠিলেন। হিংসাদাসও উঠিলেন। দুইজনে কথা কহিতে কহিতে হিংসাদাসের বাটীতে যাইলেন। সেখানে ধূমপান করিতে করিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কি করিয়া এক-ঘরে করিতে হইবে, তাহার মতলব ঠিক হইল। তাহার পর দিন হিংসাদাস ও হীনকান্তি এর বাড়ী ওর বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বিবাদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ওখানে যাইলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মামলা হইয়াছিল। তাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই হারিয়াছিলেন। হিংসাদাস মহাশয় বিবাদনাথ বাবুকে বলিলেন 'মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বিলাত হইতে আসিয়াছেন। আপনার সঙ্গেত অনেকদিন হইতে খাওয়া দাওয়া নাই। আপনার ত কোন গোলই নাই। আমরা এখন কি করি বলিতে পারেন?" তখন বিবাদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বামা তামাক দে" হাঁকিয়া, বলিতে লাগিলেন—"আমার সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খাওয়া দাওয়া নাই সত্য। আমার সঙ্গে—একটা মামলা হইয়াছিল, তাহাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জাত্যংশে আমি কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এ বিষয় সকলকেই নিজে নিজে সাবধান হইয়া চলিতে হয়। আমি নিজের বিষয় এই বলিতে পারি যে, যাঁহারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এখন খাওয়া দাওয়া করিবেন, আমি তাহাদিগের সহিত খাওয়া দাওয়া করিতে পারিব না।" হিংসাদাস ও হীনকান্তি বাবু এই কথা শুনিয়া মহা হর্ষে তাহা এবাড়ী ওবাড়ী প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "অমুক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অমুক খাইবেনা, তজ্জন্য তাহার ভগিনীপতি খাইবে না, ভগনীপতিকে ছাড়িয়া ভগিনীপতির মামা খাইবেনা, অমুক খাইবে না, অমুক খাইবে না," ইত্যাদি। ইতিমধ্যে কাশীদাস গাঙ্গুলীর মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইল। গাঙ্গুলী মহাশয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধু ও সদাশয় ব্যক্তি। তিনি নিমন্ত্রণে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বাদ দিতে ইচ্ছুক নহেন। তখন হিংসাদাস বাবু ও হীনকান্তি বাবু ও বিবাদনাথ বাবু ও অর্থমুগ্ধ স্মৃতিরত্ন মহাশয়, সায়াহ্নে শ্রাদ্ধের বাটীর প্রাঙ্গণে তাহাদের দলের লোক লইয়া

আসিয়া একটা পার্লিমেণ্ট বসাইয়া দিলেন। সেই শ্রাদ্ধের উপলক্ষে তখন সরলতা, যুক্তি, ধর্ম্মের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকই এমন স্বার্থপর যাহাতে নিজের কিছু অনিষ্ট নাই, অথচ অন্যের ঘোরতর অনিষ্ট আছে, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য, সামান্য আয়াস ও স্বীকার করিতে চাহে না। অন্যে মরে মরুক, আমার কি—এইরূপ ভাবিয়া থাকে। তাহার উপর আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকই, যে কারণেই হউক, অতিশয় ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীন দেশের লোকেরা কর্ত্তব্যসাধনের আহ্বানে, মৃত্যুরূপিনী জলন্ত শিখাতে মাভৈ মাভৈ রবে অবলীলাক্রমে লম্ফ দিয়া পড়িতেছে। যেখানে বিপদ, যেখানে বাধা, যেখানে কষ্ট, সেখানে তাহাদের তেজের অদম্য স্ফুলিঙ্গ শতধা বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সত্যের অনুরোধে, পরোপকারের অনুরোধে, পর-পীড়ন-নিবারণ-সংগ্রামে স্বাধীন দেশে মহানুভব ব্যক্তিগণ সময় শ্রম, ধন, প্রাণ জলের ন্যায় ঢালিয়া দিতেছে হিন্দুসমাজে ঐরূপ বীরত্ব দেখিতে পা[illegible] [illegible]খনও অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু [illegible]জ যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বিলাতে যাওয়ায় দোষ নাই, অধর্ম্ম নাই, বরঞ্চ বিলাত-ফেরতদিগের পীড়ন করাতে দোষ ও অধর্ম্ম আছে, দেশের অমঙ্গল আছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশ লোকই বিলাত-ফেরত পীড়ন বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, হিংসাদাস ও হীনকান্তি বাবুদিগের ও অর্দ্ধ-মুগ্ধ স্থবিরত্ব মহাশয়দিগের আত্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, পরপীড়াদায়ক কার্য্যের সাধ্যমত প্রতিবাদ ও প্রতীকার না করিয়া, তাহাতেই তাঁহারা সৃষ্টণ করিতে করিতে যোগ দেন।

এখন আমরা দেখিলাম, বিলাত-ফেরতদিগের পীড়ন করার মূল (১) হিংসা ও হীনতা (২) উদাসীনতা ও স্বার্থপরতা (৩) ভীরুতা বা কাপুরুষতা, এই তিনটী কারণ ব্যতীত আরও একটি কারণ আছে। তাহা ভ্রান্তি। কতকগুলি লোক সরলভাবে বিশ্বাস করেন যে, বিলাত-প্রত্যাগত যুবক হিন্দুসমাজে গৃহীত হইলে সমাজের অমঙ্গল হইবে। যাঁহারা সরল বিশ্বাসের উপর কাজ করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেও আমাদিগের অশ্রদ্ধার পাত্র নহেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই বিশ্বাসের কারণ কি, তাহা আমরা কখনই তাঁহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে শুনি নাই। যাহা হউক, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বিলাত যাওয়া অনিষ্টকর। এবং তাহা অনিষ্টকর বলিয়া সামাজিক শাসন দ্বারা তাহা দমন করা উচিত। এখন দেখা আবশ্যক, কি জন্য তাঁহাদিগের মতে বিলাত গমন অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বিলাত যাইলে হিন্দু নিষিদ্ধ ভক্ষণ করে। এইটি-বিলাত-গমন বিরোধিতার কারণ বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু বিলাত না গিয়া হিন্দু সন্তান এখানেই ম্লেচ্ছান্ন ভোজন করিতেছেন। তাহাতে সামাজিক, শাসনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। বিলাত যাইলে সাহেবি চাল চলন হইয়া যায়। ইহাও বিরোধিতার প্রকৃত কারণ বোধ হয় না। কারণ বিলাত না গিয়া এখানেই যাঁহাদিগের অবস্থা কতকটা ভাল, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোর্ট পেনটুলেন কলার কণ্ঠবন্ধে ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, প্রভেদ এই, বিলাত-ফেরতদিগের যে সাহসটুকু আছে, ইহাদিগের তাহা নাই। বিলাতে যাইলে

স্বকীয় সাহিত্যের উপর অনুরাগ থাকে না। ইহাও প্রকৃত কথা নহে। কারণ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ন্যায় কয়জন হিন্দু বিলাত না গিয়াও স্বদেশের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন? বিলাতফেরত ব্যক্তিগণ গুরুজনের মান্য করে না। ইহাও সত্য নহে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই মহাশয়দ্বয়ের মাতৃভক্তির কথা কে না জানে? পিতামাতা ও অন্য গুরুজনকে ভক্তি করে না, এমন কুষ্মাণ্ড যেমন অবিলাত-গত হিন্দুদিগের মধ্যেও আছে, তেমনি বিলাতগত হিন্দুদিগের মধ্যেও আছে।

দেশের লোকের প্রতি মায়া মমতা থাকে না; এ কথাও খাটে না। দেশের লোকে বিপন্ন হইলে বিনা পয়সায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের যেরূপ তাঁহার মূল্যবান সময় অকাতরে ব্যয় করেন, অবিলাতগত কয়জন উকীল তাহা করিয়া থাকেন? শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ দেশের জন্য শ্রম করিয়া থাকেন, কয়জন অবিলাতগত ব্যক্তি তাহা করিয়া থাকেন?

বিলাত হইতে আসিয়া অনেকে কেবল মদ খাইতে শিখিয়া আইসেন এবং দাম্ভিক হয়েন। এই কথা লিটনার সাহেব কয়েকমাস হইল বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। "অনেকে" নহে। কেহ কেহ হইতে পারে। পদ ও ধন বিলাত না যাইলে যেমন অনেককে দাম্ভিক করে, বিলাতফেরতের মধ্যেও সেইরূপ করে। পূর্ব্বে বি এ, এম এ, ধারীগণ কতকটা আপনাদিগকে বড়লোক মনে করিতেন। এখন বি-এ, এম-এ অনেক। সুতরাং বি-এ, এম,এ এখন আপনাদিগকে আর তেমন বড় বিবেচনা করেন না। তেমনি এখন যদিও বিলাত-ফেরতগণ সংখ্যায় অল্প থাকায় আপনাদিগকে কথঞ্চিৎ বড় বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক হইলে, আপনাদিগকে আর বড় বিবেচনা করিবেন না। বিলাতফেরত সম্প্রদায় একটা ঘৃণার্হ দল নহে, বরঞ্চ মান্যার্হ, বিদ্বান, দক্ষ, দেশহিতৈষী, এবং কোন কোন গুরুতর বিষয়ে দেশের নেতৃগণের মধ্যে গণ্য, ইহাই যে অধিক শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস, তাহা বাঙ্গালা দেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

যে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ বিপদে আমাদিগের সহায়, সাহিত্যে আমাদিগের গৌরব, রাজনীতি-রণে আমাদিগের সেনাপতি, ব্যবস্থাপক সভায় আমাদিগের প্রতিনিধি, আমরা কোন্ লজ্জায় তাঁহাদিগকে অনর্থক পীড়ন করিতে চাহি? যে সম্প্রদায় জাতিতে আমা[illegible]র অঙ্গ, শোণিতে আমাদিগের ভ্রা[illegible]র্ম ও বিশ্বাসে, বিপদে ও সম্পদে [illegible]গের সহিত অভিন্ন, কোন্ প্রাণে আমরা তাঁহাদিগকে ভিন্ন করিতে চাহি? তাঁহারা নিজেরা হিন্দু সমাজ ছাড়িয়াছেন, এ কথা সত্য নহে। আমরা, কেহ হিংসায়, কেহ হীনতায়, কেহ উদাসীনতায়, কেহ স্বার্থপরতায়, কেহ কাপুরুষতায়, কেহ কপটতায়, কেহ বা ভ্রমে পড়িয়া তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে ভিন্ন করিয়া দেই। কি লজ্জার কথা!! কি দুঃখের কথা!!!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

একাদশ খণ্ড—দ্বাদশ সংখ্যা। চৈত্র—১৩০০।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা,

৫১।২ নং কালুঘোষের লেন, "মণিকা-যন্ত্রে" শ্রীনটবিহারী ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত;

২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৫ই চৈত্র, ১৩০০।

সম্পাদকের নিবেদন।

১। চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইল। ফাল্গুন মাসের বাকী ৩ ফর্ম্মা ইহাতে সংলগ্ন হইল।

২। বৎসর শেষ হইয়া আসিয়াছে, এই সময়ে আমাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। গ্রাহকগণের নিকট স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়াছি, তাঁহারা দয়া করিয়া এখন কিছু কিছু মূল্য পাঠাইয়া উপকার করিলে একান্ত বাধিত হইব। তাঁহাদের কৃপা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই।

৩। বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার, বাবু রজনীকান্ত মিত্র এবং বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মহাশয়গণ নব্যভারতের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়া মূল্য আদায় করিতে গিয়াছেন। আমাদের স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া ও চেকের মুড়িতে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ লিখিয়া দিয়া গ্রাহকগণ মূল্য প্রদান করিবেন। অন্যথা করিলে আমরা দায়ী নহি।

নব্যভারত।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

একাদশ খণ্ড, ১৩০০।

২১০/৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৫১/২নং কালুঘোষের লেন, "মণিকা-প্রেসে"
শ্রীনটবিহারী ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

একাদশখণ্ড নব্যভারতের সূচী।

ওঁ

তারা-মা।

স্ত্রী বা পুমান্ বা সগুণাঽগুণা বা
ত্বং রূপহীনাপ্যথবা সরূপা।
যা কাঽসি বা তিষ্ঠসি যত্র কুত্র
ত্বমেব মাতাঽসি দয়াময়ী মে ॥১॥

সাকারাই হও তুমি, কিম্বা নিরাকারা,
সগুণা বা গুণহীনা হও তুমি তারা।
প্রকৃতি, পুরুষ হও, যে হও সে হও,
এখানে সেখানে তুমি যেখানেই রও;
এইমাত্র আমি শুধু জানিয়াছি সার,—
তুমিই করুণাময়ী জননী আমার।১।

কোঽপ্যস্তু দীয়, যদ বেদ তত্ত্বং
ন ত্বং স্বতত্ত্বং স্বয়মেব বেৎসি।
ইদং তু জানাম্যহমল্পবুদ্ধিঃ
নান্যা গতিঃ পাতকিনাং বিনা ত্বাং ॥২॥

কি সাধ্য অপরে গো মা! জানিবে তোমারে,
আপনিই তুমি নাহি জান আপনারে;
এইমাত্র শুধু আমি জানি মূঢ়মতি,—
তোমা বিনা পাতকীর নাহি অন্য গতি।২।

ত্বং শান্তিরেব হৃদি শোকহুতাশদগ্ধে
সঞ্জীবনী ননু সুধাঽসি মৃতে চ দেহে।
ত্বং সঙ্কটেঽভয়মন্ধতমঃস্ব দীপঃ
সংসারসিন্ধুতরণে তরণী ত্বমেব ॥৩॥

শোকদগ্ধ হৃদে তুমি শান্তির নিদান,
মৃতদেহে সঞ্জীবনী সুধা কর দান;
বিপদে অভয় তুমি আলোক আঁধারে,
তুমিই তরণী গো মা! ভব পারাবারে।৩।

ত্বন্নামতঃ প্রীতিরুদেতি যা মে
তস্যাস্তুলায়াং তৃণতুল্যমন্যৎ।
ত্বন্নাম তারে! স্মরতঃ সদৈব
স্বর্গেঽস্তু বাসো নরকেঽথবা মে ॥৪॥

যে আনন্দ হয় তারা! ডাকিলে তোমায়!
অন্য সুখ তৃণতুল্য তার তুলনায়;
স্বর্গে বা নরকে আমি যেখানেই থাকি,
তোমাকেই যেন সদা মা-মা বোলে ডাকি।৪।

শোকে চ হর্ষে ভবনে বনে বা
স্বপ্নে প্রবোধে নিশি বা দিবা বা।
স্মরন্তি যে ত্বাং মরণে রণে বা
তেষামহং কোঽপি ন কর্তুমীশঃ ॥৫॥

হরিষে, বিষাদে, বনে অথবা ভবনে,
দিনে, রাত্রে, জাগরণে অথবা স্বপনে;
রণে বা মরণে সদা যে ডাকে তোমারে,
কার সাধ্য তার মন্দ করিবারে পারে?।৫।

ত্বৎপাদপদ্মে স্থিরভক্তিমন্তঃ
সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তে।
বিশ্বে ন নশ্যন্তি গতেঽপি নাশং
সুধামৃতং ভুঞ্জত এব নিত্যং ॥৬॥

অচলা ভকতি যার মা! তোমার পদে,
অবসন্ন নাহি হয় সে কভু বিপদে;
জানে না সে কোথা শোক যাতনা কেমন,
লয় পাইলেও বিশ্ব মরে না সে জন;
অক্ষয় অনন্তকাল সেই ভাগ্যধর
চিদানন্দ সুধা পান করে নিরন্তর।৬।

স এব ধন্যোঽত্র স এব পুণ্যঃ
তস্মাৎ সুখী কো ভুবনত্রয়েঽপি।
ত্বাং কামধেনুং কিল যো বিদিত্বা
ত্বামাশ্রিতস্ত্বদগতসর্ব্বভাবঃ ॥৭॥

সেই জন পুণ্যবান্; ধন্য সেই জন,
ত্রিজগতে কেবা সুখী তাহার মতন?
তোমাকেই কামধেনু জানিয়া যে জন,
একান্ত হৃদয়ে করে তোমারি ভজন।৭।

মোক্ষাশয়া যে বিবিধান কঠোরান্
বনে বসন্তো নিয়মাংশ্চরন্তি।
তে হন্ত জানন্তি ন মূঢ়চিত্তাঃ
নির্ব্বাণমেকং তব দেবি! নাম ॥৮॥

মোক্ষ-আশে বনবাসে করিয়া গমন
বিবিধ কঠোর তপ যে করে সাধন ;
হায় ! সেই মূঢ়মতি জানে না সন্ধান,—
একমাত্র তব নাম মোক্ষের নিদান।৮।

নামামৃতং তব বিহায় সুখেন সেব্যং
যে তর্কশাস্ত্রমতিকর্কশমাশ্রয়ন্তে।
দিব্যং রসালমপি হস্তগতং বিধূয়
গচ্ছন্তি কণ্টকবনং ফলকাঙ্ক্ষয়া তে ॥৯॥

ছাড়ি তব সুখসেব্য নাম সুধাময়
নীরস কুটিল তর্ক যে করে আশ্রয় ;
অমৃত রসাল-ফল ফেলিয়া সে হায় !
প্রবেশে কণ্টক-বনে ফলের আশায়।৯॥

সিদ্ধৌষধং সর্ব্ববিধাময়ানাম্
অশেষপাপেন্ধনদীপ্তবহ্নিম্।
সংসারসিন্ধুত্তরণৈকপোতং
তারেতি নামৈব গতির্জনানাম্ ॥১০॥

দিব্য মহৌষধ সম হরে রোগ-তাপ,
জ্বলন্ত অনল সম দহে সর্ব্ব পাপ ;
তরীরূপে করে পার ভব-পারাবার,
তারা-নাম একমাত্র গতি সবাকার।১০।

যে যেঽত্র জীবা ভবদাবদগ্ধাঃ
হাহেতি দুঃখন্তি সদার্ত্তনাদান্।
তে তে নরা বা পশুপক্ষিণো বা
বদন্তু তারেত্যখিলার্ত্তিহারি ॥১১॥

ভব-দাবানলে দগ্ধ হ'য়ে অনিবার
যে যে জীব জ্বালায় করিছ হা হাকার ;
পশু পক্ষী কীট হও অথবা মানব,
তারা বোলে ডাক জ্বালা জুড়াইবে সব।১১।

কণ্ঠহারীকৃতো যেন তারা-নাম-মহামণিঃ।
ক্রীতদাসীব তং মুক্তিরনুগচ্ছতি সর্ব্বদা ॥১২॥

ব্রহ্মময়ী-তারা-নাম অমূল্য রতন,
সে নাম কণ্ঠের হার করে যেই জন ;
আপনি নির্ব্বাণ মুক্তি আসি' তার কাছে,
ক্রীতদাসী সম সদা ধায় পাছে পাছে।১২।

প্রণত—
শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

জাতীয় সাহিত্য।

"Literature, is the gift of heaven—a ray of that wisdom by which the universe is governed, and which man, inspired by a celestial intelligence, has drawn down to earth. Like the rays of the sun, it enlightens us, it rejoices us, it warms us with a heavenly flame, and seems, in some sort like the element of fire, to bend all nature to our use. By its aid our passions are calmed, vice is suppressed, and virtue encouraged by the memorable examples of great and good men which it has handed down to us, and whose time-honoured images it ever brings before our eyes. Literature is a daughter of heaven, who has descended upon earth to soften and to charm away all the evils of the human race."—*Bernardin de St. Pierre.*

সভ্যজগতের ইতিহাস উজ্জ্বল অক্ষরে সপ্রমাণ করিতেছে, যে দেশের জাতীয় সাহিত্য যত উচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে, সে দেশ তত অধিক সভ্যপদবাচ্য। যখন যাঁহাদের মাতৃভাষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তদানীন্তন কালে তাঁহারাই জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্রে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। যে জাতির সাহিত্য সুকুমার শিশুর আধ ভাষার ন্যায় অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট, সে জাতির জাতীয় জীবনসঞ্চারিণী শক্তি শিশুর সেই অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট আধ-ভাষার ন্যায় দুর্ব্বল ও অক্ষম। সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন হয় নাই, অথচ আভ্যন্তরীণ জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের কোথাও নাই। সংস্কৃত সাহিত্য একদিন ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও দর্শন লইয়া কত আলোচনা করিয়াছিল, যাহার কিয়দংশমাত্র অবগত হইয়া বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যজাতিসমূহ ইহাকে পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।* জাতীয় সাহিত্য ভারতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই তদানীন্তন আর্য্যজাতি সভ্যোচিত নানাবিধ গুণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মে, চরিত্র ও কর্ম্মগুণে, বীর্য্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় গণ্য হইয়াছিলেন। অমর কবিগুরু বাল্মীকির সুমধুর ঝঙ্কার সহস্রাধিক বৎসরের পরিবর্ত্তনেও বিস্মৃতির অন্ধকারে মিশিয়া যায় নাই, সুবর্ণাক্ষরে তাহা ভারতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে জিজ্ঞাসা কর, রামায়ণ ও মহাভারতের অমৃতময়ী বাণী প্রত্যেকের কণ্ঠাগ্রে ধ্বনিত হইবে। কালিদাস ও ভবভূতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনেকদিন চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থরাশী এ দেশের বক্ষে আজও সুধাসিঞ্চন করিতেছে। সে একদিন গিয়াছে, কিন্তু যে দিন এই হতভাগ্য দেশের দুরদৃষ্ট তাহার অবশ্যম্ভাবী মহাপতন ডাকিয়া আনিল, সেই দিন—সেই ভয়াবহ দিনে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবী উন্নতির পথ বুঝিবা চিরদিনের মতন কণ্টকাবৃত হইয়া গেল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা ভারতেতিহাসের আভ্যন্তরীণ ঘটনা সমূহ আলোচনা করি, সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, পূর্ণ স্বাধীনতা ও সভ্যতালোকের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য পূর্ণ তেজে উদ্ভাসিত, এবং জাতীয় জীবনী জ্যোতিহীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সাহিত্যেরও পতন হইয়াছিল। নব বসন্ত আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তরুলতা মুঞ্জরিত ও ফল ফুল-শোভিত হওয়া যেমন অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতি নিয়ম, অমারজনীর ঘোরান্ধকার যেমন নবভানু আগমনে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করে, ইহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি পূর্ণ সভ্যতার উদ্ভাসিত আলোকে জাতীয় সাহিত্যও পরিপূর্ণ পরিচ্ছেদে তৎকালীন সভ্য-জগতের নিকট আপন পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। কালনেমির পরিবর্ত্তনে আজ ভারতগগনের দীপ্তসূর্য্য অস্তমিত, ঘনান্ধকার রজনীর বিরামদায়িনী ক্রোড়ে সকলেই নিদ্রিত; বিরামের ক্রোড়ে সকলই বিরাম-প্রাপ্ত হইয়াছে। ধন, সম্পদ, শোভা, বীর্য্য ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে কমনীয় সাহিত্যধনও চিরবিরামের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে।

জাতীয় সাহিত্যালোচনা জাতি বিশেষকে উন্নতির পথে ক্রমশঃ লইয়া যায়, বিগত শত বর্ষের ইতিহাস পর্য্যায়ক্রমে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। বঙ্গে ব্রিটিসাধিকারের প্রারম্ভ সময়ে, পলাশী প্রাঙ্গণের স্মরণীয় দিনে বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্য কিরূপ আকারে ছিল, আর আসন্ন বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে তাহা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, ভাবিলে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইতে হয়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সময় হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পর্য্যন্ত, বাঙ্গালা পদ্য লেখায় কৃতিত্ব অনেকেই দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য দ্বারা সমাজের সর্ব্বতোমুখী শ্রীবৃদ্ধির উপায় কল্পনা তখন কাহারও মনে উদিত হয় নাই। স্বাভাবিক কাব্যপ্রিয় জাতির পক্ষে ভাবুক কবি হওয়া বড় আশ্চর্য্য কথা নহে, কিন্তু প্রকৃত জাতীয় উন্নতির জন্য বঙ্গদেশের কেহই আপন দেহ মন উৎসর্গ করেন নাই। অথবা তদানীন্তন কালের কল্পনা তাঁহাদিগকে নিরীহ ও নিতান্ত বিষয়-

* "More Perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either."—*Sir W. Jones.*

নিস্পৃহ হইয়া থাকা অপেক্ষা কিছু চিন্তা করিতে অবসর দেয় নাই। যে সাহিত্য-শক্তি সমাজস্থ নরনারীর হৃদয়ে স্বদেশের জন্য আপনাপন ধনসম্পত্তি ও জীবন পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে কৃতনিশ্চয় করে, যাহাতে আভ্যন্তরীণ নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদিগকে সর্ব্বথা সাবধান থাকিতে যত্নবান করে, দেশের সকল সুখের আকর রাজনৈতিক আন্দোলন ও আলোচনা যাহা প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটশক্তি সম্মুখে অকুতোভয়ে আপন সত্ত্বাধিকারের জন্য দণ্ডায়মান করে, স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষাকালে যে সাহিত্য-শক্তি তরুণ যুবকগণকে সর্ব্বদা প্রস্তুত করে, দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বতন বঙ্গীয় লেখক ও কবিগণের হৃদয় এ সকল কল্পনা হইতে অতীত জগতে ভ্রমণ করিত। প্রধানতঃ আদিরসে রসিক বঙ্গীয় কবিকুল—

"কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল,
মধুকর ভম্বর অম্বর ভেল।"

এইরূপ, সুন্দরীর কোপ-কুটিল-কটাক্ষের অনুধ্যানে অনেকেই বিহ্বল থাকিতেন, অন্য কিছু করিতে অবসর পাইতেন না। অথবা কল্পনায় ইহা ছাড়া আর কিছু উদিত হইত না। আমাদের বাঙ্গালার গৌরব জয়দেব কবি যখন 'রতিসুখসারে—' তান ধরিয়াছিলেন, তৎকালিক প্রাচ্যজগতের কেন্দ্রভূমিতে তখন সুকুমার কবিতা জ্যোৎস্নালোকে নিকুঞ্জকাননে বিরল শয়নে সেই ভাবের ভাবুক পরিসেবিত হইয়া গান গাহিতেন, আবার সেই স্থানই কঠিন দর্শনশাস্ত্র, জটিল ন্যায় মীমাংসা ও তপ্ত শোণিত নিঃসারণকারী রাজনৈতিক গবেষণায় আন্দোলিত হইত। অনুধাবন করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাহা জয়দেব গোস্বামীর দোষ নহে, সাময়িক জল বায়ুর দোষ। যুগান্তরব্যাপী পরাধীনতা যে জাতির অস্থি-মজ্জার স্তরে স্তরে বিধিয়া পড়িয়াছিল, শোণিতের অণু-পরমাণুতে যে বিজাতি-ভীতি মিশ্রিত হইয়াছিল, মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে যে শিশুর স্বাভাবিক নির্ভীকতা উন্মেষ মাত্রই অঙ্কুরে দলিত হইয়াছিল, যে জাতি তাহাদিগের পরাধীনতার প্রকৃত কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, অথবা তাহাকে অবশ্যম্ভাবী বিধিদত্ত জানিয়া অদৃষ্টবাদের মাহাত্ম্য-ঘোষণায় ব্যাপৃত থাকিত, বিধিদত্ত পুরস্কারের ছায়াও স্পর্শ করিত না, সেই জাতির সন্তান সন্ততি কিসের বলে জাতীয় সাহিত্যকে সর্ব্বথা মর্য্যাদাসম্পন্ন করিবার মতন উপাদান সংগ্রহ করিবে? 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং' এই সত্যবাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়া তাঁহারা অমর হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু দগ্ধ দেশের দুর্ভাগ্য, নতুবা মহাজনোক্ত এই রস কেবল মাত্র শৃঙ্গার-রসেই পর্য্যবসিত হইবে কেন? হিন্দুস্থান যে সময়ে হিন্দুস্বাধীনতার যথার্থ লীলানিকেতন ছিল, বৈদেশিক শাসন যে সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র ক্ষেত্র কলুষিত করে নাই, ভারতের সেই গৌরবান্বিত যুগের সাহিত্য, তৎপরে দৃষদ্বতীতীরে হিন্দুস্বাধীনতার মহাপতনের দিন হইতে মধ্যবর্ত্তী যুগ, পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিগত ও বর্ত্তমান কালের সাহিত্যেতিহাস যথাসম্ভব অনুশীলন করিয়া আমরা দেখিতে চেষ্টা পাইব, স্বাধীন ভারতের উদ্ভাসিতালোকে স্বাধীন মস্তিষ্ক হইতে যে সকল উপাদেয় জ্ঞানরাশি উৎসারিত হইয়া সমগ্র অখণ্ড ভারতে সঞ্জীবনী রস সিঞ্চন করিয়া ইহাকে সজীব রাখিয়াছিল, অপ্রতিবিধেয় পরাধীনতার আবির্ভাবের

সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল! পল্লবগ্রাহী বৈদেশিক সমালোচক অথবা আর্য্যশাস্ত্রানভিজ্ঞ কেহ যদি আর্য্যজাতির সাহিত্য † প্রতিভার বিস্ফুরণ দেখিতে না পান, তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, কিন্তু যাথার্থ্যের অনুসরণ করিয়া বলিলে বলিতে হয়, সাহিত্যের প্রত্যেক অংশের প্রকৃত পরিণতি, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সভ্যোচিত যে সকল পারদর্শিতার প্রয়োজন, একদিন ভারতে ইহার কোনটিরই অভাব ছিল না; কিন্তু ক্রমে তাহা অতীতের সূক্ষ্ম স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বৈদেশিক সাহিত্য ও আচার অনুষ্ঠান সে স্থলে স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিল। মন্বাদি ঋষি-প্রণীত সুচারুবদ্ধ মানব ধর্ম্মশাস্ত্র, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত, অথবা ব্যাসকৃত মহাভারতেতিহাসের প্রসঙ্গ আপাততঃ রাখিয়া দিয়া যদি আমরা তৎকালিক প্রতিভাশালী লেখক ও কবিগণের কর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হই, আমরা কেন, শত কৃতি-লেখনী অবিশ্রান্ত চেষ্টায় সে অনন্ত গুণকাহিনীর বর্ণনা করিতে অক্ষম হয়।

একাধারে সাম্য, স্বাধীনতা, বীর্য্যবত্তা ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিজয়পতাকা যৎকালে আর্য্যভূমে উড্ডীন হইত, সাহিত্য জগতে তখন যে পরিমাণে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ইদানীন্তন সভ্যজগতেরও দেখিবার বিষয়। ভারতের মানব ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে সাহস সহকারে বলিতে পারা যায়, এবম্বিধ নিপুণতা ও কৃতিত্ব সমাজ শৃঙ্খলা করিতে যাঁহারা দেখাইয়াছিলেন, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে তাঁহাদের অলোকসামান্য প্রতিভা জগতে অদ্যাপিও ঘোষণা করিতেছে। তখনকার প্রকৃত উন্নতির লক্ষণ স্পষ্টতঃ ইহাতেই প্রমাণিত হয়, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ধর্ম্মরাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিলেন, সেই জন্যই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উদার শিক্ষা তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র পর্ব্বত গুহার নিভৃত নিকেতনে আলস্যে কালযাপন করিতে দেয় নাই; অপিচ তাঁহারা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই সর্ব্বতোমুখী উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া আসন্ন অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রমকে তদ্বিষয়েই নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধনা কেবলমাত্র নিজের স্বার্থপরতায় পর্য্যবসিত হয় নাই, কি বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপে, কি প্রসূতির গর্ভাধান সংস্কারে, কি সন্তান পালন-শিক্ষায়, কি সামাজিক আহার ব্যবহারাদি আচারানুষ্ঠানে, কি অর্থনীতিশাস্ত্রে তাঁহারা আজীবন কেবল কিসে স্বজাতীয় ব্যক্তিগণ সুখে, সচ্ছন্দে ও নিরাপদে জীবনযাত্রায় প্রস্তুত হইতে পারে, অবিশ্রান্ত তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ কি অবস্থায় অবস্থিতি করিলে তাহার ভবিষ্যৎজীবন স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইবে, এই সূক্ষ্ম অথচ জীব-জগতের অত্যাবশ্যকীয় চিন্তা তাঁহারা করিয়াছিলেন। শরীরী জীব হইয়া যেই সকল মহানুব্যক্তিগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, শরীরী মানব জড়ীয় অনুশীলন ত্যাগ করিয়া একমাত্র আধ্যাত্মিক

† আমাদের 'আর্য্য' শব্দের প্রয়োগ প্রসঙ্গে কেহ যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক অভিনব য়ুরোপীয় আর্য্য (?) না বোঝেন। ভারতের ব্রহ্মর্ষিদেশস্থিত চিরাচরিত সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে আমরা গৌরবান্বিত 'আর্য্য' শব্দে অভিহিত করিতেছি।

গবেষণা লইয়া থাকিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভের সম্ভাবনা অতি অল্পই; এইজন্য কিসে মানুষ ধন, মান, যশ, আরোগ্য, বল ও স্বাস্থ্য-সুখ-ভোগ করিয়া জগতের একমাত্র বাঞ্ছনীয় মানবজাতির হিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখিবে, ইহাই কেবল তাঁহারা চিন্তা করিয়াছিলেন। কত সহস্র বৎসর অতীতের গহ্বরে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সত্যযুগে যে ঋষি ভারতীয় জনগণের সামাজিক মঙ্গলোদ্দেশ্যে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, জগতের ত্রিবিধ উৎপাতেও তাহা অবিকৃত ভাবে দেশীয় জনগণের জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নিয়মিত করিতেছে। হিন্দুর বৈবাহিক ব্যাপারে মনুর বিধান আজও প্রত্যেক গৃহে পালিত হইয়া আসিতেছে। স্বামী-স্ত্রী-নির্ব্বাচনে অদ্যাপিও 'ত্রিংশৎ বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং' প্রভৃতি অনুশাসন মান্য হইতেছে। মানব কিসে সুখে স্বাস্থ্যে কালাতিপাত করিতে পারিবে, যে মহাত্মার হৃদয়ে এই চিন্তা আমরণ জাগরূক থাকে, মহর্ষি অপেক্ষার অভিধানে যদি উচ্চতর জ্ঞাপক কোন শব্দ থাকে, আমরা তাঁহাকে তদ্বারা অলঙ্কৃত করিতে প্রস্তুত। কর্ম্মবিহীন ধর্ম্মের অকর্ম্মণ্য ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহাদের সময় গত হয় নাই, জীবের গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিন্তা তাঁহারা করিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্যম্ভাবী কালের নিদারুণ আঘাতে তাঁহারা বহুদিন সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতি সংহিতা সুবর্ণাক্ষরে আজও ভারতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ সাধক পরমার্থ চিন্তায় দেহ মন সমর্পণ করিয়া দিয়া কঠোরতার অদ্ভুত অভিনয় দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আজ ইতিহাস তাঁহাদের কথাও বলিতেছে, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম ও চরিত্রবল সঞ্চয় করিয়া স্বদেশের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য স্থায়ী কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস ও সাধারণ সমাজ তাঁহাদিগকে প্রথমোক্ত মহাজনগণের ন্যায় আপন বক্ষে কৃতজ্ঞতার আসন প্রদান করিয়াছে। এবম্বিধ স্বদেশপ্রেমিক দেশের জন্য যে সকল মহামূল্য ধন পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভারতের হিতসাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সাহিত্যকে অমূল্য উপাদানে গঠিত করিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান, যতদিন হিন্দুস্বাধীনতার গৌরবরবি ভারতাকাশে বিরাজিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত সজীব ছিল, কিন্তু যে দিন দৃষদ্বতীনীরে ক্ষত্রিয় ও মুসলমান শোণিতে পবিত্র স্বাধীনতাধন চিরবিদায় গ্রহণ করিল, সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবী পূর্ণাঙ্গতার আশা সেই দিন—সেই ভয়াবহ দিনে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। দেশীয় সাহিত্য সমাজকে সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত করে, কিন্তু ভারতে রাষ্ট্র বিপ্লবের সহিত সকল বিপ্লবই প্রশ্রয় পাইল; স্বদেশীয় সমুদায় বিশৃঙ্খলতার সহিত সাহিত্যধনও বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইল। রত্নপ্রসূ খনি সকলের মুহূর্ত্তে উৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। বৈদিকযুগ হইতে প্রথম সংগ্রাম সিংহের সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, স্বাধীন ভারতের স্বাধীনভাবাপন্ন সাহিত্য তদনুযায়ী শোভনীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল; আবার সংগ্রামসিংহের সময় হইতে ব্রিটিশাধিকারের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তুলনায় যে তাহাকে হীন বলিয়া অনুমিত হইবে, অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশের

স্বাধীনতা ও সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি, এতদুভয়ের পরস্পর যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ইহাতে তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়। পরাধীনতার ও সাহিত্যাবনতির যুগল মিলন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাও যেন আমাদিগের দেশের অতীত কাহিনী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেয়।

কাব্য ও কবি লইয়া বর্ত্তমান কালে যেমন আলোচনা হয়, হিন্দুস্বাধীনতার সময় তাহারও কিছু অভাব ছিল না। যে সময় ভারত দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক গবেষণায় পূর্ণ ছিল, তখন ভারবী, কালিদাস কিম্বা ভবভূতি-প্রমুখ মহাকবিদিগের অপ্রতুল ছিল না। প্রকৃত কবি মানসদর্পণে জগতের আভ্যন্তরীণ লুক্কায়িত চিত্র স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করেন; সাহিত্যের এই সুকুমার অংশ সভ্যতার ও মানস উন্নতির চিরলক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ কি? এক দিকে যেমন মনু, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শঙ্করাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য গভীর বিজ্ঞান ও দার্শনিক গবেষণায় ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধিত করিয়া গিয়াছেন, আবার অন্যদিকে আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির সুকুমার প্রতিভা পাশ্চাত্য জগতের কবিগুরু সেক্ষপীয়র, মিল্টনের তুলনায় প্রকৃষ্ট বলিয়া সমালোচিত হইতেছে। কি কবিতারাজ্যে, কি ভাবুকতায়, কি দর্শন-বিজ্ঞানে, কি ন্যায়ের মীমাংসায়, কি সামাজিক সুশৃঙ্খলায় স্বাধীন ভারত আপনার সাহিত্য সংসারকে কোন অংশেই হীন করিয়া রাখে নাই। কালিদাস কিম্বা ভবভূতি, ভারবী অথবা নৈষধের গৌরব সৌভাগ্যবশত আজকাল অনেকেই বুঝিতেছেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর কলেজের ছাত্র ইংরেজ প্রোফেসরের মুখে বিস্ময়রুদ্ধকর্ণে নিউটনের attraction of gravityর আবিষ্কারের কথা শুনিতেছে, কিন্তু ভারতের ভাস্করাচার্য্য সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পৃথিবী যে ত্রিকোণ নহে, ইহা যে বাসুকীর মস্তকোপরি স্থাপিত নহে, প্রচলিত কুসংস্কারের মস্তকে কুঠার প্রহার করিয়া অতুল্য মেধাবী গণিৎশাস্ত্রবিৎ ভাস্করাচার্য্য ভারতের সমক্ষে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা প্রচারিত করিলেন। ভাস্করাচার্য্যের এই মহামূল্য জ্ঞান সংস্কৃত সাহিত্যের আর একটি অতি উজ্জ্বলতম অংশ।

যে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) পৃথিবীর জ্ঞানী জাতিনিচয়ের সমুচিত গবেষণার বিষয়, ভারতে, ভারতীয়সাহিত্যে তাহারও বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র ও তাহার পরবর্ত্তী ভাষ্যকারদিগের অমানুষিক প্রতিভা, ইদানীন্তনকালের মিল্ অথবা বেকন, কমত অথবা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের প্রতিভা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় সাহিত্যও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, ভারতের স্বাধীনতার শেষ স্ফুলিঙ্গ-বিস্ফুরণের সময় ভগবান শঙ্করাচার্য্য অথবা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় অসামান্য ধীমানগণ হিন্দুস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলেন; কৈ আজও ভারতে তেমন একজন কেহ জন্মগ্রহণ করিল না। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ক্ষেত্রে সে এক অদ্ভুত প্রতিভা জন্মগ্রহণ করিয়া সাহিত্য ও সমাজকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিয়াছিল, কিন্তু বিগত পরাধীনতার বিপুল কাল গণনা করিলে একটিও আর তেমন গণিতবৎ, তেমন দার্শনিক, তেমন নৈয়ায়িক, তেমন সংস্কারক, তেমন

রাজনৈতিক, তেমন বীর অথবা তেমন কবি জন্মপরিগ্রহ করিল না। জাতীয় সজীবতার উপর যে জাতীয় সাহিত্য নির্ভর করে, ইহা নিশ্চিত, তাই হিন্দুস্থানের সর্ব্বনাশের পর তাহার সাহিত্যচ্ছবি পরিম্লান। আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা উপস্থিত না হইলে, চরিত্র ও ধর্ম্মের বল ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত না হইলে, ভারতে কদাপি বিজাতীয় অধিকার প্রবেশ করিতে পারিত না। কাপুরুষ-লক্ষণ গৃহ-বিবাদ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আনয়ন করিয়া দিল, একীভূত জাতীয়শক্তি সুতরাং বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া বিজাতীয় শক্তির নিকট উন্নত শিরস্ত্রাণ লুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। নতুবা বীরক্ষত্রিয়শোণিত বর্ত্তমান থাকিতে, জাতীয় ভ্রাতৃবন্ধন একীভূত থাকিতে, সমগ্র জগতে এমন কোন্ মহাশক্তি বর্ত্তমান ছিল, যাহা সসাগরা ভারতের সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া দাঁড়াইবার অধিকার মাত্র প্রাপ্ত হইতে পারে? যদি কেহ কোন জাতির প্রকৃত চিত্র দেখিতে বাসনা করেন, তবে তাহার ফল লাভের উপায় সে জাতির সাহিত্যালোচনা কর। কোন্ জাতির সভ্যতা কত উচ্চধাপে আরোহণ করিয়াছে, যদি জানিতে বাসনা হয়, তবে তাহার জাতীয় সাহিত্য যাহা বলিয়া দিতে পারে, এমনটি আর কিছুরই বলিবার শক্তি নাই। সাহিত্যের অন্তর অঙ্গ ইতিহাস, জাতির আর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য সম্পত্তি।

আজ যদি ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবী নিয়তির ফলে ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী তথা হইতে অন্তর্হিত হন,—সাম্য ও স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ড যদি দুর্নীতি, ও চরিত্রবিহীনতার ফলে তাহাদের মাতৃভূমিকে দুর্ব্বিসহ দাসত্ব শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়, তবে পরবর্ত্তী ইংলণ্ডের ইতিহাস নিশ্চিতই ইহা সপ্রমাণ করিবে, স্বাধীন ইংলণ্ডের স্বাধীন সাহিত্য পূর্ব্বে যে তেজে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছেন, পরাধীন ইংলণ্ড তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে নাই। স্বাধীন ইংলণ্ডের স্বাধীনভাবাপন্ন যে জননী মিল, ক্রমওয়েল, ওয়েলিংটন, গ্লাডষ্টোন্ ও কলোম্বাসের ন্যায় বীরপুত্র প্রসব করিতে পারেন, পরাধীন ও নিপীড়িত ইংলণ্ডের জননী তদ্রূপ অতি অল্পই, অথবা সম্পূর্ণই পারেন না। * জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় কঠোর ও কঠিন গবেষণার বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা সুকুমার কবিতার রমণীয় উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া আসি, তবে দেখিতে পাই, যে বৈষ্ণব প্রেমের বন্যায় একদিন বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, প্রেম ভক্তির জলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গে যখন বিক্রমাদিত্য সিংহাসনোপবিষ্ট ছিলেন, পরাধীনতার লৌহ নিগড় যখন বাঙ্গালা দেশের গললগ্নীকৃত হয় নাই, সেই সময় বঙ্গের গৌরব, বাঙ্গালী জাতির গৌরব, গ্রাম কেন্দুবিল্বের প্রেমিক কবি জয়দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সে-ও কিন্তু হিন্দুস্বাধীনতার সময়। স্বাধীন দেশে লালিত-পালিত জয়দেব গোস্বামীর কবিতাশক্তি যদিও ভারতের আসন্নপতন প্রতিহত করিতে পারে নাই, কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের কবিতারাজ্যে তাহা, যতদিন ভারতের

* একজন খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন,—
"The reason that so many more eminent men have appeared in England and France than in other countries is that they have for many years been tending to liberty. Genius is rare under despotism. It is only in the pure air of freedom that the human mind flourishes and expands."

অস্তিত্ব মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন ইহার গৌরব-কাহিনী ঘোষণা করিবে। কালিন্দীর শ্যামজলে, ভাগীরথীর অমল ধবল সলিলে, পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালায়, আর ঐ কৈবুসীর তটপ্রবাহিনী অজয়নদীর গৈরিক বর্ণে বৈষ্ণবকবির মোহন বাঁশরীর সুর অণু পরমাণুতে মিশিয়া আজও যেন বৃন্দাবনের ধীর সমীরে যমুনাতটে বনমালা প্রেমস্মৃতি প্রাণের তন্ত্রীতে জাগাইয়া দেয়। গোপীপ্রেমের উদ্দাম আধ্যাত্মিকতাময় যে কবিতা-লহরী দেশের সাহিত্যকে অনুপম পুষ্পমালা দ্বারা সাজাইয়াছে, তাহার অনুরূপ আজও বঙ্গে আর একটী জন্মে নাই। প্রতিভা বহুদিন রুদ্ধ হইয়াছে; সে অতুল্য প্রতিভার বিকাশ তাহার পরবর্ত্তী বহুকাল পর্য্যন্ত আর হয় নাই। চরিত্র-তেজ পূর্ব্ব হইতেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, তাহারই ফলস্বরূপ দেশের মহাপতন; পরে পরাধীনতার অনিবার্য্য উপসর্গ বিলাসিতা ও নৈতিক অবনতি দেশীয়দিগের অস্থিমজ্জায় বসিয়া পড়িল, দেশের সামাজিক অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি সকল ক্রমশঃ প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। স্বার্থপরতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা ও চরিত্র-বিহীনতায় দেশ ছাইয়া পড়িল; সামান্য কপর্দ্দকের নিকট দেশীয় কুলাঙ্গারগণ অমূল্য স্বাধীনতা ধন বিক্রয় করিল। নেতৃত্ব বয়োবৃদ্ধগণ তখন বর্ত্তমান ছিলেন, সমাজের উশৃঙ্খলতা প্রতিহত করিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল না। ধন-লিপ্সা ন্যায় অন্যায় বোধের অপেক্ষা করে না, সুতরাং ধনবানের যথেচ্ছায় সমাজে ঘোর অশান্তি ও উপদ্রব আনয়ন করিল। সসাগরা ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট যেখানে একদিন সামান্য কুশাসনোবিষ্ট, বল্কল-পরিহিত ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র কম্পিত-কলেবর হইতেন, সেই খানেই তাঁহাদের বংশধরগণ বিলাসপথে দেহমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতের এই সার্ব্বজনীন দুর্গতির কালে সাহিত্য কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিল? বলা বাহুল্য, সমাজ চিত্রই সাহিত্যের যথার্থ আলেখ্য। দুর্গতিগ্রস্ত সমাজের সাহিত্যকেও যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হয়, সে সময়েও তাহাই হইল। ভারতে মুসলমান আধিপত্যকালে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সর্ব্বগ্রাসী হুতাশনের সম্মুখে পড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে বাঙ্গালার ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বে একদিন যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা বিস্ফুরিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা সাহিত্যেতিহাসের তাহাই প্রথম অত্যুজ্জ্বল অংশ। তাহা ভগবদ্ভক্তি ও অধ্যাত্ম প্রেমিকতাময় উপাদেয় সামগ্রী, কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনের উপায় উদ্ভাবনী চেষ্টা তাহাতে হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও ফলতঃ তাহার গতি বিপরীতদিকেই ধাবিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের নব গোরাচাঁদের উদয় হইতে পরবর্ত্তী শত বৎসরের বঙ্গসাহিত্যেতিহাস বৈষ্ণব কবিগণের কৃতিত্ব ও কবিত্বে পূর্ণ। বৈষ্ণবকবিগণই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত প্রস্তাবে পিতা। সঙ্গীত, ইতিহাস, কবিতা, দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের আবশ্যকীয় নানাবিধ উপকরণ দ্বারা ইঁহারা সুনিপুণ কারীগরের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিলেন। দেশের পরাধীনতা বিষয়ক চিন্তা ইঁহাদের হৃদয়ে ঠাঁই পায় নাই, স্বাধীনতার বিমল সুখভোগের ইতিহাস ইঁহারা আলোচনা করেন নাই, একমাত্র অধ্যাত্মদর্শনের আলোচনা এবং কৃষ্ণভক্তিরসামৃত পান করিয়া

বিলাস বাসনা ত্যাগের অপরিসীম উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে দর্শন আছে, ইতিহাস আছে, জীবনচরিত আছে, চারু কবিতা আছে, কিন্তু যে শক্তি মানব জাতিকে স্বদেশ রক্ষার নিমিত্ত ভ্রাতৃস্থানীয় স্বদেশবাসীগণকে রক্ষার নিমিত্ত আত্মহৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত নিঃসারণ করিতে অনুপ্রাণিত করে, তাহা ইহাতে শিক্ষা দেয় নাই। যে মন্ত্র একদিন গুরু নানকের শিষ্যগণকে নিরীহ-বিলাস, নিস্পৃহ সাধক শ্রেণী হইতে শোণিত-সিক্ত সমরাঙ্গণে পরিচালিত করিয়া মোগল শাসন শক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল, যে মন্ত্রে এক দিন কার্থেজের লাবণ্যময়ী ললিত-ললনা-কুলকে আপনাপন প্রাণাধিক পতি ও এক মাত্র পুত্র সন্তানকে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর করিতে উজ্জীবিত করিয়া সমগ্র জগৎকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিল, যে মন্ত্র একদিন চিতোরপতি প্রতাপসিংহকে ধন, মান, ঐশ্বর্য্য ও জীবন তুচ্ছ মানিয়া আরাবল্লী শৈলের কন্দরে কন্দরে অনাহার অনিদ্রায় ভ্রাম্যমান হইয়া পতিত—পরাধীন—পরপীড়িত স্বদেশ উদ্ধার করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ করিয়াছিল,—যাঁহার অলৌকিক সাধনা একদিন মোগল-শোণিতে তর্পণ করিয়া পিতৃপুরুষকে অঞ্জলী প্রদান করিয়াছিল, যাঁহার পুণ্য সাধনায় একদিন দুঃস্থ হিন্দু-প্রজাগণ কঠোর যন্ত্রণা মধ্যেও হৃদয়ে অশেষ শান্তি লাভ করিয়াছিল, সে মন্ত্র—সেই সাধন মন্ত্র বাঙ্গালীর প্রথম জাতীয় ইতিহাসের অধ্যায় শিক্ষা দেয় না! কবিতার রসময় লালিত্যস্রোত যদি দেখিতে চাও, বাঙ্গালার বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহা পাইবে, নাট্য-চিত্রের যথার্থ কৃতিত্ব যদি দেখিতে চাও, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহা দেখিবে, জীবনচরিতের বিন্যাস যদি দেখিতে চাও, ইহাতে তাহা পাইবে, অধ্যাত্মদর্শনের কঠিন দার্শনিক মীমাংসা যদি অনুসন্ধান কর, ইহাতে তাহাও দেখিবে, কিন্তু প্রকৃত বীর হৃদয়ের অগ্নি উজ্জ্বলন ইহাতে নাই; গোব্রাহ্মণ ইষ্টদেবতার অবমাননাকারী হৃদয়হীন পাষণ্ডদিগের সবলে মূলচ্ছেদ করিয়া স্বদেশের সনাতন জাতিধর্ম্মকে ও সতী সাধ্বীদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর নিভৃত সাধনার উপদেশ ইহাতে নাই। শ্রীমদ্ভাগবতানুমোদিত কৃষ্ণলীলার কথা বাঙ্গালার বৈষ্ণব-গ্রন্থাদিতে অনেক আলোচিত হইয়াছে ও শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে অনেকেই ইহার রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কিন্তু পূজনীয় বৈষ্ণব কবিগণ বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদের প্রস্তুত উপাদেয় অমৃতই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে কলুষিত দুর্নীতির ঘোর অন্ধ-তমসাবৃত রাজ্যে লইয়া যাইবে! যে দুর্লভ জ্ঞান, অপার্থিব প্রেম-ভক্তি শ্রীচৈতন্যের সহিত আসিয়াছিল, নীলাচলের স্মরণীয় তীর্থেই তাহার পর্য্যাবসান হইয়াছে। পুত্র-বিচ্ছেদ-ক্লিষ্টা শচীমাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া, পতি-বিচ্ছেদ-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় শূন্য করিয়া, বঙ্গের উজ্জলদিক্ আঁধার করিয়া যে প্রেমের দেবতা চলিয়া গেলেন, আর সে অভাব পূর্ণ হইল না। যে ক্ষত বঙ্গের অঙ্গে সমুদ্ভূত হইল, আর তাহা আরোগ্য হইল না। তাই চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে, দেব! মায়ায় ছলনায় মানব-বেশে ভক্ত হৃদয়ে প্রেম বিলাইতে আসিয়াছিলে ত ছাড়িয়া গেলে কেন? বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলে ত অত শীঘ্র অন্তর্হিত হইলে

কেন? জগাই মাধাই উদ্ধার করিলে ত পাপ-কলুষিত বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়া গেলে না কেন? প্রভো, তুমি ত পাপীর দুঃখে দুঃখিত, পাপীর প্রতি তোমার দয়া ত সংসারাতীত, তবে কেন এমন হইল? দেব! আমরা বুঝিয়াছি। কেন এমন করিলে, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে আর বাকী নাই। বাঙ্গালার পাপলোকে তোমায় বুঝিল না, বাঙ্গালার কলুষিত বায়ু তোমার সহিল না। তুমি যাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তোমার মাতৃভূমির ভারার্পণ করিয়াছিলে, তোমার অনুপস্থিতকালে তাহারাই, সেই কুব্যাঙ্গার স্বদেশ-শত্রুগণই বঙ্গে তোমার স্বর্গীয় প্রেমের সুবিমল তত্ত্ব সামান্য কলুষিত বারনারীর প্রেমে পরিণত করাইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম এইরূপে ক্রমশঃ বঙ্গে ঘোর তামসিক যুগের প্রবর্ত্তনা করিল। রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমপ্রীতিবিষয়ক ব্যাখ্যা দুরাচার লম্পট ও কুপটাদিগের পাপ লীলা-রসে পরিণত হইল। বৈষ্ণব শ্রীসনাতন, বৈষ্ণব রূপ গোস্বামী, বৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য্য, বৈষ্ণব রায় রামানন্দের স্থান চরিত্রহীন নেড়ানেড়ির দল দ্বারা পূর্ণ হইল। প্রেমিক অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধরগণ আজ সর্ব্বতো-ভাবে আপন জাতীয় অধঃপতন কাহিনী জগতে যে ঘণা করিতেছে। এই অব-স্থার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের বাল্য জীবন ফুটিতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমা-জের দৈনন্দিন জীবনের পূতিগন্ধ দেশ-ময় বিস্তারিত হইয়া অবিরত তাহা অসীম কুফল প্রসব করিতে লাগিল। বাঙ্গালার ব্রিটিশাধিকারের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, বাঙ্গালা-সাহিত্য সমাজের উপরে আর কিছু মাত্র ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। কলুষিত চরিত্রের এবম্বিধ দূষিত বাষ্প বঙ্গ-দেশের বক্ষোপরি কিরূপ ভয়ঙ্কর ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যেতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই; নেড়ে, সহজে প্রভৃতি অসংখ্য সম্প্রদায় এই ঘোরতর মোহাচ্ছন্ন বিশ্বাসে পতিত হইয়া দেশের অজ্ঞানান্ধ নরনারীকে কি ভয়ানক পতনের দিকে লইয়া গিয়াছে, ভাবিলে অবসন্ন হইতে হয়! পাপ ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব এই সকল ব্যক্তির পাপ প্রলোভনে পতিত হইয়া দেশের কত হতভাগিনী আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সতীত্ব ধন বিসর্জ্জন দিয়াছে! কত শত সহস্র বঙ্গকুলরমণী ভীষণ পাপের নামান্তর ধর্ম্মের মোহ মন্ত্রে প্রলুব্ধ হইয়া অনিবার পাপ সেবায় ইহ পরকাল নষ্ট করিয়াছে। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশের এই পাপ সময়ে দেশীয় ব্যক্তিগণের চরিত্র কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, বিখ্যাত ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিলে তাহা সুস্পষ্ট উপ-লব্ধি হইবে। যাঁহারা বিদ্যাসুন্দরের বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন,তাঁহারা জানেন, তদানীন্তন বাঙ্গালীর সমাজে কিরূপ প্রকৃতির সাহিত্য সমাদৃত হইত। এবম্বিধ শ্রেণীর সাহিত্য লিখিয়া যিনি আবার রাজ সভায় 'গুণাকর', উপাধিতে ভূষিত হন, সে দেশের রাজা ও সমাজস্থ নরনারীর প্রকৃতি কি, ইহাতেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে না? শ্রীচৈত-ন্যের তিরোভাবের পর হইতে বঙ্গে যে তীক্ষ্ণবিষ বীজ উপ্ত হইয়াছিল, বঙ্গের গুণা-কর ভারত চন্দ্রের সময়ে তাহার বিষবৃক্ষ ফলফুল শোভিত হইয়া তাহারই বিলাস-ছায়া তলে ঐ ভারতচন্দ্রের নূতন কুসুমাস্তকে আশ্রয় দিয়াছিল। ইহা ভারতচন্দ্রের দোষ

নহে, তৎকালিক সমাজের বিষ-বায়ু ইহাদিগকে বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের বর্ণনা-পারিপাট্য প্রশংসা পাইতে পারে বটে, লেখকের লিপিকুশলতা প্রশংসারযোগ্য সত্য, কিন্তু শত গুণের সমাবেশ সত্বেও যাহা সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিকে ঘোরতর কলষিত করিয়া দেয়, তাহা কদাপি প্রশ্রয় পাইতে পারে না। 'গুণাকর,যে মহামূল্য (?) রত্নরাজি বঙ্গদেশে বিলাইয়া ছিলেন, তাহার প্রবল আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া দেশের কত হতভাগ্য বালক বালিকা যে জীবন পথের প্রথমেই বিষ-জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের যখন এই অবস্থা, সেই সময়ে বঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। পলাশিপ্রাঙ্গণের স্মরণীয় দিনে দেশের ভবিতব্যতার লিপি বিধিবদ্ধ হইল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য গ্রহণ সময়ের কিয়ৎকাল পর হইতে আর আজ এই আসন্ন বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যেতিহাস-অধ্যায় আমাদের প্রধান ও অত্যাবশ্যকীয় আলোচ্য বিষয়। বাস্তবিক বাঙ্গলা সাহিত্যের এই অংশ সর্ব্বতোভাবেই উজ্জ্বল এবং গৌরবান্বিত। মনুষ্য-সমাজের এক একটি অভাব মোচন করিতে মধ্যে মধ্যে এক এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়; বাঙ্গলা সাহিত্যকে নব পরিচ্ছদে সাজাইবার জন্য রাজা রামমোহন রায় মহাশয় তাই আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাকে বিশুদ্ধ গদ্য ভাষায় পরিণত করিয়া, ইহার ভাবকে যথাসম্ভব সম্ভ্রান্ত, সুমার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত করিয়া, ইহার কল্পনারাজ্য দূর প্রসারিত করিয়া ইনি দেশীয় সাহিত্যরাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিলেন। পক্ষান্তরে, সমন্বিক বাহ্য শাসন নীতি তৎকালিক দেশীয় জনগণের মস্তিষ্ক অনেকটা সেই প্রকার ভাব প্রবেশ করাইয়া দেয়, সুতরাং অক্ষোভ ও অপক্ষপাতে ইহা স্বীকার করিতে হইবে ইংরেজজাতির শাসন ও শিক্ষাপ্রণালী অলক্ষিত ভাবে রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইংরেজজাতির জাতীয় ইতিহাস ও তাহাদের সাহিত্যেতিহাস অমানুষিক ঘটনা ও পুরুষকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বদেশপ্রেমিক রামমোহন পাশ্চাত্য জাতির উন্নতির সহিত দেশীয় অবস্থার তুলনা করিলেন; তুলনায় যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহা ভারতের লজ্জার বিষয়। তিনি ব্যথিত হইলেন, কিন্তু হৃদয়ের এ বেদনা প্রচ্ছন্ন থাকিল না, অদমিত অধ্যবসায় ও উৎসাহের অগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিল, অবলম্বে কঠোর কর্ত্তব্যের সাধনাক্ষেত্রে শরীর মন নিয়োজিত করিলেন। পিতা ও স্বজনগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, চতুর্দ্দিকস্থ অধিকাংশ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের পশ্বাধম ব্যবহারে নিপীড়িত হইয়া, কঠোর সমাজের ভীষণ ভ্রূকুটিভঙ্গী সহ্য করিয়া এই মহাত্মা জাতীয় সমাজ ও সাহিত্যের জন্য যে মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানের সমগ্র ভূখণ্ড যতদিন না 'প্রলয়পয়োধি জলে' আপন অস্তিত্ব বিলীন করে, ততদিন ইহা স্বদেশবাসী সকলের মনে দৃঢ়অঙ্কিত থাকিবে। জাতীয় সাহিত্য যে একাধারে বিজ্ঞান, দর্শন ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি সকলই শিক্ষা দিতে পারে, অধ্যাত্ম-সাধন প্রণালী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহা যে সেবকদিগকে জাতীয় গৌরব সর্ব্বদা রক্ষা করিতে শিক্ষা দিতে পারে, আত্মালোচনায় মনে মনে

তাহা যে যুবকদিগকে মাতৃরূপী মহিলাগণের প্রতি যথার্থ মর্য্যাদা প্রকাশ করিতে শিক্ষা দিতে পারে, শান্ত জীবন পালন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহা যে দেশীয় সর্ব্বসাধারণকে স্বদেশীয় মঙ্গলামঙ্গলের জন্ম রাজশক্তির সম্মুখে শিষ্ট অথচ নির্ভীক হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা দিতে পারে, তাহা সর্ব্বপ্রথম এদেশে রামমোহন রায় মহাশয় শিক্ষা প্রদান করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই গুণে বাঙ্গলা সাহিত্য বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়া বৈদেশিক সমালোচনায় ভারতের সর্ব্বপ্রধান প্রচলিত ভাষা বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই গৌরবে বাঙ্গালী জাতি মাত্রেই গৌরবান্বিত। যে জাতির সাহিত্য দ্বারা পরিচয় নাই, তাহাদের কিছুই 'জাতীয়,' আখ্যা পাইতে পারে না। আজ ভারতের ভাগ্য, তাহার অনেক সুসন্তান এই পুণ্যক্ষেত্রে দেহ মন সমর্পণ করিয়াছেন। আজ বাঙ্গালা সাহিত্যরূপ ফলফুলসুশোভিত তরুণ বৃক্ষের ছায়া পাদপে বসিয়া অনেক ক্ষুৎপিপাসিত ক্ষুন্নিবৃত্ত, অনেক শ্রান্ত পথিক সুস্নিগ্ধ। আশার বংশী বাজিয়াছে, বঙ্গবাসি, এখনও তোমার ভ্রাতৃপ্রেমে মলিনতা আছে; প্রাণের মালিন্য মুছিয়া ফেল, যদি স্বার্থস্পৃহা থাকে, তাহা সমূলে উৎপাটিত কর, যদি ভ্রাতৃবিচ্ছেদ থাকে, পুনরায় পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হও, যদি বিলাস-বাসনা থাকে, কষ্ট সহিষ্ণুতা শিক্ষা কর, যদি পরশ্রীকাতরতা থাকে, তাহাকে হিংসা না করিয়া নিজে সেইরূপ হইতে চেষ্টা কর, হৃদয় নির্ম্মল ও স্বদেশহিতৈষণা অভ্যাস করিয়া মাতৃভূমির সারবান উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখ, দেখিবে, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর বঙ্গভাষা ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভারতের সমগ্র ভ্রাতৃবৃন্দকে এক প্রেমডোরে বাঁধিয়া ফেলিবে। যে ডোরে একদিন হিন্দুস্থানের সকল বর্ণ অনুস্যূত ছিল, যে ডোরে ইংলণ্ডের অধিবাসীগণ আজ একত্র গ্রথিত, সেই ভ্রাতৃপ্রেমময় ডোরের বৈদ্যুতিক শক্তিতে তোমাদিগের হৃদয়ে যে অমানুষিক বল সঞ্চিত হইবে, তাহাতে আমাদের দেশের জয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের জয়, তাহারই সহিত ভারতবাসী আমাদের জয়।

স্বাধীন দেশের সাহিত্য ও পরাধীন দেশের সাহিত্যে যদিও বহু পার্থক্য, কিন্তু মুসলমান শাসনপীড়িত ভারত এবং ব্রিটিস্-শাসনাধীন ভারতের জাতীয় সাহিত্য কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছে, তুলনা করিলে, বর্ত্তমান-যুগের প্রাধান্য ও বর্ত্তমান শাসন এবং শিক্ষা-নীতির উৎকর্ষ তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মুসলমান সাহিত্য আমাদের দেশে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে নাই, ইংরেজি সাহিত্য তদপেক্ষা বহু পরিমাণে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক দূরে যাইতে হইবে না। বর্ত্তমানকালে আমাদের বালক ও যুবকদিগকে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, যে শিক্ষাপ্রণালী সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ইতিহাসের জলন্ত ও জীবন্ত কাহিনী চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দেখায়, মুসলমান সময়ে সেরূপ হইত না। ইংরেজ জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক, চিত্র যেরূপ অদ্ভুত ও জীবন্ত ঘটনাবলীতে পূর্ণ, তাহারা ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতি অশান্তিময় ঝটিকা হইতে কিরূপ ভাবে আপন মস্তক উত্তোলন করিয়াছে, আজ দেশীয় জনগণ তাহা সকলই

বুঝিয়াছেন। জাতীয় সাহিত্য ইংলণ্ডীয় সমাজোপরি যে অসীম শক্তিসম্পন্ন, তাহাও বুঝিতে বাকী নাই। ইংরেজী শিক্ষার এই ভাব আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় অনেকটা প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আমাদের দেখিবার, শিখিবার সব বিষয় সম্মুখে বর্ত্তমান, যাহাতে মনোযোগ না দিলে আমাদের সাহিত্য উন্নতিপথে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবে। কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান সেবকগণ আশাতীত উন্নতি-প্রাপ্ত করিতেছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার সেই আর্য্যযুগের ন্যায় অদমিত উদ্যমে জাতীয় ভাষাভাণ্ডারে যাহাতে রসায়নশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়, তৎপক্ষে যত্ন করুন, বৈদেশিক নানাবিধ ভাষা হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া যাহাতে সাহিত্য সেবকগণ আপনাদের ভাষায় তাহা যোজনা করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। বৈদেশিক সাহিত্যের অধীত জ্ঞানরাশি নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করুন। নতুবা যিনি ইংরেজি পড়িয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার নিজেরই তাহাতে উপকার হইয়াছে, আর যিনি ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞানরাশি স্বদেশীয় ভাষাভাণ্ডারে স্থাপিত করিয়াছেন, তিনি নিজ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতি সাধারণের উপকার করিলেন। একজন আত্মস্বার্থে মুগ্ধ, স্বদেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন ও অনভিজ্ঞ; আর একজন স্বদেশহিতৈষিতার যোগ্য উপাধিতে অলঙ্কৃত। শেষোক্ত জন অবশ্যই মাতৃভূমির সুশিক্ষিত সুসন্তান। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি স্বদেশীয় সাহিত্য সম্যক্ আলোচনা ও তাহার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া বৈদেশিক সাহিত্যে মন্ত্রমুগ্ধ, তাঁহার শিক্ষা কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে গভীর সন্দেহ। ভিত্তিবিহীন অট্টালিকার অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয়, জাতীয় সাহিত্যানভিজ্ঞ ব্যক্তির শিক্ষাও তেমনি সম্ভব! দেশের দুর্ভাগ্য, আজ জাতীয় সাহিত্যানভিজ্ঞ বঙ্গীয় যুবকের পল্লবগ্রাহী, অসম্পন্ন জ্ঞানের বড় অহঙ্কার! তাই ভিত্তিহীন শিক্ষার শোচনীয় চিত্র জাজ্জ্বল্যমান! কোন কোন মহাপুরুষ ইংরেজি শিখিয়া সেই ভাষায় পুস্তক লেখেন, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির তাহার সহিত সহানুভূতির লেশমাত্র নাই। যে বিভিন্ন জাতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, সেই বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক লিখিয়া যিনি তাহাদিগের ভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা পান, তিনি নিতান্তই হাস্যাস্পদ, সন্দেহ নাই। ইংরেজ জাতির মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শিত হইতে পারেন, যাঁহারা আজীবন বিভিন্ন জাতির সাহিত্য অনুশীলন করিয়া তাহাদিগের গ্রহনীয় বিষয় গুলি আপনাদিগের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অতি যত্নে সন্নিবেশিত করিয়া জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি আজীবন কঠোর সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া ইংরেজি সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, আজ সেই স্বদেশপ্রেমিকগণের সাধনবৃক্ষ তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিয়া দিয়া জগতের কোটি কোটি ব্যক্তির জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেছে। আজিকার ইংরেজি সাহিত্যভাণ্ডার জগতে এমন কোন বিদ্যার অভাব আছে, যাহা সে

তাহার গৃহ হইতে দেখাইতে পারে না? সংগ্রহনৈপুণ্যেই ইহার এত গৌরব। নতুবা ভাষার সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্নতা অথবা শব্দ-সমৃদ্ধিতে সংস্কৃত-দুহিতা বঙ্গভাষা জগতের অন্য যে কোন ভাষাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালিনী। সেই দিন প্রকৃতই বাঙ্গালী জাতির গৌরবের দিন, যে দিন বঙ্গবাসী আপন গৃহে আপন ভাষায় সাহায্যে জগতের ইতিহাস অনুশীলন করিতে পারিবে। যদি কেহ বাঙ্গালা সাহিত্য সেবায় ইচ্ছুক থাকেন, যদি কেহ স্বদেশীয় সাহিত্যকে পরিপূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া জগতের প্রধান ভাষাগুলির সহিত সর্ব্বতোভাবে সমকক্ষ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে উপন্যাস ও কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, যে শিক্ষার ভিত্তির উপর আশ্রয় লইয়া বঙ্গবাসী জীবন পথের সর্ব্ববিধ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়। যত দিন আমাদের বঙ্গ বিদ্যালয় সমূহে জাতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার সদুপায়কল্পে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রাণপণে যত্ন না করিতেছেন, ততদিন উন্নতির আশা নাই। এক দিকে বৈদেশিক সাহিত্য শিক্ষা করিয়া তদুপার্জ্জিত জ্ঞান স্বদেশীয় সাহিত্যে সন্নিবেশিত করা যেমন মঙ্গলজনক, আবার বৈদেশিক শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া যদি তাহার প্রেমে জাতীয় উন্নতির কথা বিস্মৃত হইতে হয়, তাহা তেমনি অমঙ্গল ও পীড়াদায়ক। ঘটনাবর্ত্তে পতিত মাতৃহীন বালক এবং পুত্র-হারা জননীর জীবন চিত্র যেমন দুঃখের ও সহানুভূতির যোগ্য, মাতৃভাষা-বিস্মৃত হিন্দু সন্তানের জীবনও তেমনি দুঃখের ও শোচনীয়। পরিত্যক্ত, পথপার্শ্বে পতিত বালক অন্ত কুহুক লালিত ও পালিত, তাহার স্নেহময়ী জননীকে সে চেনেনা, জানেনা! এ দৃশ্য হৃদয়স্পর্শী! ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের ইতিহাস আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যৎকালে নর্ম্মাণ ফ্রেঞ্চ ভাষা ইংলণ্ডের ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছিল, তত দিন ইংলণ্ডের জাতীয়সাহিত্য অপরিস্ফুট ও অগৌরবান্বিত, যে দিন হইতে স্বদেশীয় কবিতার মৌলিকশক্তি বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল সেই দিন ইংলণ্ডীয় সাহিত্যে প্রকৃত জীবন সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ আপন শক্তি সম্প্রসারণ করিল। ফরাসী সাহিত্য যতদিন জর্ম্মানরাজ্যে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল, জর্ম্মানগণ যতদিন ফরাসী ভাষাধ্যয়নে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিতেছিলেন, ততদিন জর্ম্মান্ জাতির জাতীয় সাহিত্য ঘোরান্ধকারে লুক্কায়িত ছিল, কিন্তু স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়, যে দিন অমরকবি গেটে (Goethe) জর্ম্মানীর জাতীয় ভাষাকে বীণানিংশ্বনে আবাহন করিয়া জাতীয় সুবর্ণ সিংহাসনোপরি স্থাপিত করিলেন, সেই দিন জর্ম্মান্ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে জর্ম্মান্ জাতির প্রকৃত গৌরবান্বিত যুগের অবতারণা হইল। আজ জর্ম্মান্ সাহিত্যের আশ্রয়ে জর্ম্মান্ জাতি সর্ব্বতোভাবে জগতের সমক্ষে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম। য়ুরোপীয় ইতিহাস পরিত্যাগ করিলে আসিয়াক্ষেত্রেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কবি ফেরদোশী যতদিন না পারস্যে জাতীয় সাহিত্যকে আবাহন করিয়াছিলেন, ততদিন আরবীয় ভাষাশক্তি সে দেশীয় নর নারীকে নিয়মিত করিতেছিল; যে দিন ফেরদোশীর অনুভাবী ধ্বনি জাগিয়া উঠিল, সেই দিন পারস্যের জাতীয় সাহিত্য গৌরবান্বিত যুগের প্রবর্ত্তনা

করিল। হাফেজের অমন মধুর কবিতা,সাদীর অমন চিত্তমুগ্ধকারী উপদেশ, যদি আরবীয় ভাষায় বিবৃত হইত, তবে জগতের লোককে এত অধিক আকর্ষিত করিতে পারিত না। মাতৃভাষার আশ্রয়ে তাঁহাদের হৃদয়ের যে কবাট উদ্‌ঘাটিত হইয়া অমৃতের প্রস্রবণ ছুটাইয়াছিল, বৈদেশিক সাহিত্যের অগাধ জ্ঞান, তুলনায় তাহার কণামাত্রও প্রকাশ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। সাহিত্য-জগতের ইতিহাস তাই ইহাই বলিয়া দেয়, জাতীয় জীবনে শক্তিসঞ্চার করিতে, জগতের গৌরবান্বিত জাতি সমূহের সহিত সর্ব্বতোভাবে সমকক্ষতা করিতে, জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিঘ্নবিনাশন পরমদেবতার আশীর্ব্বাদ ভারতবাসীদিগের মস্তোকোপরি বর্ষিত হোক্, দিনে দিনে আমরা মাতৃভাষার সেবাব্রতে দেহমন সমর্পণ করিতে শিক্ষা করি। ইংরেজি সাহিত্য কদাপি ভারতের সাহিত্যরূপে পরিণত হইবে না। সে আশা আকাশকুসুম মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। শিশু যাহা মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা করে, যাহা তাহার প্রতিরক্তবিন্দুর অণুপরমাণুতে বিরাজমান, তাহা বিস্মৃত হইয়া যাহারা বৈদেশিক ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে পরিণত করিতে আশাকরে, তাহাদের সে আশা বাতুলতার নামান্তর ও তাহারা মনুষ্যদেহাবরণে কিম্ভূতকিমাকার জন্তু! একদিন বাঙ্গলাভাষা সমগ্রভারতে নেতৃত্ব করিবে, এ আশা সম্ভাব্য, কারণ সমগ্র ভারতের সহিত ইহার শোণিত-সম্পর্ক আছে, কিন্তু ইংরেজি ভাষা দ্বারা সে আশা করা আমাদের অযোগ্য ও অসম্ভব। দিন থাকিতে ভারতীয় যুবকগণ বৈদেশিক জ্ঞানরাশি আপন সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থাপিত করিয়া মাতৃভাষার সাহায্যে কল্পনা ও কার্য্যে মৌলিকতা প্রকাশ করুন,—অনুদিন সাহিত্য-সেবাব্রতের শান্তিময় ছায়ায় তাপিত, পরাধীনতা-ক্লিষ্ট জীবনের অবসাদ অপনোদন করুন।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

দধিবীজ।

ভাবপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থে পঞ্চবিধ দধি বর্ণিত হইয়াছে। যথা, (১) যে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়, অথচ অব্যক্তরস অর্থাৎ সম্যক্ দধিরূপে পরিণত না হওয়াতে স্বীয় রসবিহীন, তাহা মন্দদধি। (২) সম্যক্ গাঢ় হওয়াতে যে দুগ্ধে দধির মধুরতা প্রকাশিত হয়, কিন্তু যাহাতে অম্লরস অনুভূত হয় না, তাহা স্বাদু দধি। (৩) যে দুগ্ধ গাঢ় হইয়া ঈষৎ কষায় সংযুক্ত মধুর অম্লাস্বাদ হয়, তাহা স্বাদম্ল দধি। (৪) যে মধুরতা বিহীন দধির অম্লরস ব্যক্তীভূত হয়, তাহা অম্লদধি। এবং (৫) যে দধিদ্বারা দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ ও কণ্ঠাদিতে দাহ উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যম্লদধি।

পক্বদুগ্ধে দধিবীজ সংযোগ করিলে দধি প্রস্তুত হয়, ইহাতে নূতনত্ব বা জ্ঞাতব্য বিষয় কি আছে? কথাটা সহজ বটে, “কেন না সকলেই দধি প্রস্তুত করিতে জানেন। দধি প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া সহজ, কিন্তু দুগ্ধ কিরূপে কি নিগূঢ় কারণে দধিতে পরিণত হয়, তাহা বুঝা বা বুঝান সহজ নহে। আমাদের খাদ্যকে সাধারণতঃ পাঁচভাগে

বিভক্ত করা যায়। (১) অণ্ডশ্বেতাদি, (২) শর্করাদি (৩) ঘৃতাদি (৪) লবণাদি ও (৫) জল। এই পাঁচটি সামগ্রীই দুগ্ধে যথোচিত পরিমাণে আছে। এজন্য কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারা যায়। স্তন্যপায়ী শিশু কেবল দুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অণ্ডেও এই কয়েকটি পদার্থ যথোপযুক্ত পরিমাণে আছে, এজন্য অণ্ডজ প্রাণিগণের শিশু অণ্ডের ভিতর পরিপুষ্ট হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ ও অণ্ড, আমাদের উৎকৃষ্ট অনুকরণীয় খাদ্য।

আমাদের দেশে দুগ্ধ হইতে মাখন, নবনীত, ছানা, দধি, ঘোল, সর, ও ঘৃত প্রস্তুত হয়। মাখন, নবনীত, সর ও ঘৃত প্রায় একই পদার্থ। ইহারা ঘৃতাদি। মাখন ও ননী একই পদার্থ। তবে অপক্ক দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন এবং দধি মন্থন করিয়া ননী পাওয়া যায়। উৎপত্তি প্রকারভেদে একই পদার্থের মৃক্ষণ (মাখন) ও নবনীত এই দুই নাম হইয়াছে। উষ্ণ পক্কদুগ্ধে দধি বা অপর অম্ল সংযোগ করিলে যে পিণ্ডাকৃতি পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে আমিক্ষা, তক্র পিণ্ড বা ছানা বলা * যায়। অপক্ক দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন উদ্ধার করিলে যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে উষ্ণাবস্থায় অম্ল সংযোগে যে পিণ্ডাকৃতি পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে কেসিন † বলা যায়। অতএব নবনীত ও কেসিন লইয়া আমিক্ষা। ছানা বাহির করিয়া লইলে যে দ্রবপদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে সাধুভাষায় মোরট বলা যায়। সচরাচর তাহা ছানার জল নামে প্রচলিত। কৌশলক্রমে দুগ্ধ হইতে এক প্রকার শর্করা বাহির করিতে পারা যায়। তাহাকে দুগ্ধ শর্করা বলে। অতএব কেসিন, দুগ্ধশর্করা, নবনীত ও ছানার জল এই কয়েক অংশে দুগ্ধকে সামান্যতঃ বিভক্ত করিতে পারা যায়।

উপরের লিখিত দুগ্ধের উপাদানগুলি স্মরণ করিলে বুঝা যাইবে যে, দধির গাঢ় অংশ বা মস্ত, আমিক্ষা মাত্র এবং তাহার দ্রবভাগ দধ্যম্ল*সংযুক্ত দুগ্ধের জলীয় পদার্থ।

দুগ্ধে অম্লসংযোগ করিলে ছানা উৎপন্ন হয়। কোন প্রকারে দুগ্ধে দধ্যম্ল উৎপাদন করিতে পারিলেই সেই অম্ল সংযোগ বশতঃ দুগ্ধ, দধিতে পরিণত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধে দধ্যম্ল উৎপাদনের ক্রিয়া বুঝিলেই দুগ্ধের দধিতে পরিণতি বুঝা যাইবে।

ঈষদুষ্ণ দুগ্ধে দধিবীজ সংযোগ করিলে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। দধিবীজ স্থান বিশেষে 'সাজ,' 'দম্বল' † প্রভৃতি নামে প্রচলিত। সাজের পরিবর্ত্তে তেঁতুল, লেবু প্রভৃতির অম্লরস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিলে দুগ্ধ স্বাদু দধিবৎ গাঢ় হয় মাত্র। কিন্তু দধির বিশেষ অম্লত্ব তাহাতে অনুভূত হয় না। অতএব দুগ্ধের সহিত যে সাজ যোগ করা যায়, তাহার সহিত দধ্যম্লের নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে।

কতখানি দুগ্ধে কতখানি সাজ দিলে স্বাদুদধি উৎপন্ন হইবে, তাহা পরিমাণ করিবার কোন উপায় নাই। তবে সাজ

---

* নষ্ট দুগ্ধ সিদ্ধ করিলে যে পিণ্ডাকৃতি অংশ পাওয়া যায়, তাহার নাম কিলাট। ইহাও ছানা।

† ইহা ইংরাজী casein শব্দ।

* যে বিশেষ অম্ল হেতু দধির অম্লাস্বাদ, সেই অম্লকে দধ্যম্ল বলা গেল।

† 'সাজ' শব্দ বোধ হয়, দধির সজ্জা বা উপকরণ হইতে উৎপন্ন। 'দম্বল' শব্দ, বোধ হয়, দধি অম্ল বা দধ্যম্ল হইতে উৎপন্ন।

যতই অম্লগুণ বিশিষ্ট হয়, ততই অল্পমাত্রায় দিতে হয়। অল্প মাত্র সাজ যোগে যখন অনেকখানি দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়, তখন সাজের অম্লরস বশতঃ যে উৎপন্ন দধি অম্লগুণ বিশিষ্ট হয় না, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

সুরা প্রস্তুত করিতে হইলে তণ্ডুলাদি সুরার উপকরণে কিণ্ব বা সুরাবীজ যোগ করিতে হয়। নতুবা সুরা উৎপন্ন হয় না। একথা সকলেই জানেন। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। সুরা উৎপাদনের নিমিত্ত সুরাবীজের আবশ্যকতা ভারতীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন*। সুরাবীজ কি এবং তাহা কিরূপে তণ্ডুলাদিকে সুরাতে পরিণত করে, তাহার বর্ণনা পাইলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা সুরাবীজের আবশ্যকতা বুঝিলেও অনুবীক্ষণ যন্ত্রাভাবে তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

দধ্যম্ল কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা য়ুরোপেও কয়েক বৎসর মাত্র অবধারিত হইয়াছে। দুগ্ধ রাখিয়া দিলে উহা ক্রমশঃ অম্ল হইয়া পড়ে। খ্রীঃ ১৭৮০ অব্দে এইরূপ বিকৃত দুগ্ধ হইতে প্রথমতঃ শীলে সাহেব রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা দধ্যম্লকে পৃথক্ করেন। তদবধি অনেক রসায়নবিদ্ পণ্ডিত দধ্যম্ল উৎপাদনের কারণ অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ফরাসী পণ্ডিত পাস্তুর সাহেব দৃঢ় অধ্যবসায় গুণে সুরাবীজের প্রকৃতি নির্ণয় করেন। তদনন্তর তিনিই দধিবীজের স্বরূপ ও ক্রিয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সুরা সম্বন্ধে কিণ্ব যেমন, দধ্যম্ল সম্বন্ধে দধিবীজও তেমনই। প্রস্তুত তণ্ডুলাদিতে অল্পমাত্র কিণ্ব সংযোগে সমুদায় তণ্ডুলের বিকৃতি ঘটে, অল্পমাত্র দধিবীজ সংযোগে অনেকখানি দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। সুরাবীজ ও দধিবীজ এমন কি পদার্থ, যাহার অত্যল্পাংশক্তি দ্বারা প্রভূত কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যাইতেছে। ইক্ষু খর্জ্জুর তাল প্রভৃতির মিষ্ট রস রাখিয়া দিলে উষ্ণতানুসারে অল্পাধিক সময় মধ্যে মিষ্টত্বের পরিবর্ত্তে ঐ রসে অম্লত্ব* অনুভূত হয়, রসের উপরিভাগে ফেণা উৎপন্ন হয় এবং তাহার সঙ্গে ফুট্ ফুট্ শব্দ করিয়া বুদ্ বুদ্ উঠিতে থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ 'গেঁজে' বা 'মেতে' যাওয়া বলে। সাধুভাষায় ইহাকে সন্ধিত বলা যায়। ঐ সকল মিষ্টরস মেতে যাইলে তাহাদের মাদকতা শক্তি জন্মে। অর্থাৎ সেই সকল পদার্থে সুরা উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ ধান্য গোধুম প্রভৃতি সন্ধিত করিয়া সুরা, ইক্ষুরস সন্ধিত করিয়া শীধু এবং তাল ও খেজুর রস সন্ধিত করিয়া বারুণী বা তাড়ি করা হয়।

ইক্ষু বা খর্জ্জুর রস পরিষ্কৃত† বোতলে পূর্ণ করিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া, ফুটাইবার সময় বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে উক্ত রস বিকৃত হইয়া শুক্তে পরিণত হয় না। তদ্রূপ, মধু ও দুগ্ধ পরিষ্কৃত বোতলে পূর্ণ করিয়া ফুটাইয়া বোতলের মুখ

* কিণ্ব বা সুরাবীজ অপহরণ করিলে তাহার দ্বিগুণ মূল্য দণ্ড মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন।

* মধুর রস বিকৃত হইয়া অম্লরস বিশিষ্ট হইলে তাহাকে শুক্ত বলে। প্রচলিত কথায় ইহাকে সিরকা বলা যায়।

† পরিষ্কৃত অর্থে রাসায়নিক উপায়ে পরিষ্কৃত বুঝিতে হইবে। একপে পরিষ্কৃত করিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা পরে দ্রষ্টব্য।

বন্ধ করিলে, উহারা বিকৃত হয় না। বায়ুর অভাবে যে তাহারা বিকৃত হয় না, তাহা নহে। কেন না বোতলের মুখ কর্ক দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধ না করিয়া কার্পাস পিণ্ড দ্বারা বন্ধ করিলেও উহারা সহজে বিকৃত হয় না, অথচ বোতলের মধ্যে বায়ু গমনাগমন বন্ধ হয় না।

খেজুর রস মুখ খোলা পাত্রে কয়েকদিন রাখিয়া দিলে মিষ্ট রসের পরিবর্ত্তে উহা শুক্তে পরিণত হয়। পাত্রের তলায় শ্বেত বর্ণের এক প্রকার সামগ্রী সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। সেই সামগ্রীর কিঞ্চিৎ অপর কোন খেজুর, তাল, ইক্ষু প্রভৃতির মিষ্টরসে নিক্ষেপ করিলে উষ্ণতানুসারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রস মাতিয়া উঠে। কয়েক দিবস পরে দেখিলে উহাতে প্রদত্ত শ্বেত পদার্থের পরিমাণাপেক্ষা উক্ত পদার্থ অনেক খানি সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। অতএব ঐ শ্বেত পদার্থই মধুর রসকে সঞ্চিত করে এবং তদ্ব্যতীত মধুর রস সুরায় পরিণত হয় না।

উক্ত শ্বেত পদার্থের কিঞ্চিৎ লইয়া অনুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা দেখিলে অতীব ক্ষুদ্র অণ্ডাকার কোষরাশি দেখা যায়। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, তিন সহস্র একত্র পাশাপাশি রাখিলে এক ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হয় না। নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, ইহাদের প্রত্যেক কোষ একটি উদ্ভিদ্ বিশেষ। ঐ উদ্ভিদ্ কোষ তাল খেজুর প্রভৃতির মধুর রসের সহিত যুক্ত হইলে উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। এই অঙ্কুরও অণ্ডাকার কোষ মাত্র। অনেকগুলি কোষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, অনেকগুলি একত্র হইয়া গ্রথিত মালার ন্যায় পরস্পর যুক্ত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে এই শ্বেত পদার্থকে ঈষ্ট বলে, বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে সুরাবীজাণু বলা যাইতে পারে।

সুরাবীজাণু মধুর রসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া স্বীয় দেহ পুষ্টি করে এবং অল্পকাল মধ্যে অসংখ্য অঙ্কুর প্রসব করে। এই জৈবনিক ক্রিয়া বশতঃ মধুর রসের কিয়দংশ সুরায় পরিণত হয়। অতএব উদ্ভিদ্ বিশেষের জৈবনিক ক্রিয়াই সুরার কারণ, জৈবনিক ক্রিয়ার আরম্ভে সুরা উৎপাদনের আরম্ভ, তাহার অবসানে সুরা উৎপাদনের অবসান। সুরাবীজাণুর পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি ব্যতীত সুরা উৎপন্ন হয় না।

এক্ষণে দধ্যম্ল উৎপাদনের কারণ বুঝা সহজ হইবে। বস্তুতঃ, যেমন সুরা, ইক্ষুশর্করার সন্ধান ফল, দধ্যম্ল তেমনই দুগ্ধশর্করার সন্ধান ফল। যেমন উদ্ভিদ বিশেষের জৈবনিক ক্রিয়াবশতঃ ইক্ষু খর্জ্জুর প্রভৃতির মধুর রস সুরাতে পরিণত হয়, তেমনই অন্য এক প্রকার উদ্ভিদের জৈবনিক ক্রিয়াবশতঃ দুগ্ধশর্করা দধ্যম্লতে পরিণত হয়। সুরাবীজাণু চিনিকে সুরা ও অঙ্গারকাম্ল নামক গ্যাসে পরিণত করে*। সুরা, জলের সহিত মিশ্রিত থাকে, অঙ্গারকাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হওয়াতে সমুদায় রসে অন্তঃক্ষোভ হইতে থাকে। ইহাতেই খেজুর রসের ফেনার উৎপত্তি। এই গ্যাসের বুদ্বুদ্ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই ফুটফুট শব্দ উৎপন্ন হয়। দধ্যম্ল উৎপত্তির সময় এতাদৃশ ফেনা বা ফুটফুট উৎপন্ন হয় না, কেন না দুগ্ধশর্করার দধ্যম্লে পরিণত হইবার সময় অঙ্গারকাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয় না।‡

* এই দুইটি ব্যতীত, অন্য দুইটি পদার্থও উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরিমাণ নিতান্ত অল্প বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা গেল না।

‡ যেখানেই জৈবনিক ক্রিয়া, সেই খানেই অঙ্গা-

যে উদ্ভিদ কোষাণুর জন্ম ও বৃদ্ধি বশতঃ ইক্ষুশর্করা সুরাতে পরিণত হয়, তদ্দ্বারা দুগ্ধ শর্করা দধ্যম্লে পরিণত হয় না। আর এক প্রকার উদ্ভিদ কোষাণু দধ্যম্লের কারণ। এই উদ্ভিদ্ দুগ্ধের শর্করাকে দধ্যম্লে পরিণত করে। সেই অম্ল যোগ বশতঃ দুগ্ধের কেসিন মৃদুভাবে অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক হয়। এইরূপেই দধিতে দুগ্ধের পরিণতি।

দধির জলীয়ভাগ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে উহাতে অতীব সূক্ষ্ম গোলাকার বিন্দুর ন্যায় উদ্ভিদ কোষাণু দেখা যায়। অনেকগুলি ১০।১৫ টা করিয়া পুঁতির মালার মত পরস্পর যুক্ত থাকে। সুরাবীজাণু অপেক্ষা দধ্যম্লবীজাণু অনেক ক্ষুদ্র। বস্তুতঃ চারি পাঁচ শত গুণ বড় করিলেও পেন্‌সিলের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় না। যেগুলি বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহাদিগকে ভয়ানক বেগে নড়িতে দেখা যায়। *

দধির অম্লত্বের পরিমাণানুসারে দধ্যম্লবীজাণুর সংখ্যার তারতম্য লক্ষিত হয়। স্বাদু দধিতে অল্প সংখ্যক, অত্যম্ল দধিতে অসংখ্য দধ্যম্ল বীজাণু দেখা যায়। তিন চারি দিবসের পুরাতন দধির এক বিন্দু জলে কোটি কোটি এই বীজাণু দেখা যায়। এই বীজাণুকে পৃথক্ করিয়া জলহীন করিলে উহার সমষ্টি সুরাবীজের ন্যায় দেখায়। সুরাবীজের ন্যায় উহা তত সাদা নহে।

এই বীজাণু শুষ্ক করিলে কিম্বা জলে ফুটাইলে তাহার জৈবনিক শক্তি খর্ব্ব হয় এবং উহা তখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

যে দ্রব্যে দধ্যম্লবীজ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাতে সুরাবীজ রোপণ করিলে, সুরাবীজ বর্দ্ধিত ও সুরা উৎপন্ন হয়। সুরাবীজ ও দধ্যম্লবীজ একই চিনির রসে বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কেবল পদার্থের উপাদান ভেদে কোনটিতে বা সুরাবীজ, কোনটিতে বা দধ্যম্লবীজ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

দুগ্ধশর্করা * ও যে সকল পদার্থ সহজে দুগ্ধশর্করায় পরিবর্ত্তিত হয়, তৎসমুদায় সহজে দধ্যম্লে পরিণত হয়। কিন্তু যে সকল শর্করা সহজে সুরাতে পরিণত হয়, তৎসমুদায় সহজে দধ্যম্লে পরিণত হয় না। দুগ্ধশর্করা সহজে সুরাতে পরিণত হয় না, কিন্তু দধ্যম্লে সহজেই পরিণত হয়।

উপরে বলা গিয়াছে যে, দধিবীজ দ্বারা দুগ্ধের শর্করাংশ দধ্যম্লে পরিবর্ত্তিত হয়। সেই অম্লসংযোগে দুগ্ধের কেসিনাংশ দ্রবাবস্থা ত্যাগ করিয়া কঠিনাকার ধারণ করে। উহা তখন অদ্রবণীয় হওয়াতে দুগ্ধের জলীয়াংশ হইতে পৃথক্ হয়। কিন্তু দধিতে যে অবস্থায় ছানা থাকে, তাহাকে প্রকৃত ছানার অবস্থা বলা যাইতে পারে না। উহা ছানার প্রাথমিক অবস্থা, দধিকে উষ্ণ করিলে তাহা প্রকৃত ছানা রূপে ব্যক্ত হয়। †

রকাম্ল গ্যাসের উৎপত্তি। কি ক্ষুদ্র কোষাণু, কি বৃহৎ তরু, যাবতীয় উদ্ভিদই আমাদের ন্যায় অম্লজনক গ্রহণ এবং অঙ্গারকাম্ল অর্পণ করে। ইহারই নাম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া। এইরূপে উৎপন্ন অঙ্গারকাম্ল গ্যাস বশতঃ দধিতে অল্প ফেণা দৃষ্ট হয়।

* এই গতি জৈবনিক ক্রিয়ান্তর্গত নহে। জলে সূক্ষ্ম আজীব কণা ভাসমান থাকিলেও তাহার এই প্রকার গতি লক্ষিত হয়। এই প্রকার গতিকে ব্রনিয় গতি (Brownian movement) বলা যায়।

* এখানে বলা উচিত যে ইক্ষুশর্করা ও দুগ্ধশর্করা দুইটি পদার্থ এক নহে। উভয়ের মিষ্ট আস্বাদ হইলেও উপাদান পরিমাণের প্রভেদ আছে।

† এই ছানার নাম দই ছানা। উড়িষ্যার এই ছানা বিশেষ প্রচলিত। দধি হইতে ছানা প্রস্তুত করি-

দধ্যম্লবীজাণুর জীবনেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহা উপযুক্ত সামগ্রীতে রোপিত হইলে ৩৫°শ হইতে ৪০°শ* উষ্ণতায় উহার ক্রিয়া সম্যক্ লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ, একই গভীর থাঁটি দুগ্ধ ফুটাইয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা গিয়াছিল। তিন অংশে উহা বিভক্ত করিয়া, প্রথম ভাগের উষ্ণতা ৪০°শ, দ্বিতীয় ভাগের উষ্ণতা ৪৮°শ, তৃতীয় ভাগের উষ্ণতা ৫৮°শ করিয়া একই সাজর সমপরিমাণে মিশ্রিত করা গিয়াছিল। ২৪ ঘণ্টা পরে দেখা গেল যে, প্রথম দুগ্ধ উৎকৃষ্ট স্বাদু দধিতে পরিণত হইয়াছে। তিনটিতেই অল্পমাত্র অম্লরস অনুভূত হয় কিন্তু প্রথমটী এমন বসিয়া গিয়াছিল যে, পাত্রটী উপুড় করাতেও দধি বিচলিত হয় নাই। ইহা বিলক্ষণ শ্বেত বর্ণ হইয়াছিল, এবং বোধ হয় পেটুক মহাশয়েরা তাহাকে প্রথম শ্রেণীর দধি বলিতে পারিতেন। দ্বিতীয় পাত্রের দধি ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছিল এবং উহা তাদৃশ কঠিন হয় নাই এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ জলও নিঃসৃত হইয়াছিল। তৃতীয় পাত্রের দধি কিঞ্চিৎ অধিক হরিদ্রাভ হয় এবং তাহাতে জলীয়ভাগও কিঞ্চিৎ অধিক দৃষ্ট হয়।

পুনশ্চ, খাঁটি গব্যদুগ্ধ ফুটাইয়া ৩৫°শ, ৩৮°শ, ৪০°শ ও ৪৫°শ উষ্ণতায় একই সাজর সমপরিমাণ মিশ্রিত করা গিয়াছিল। এই সকলের মধ্যে ৩৫°শ উষ্ণতায় যে দধি বসান হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং ৪৫°শ উষ্ণতায় দুগ্ধের দধি নিকৃষ্ট হয়।

এই সকল ও অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, দুগ্ধের ৩৫° শ হইতে ৪০° শ উষ্ণতা পর্য্যন্ত থাকিলেই স্বাদু দধি উৎপন্ন হয়। এই সকল পরীক্ষা শীতকালে করা হইয়াছিল এবং দুগ্ধের উষ্ণতা বরাবর ঠিক সমান রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই। বোধ হয়, কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত দুগ্ধের ৪০°শ উষ্ণতা রাখিলে উৎকৃষ্ট দধি হইতে পারে*। গ্রীষ্মকালে বায়ুর উষ্ণতা অধিক থাকে, তখন আরও কম উষ্ণতায় দুগ্ধ উত্তম দধিতে পরিণত হইতে পারে।

সাজর পরিমাণ বলা কঠিন। দধ্যম্ল বীজাণুর সংখ্যানুসারে সাজর পরিমাণের ন্যূনাধিক্য করা কর্ত্তব্য। নানা পরিমাণের অম্ল গুণ বিশিষ্ট সাজ অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, দধি পচিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত উহার অম্লতানুসারে বীজাণুসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ‡

যার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে ছানা কম পাওয়া যায়। কটকের গাভী দুগ্ধের প্রায় প্রতি ৬ সেরে ১ সের ছানা পাওয়া যায়। কিন্তু ১০ সের দুগ্ধের দধি হইতে ১ সের মাত্র ছানা পাইয়াছি। ছানার সহিত ন্যূনাধিক জল মিশ্রিত থাকে। কিন্তু তজ্জন্য এত প্রভেদ হয় নাই। কলিকাতার বাজারের দুগ্ধে প্রতি ১৭ সের হইতে ৩৬ সেরে ১ সের ছানা পাওয়া গিয়াছে। কেন এত কম, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কটকে গাভী দুগ্ধে সের প্রতি ৩।০ হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত মাখন পাইয়াছি। কিন্তু কলিকাতার বাজারের দুগ্ধে নিতান্ত কম। গাভীর ছোট বড় আকার ও আহার ভেদে দুগ্ধের উপাদানের প্রভেদ ঘটে।

* শতাংশিক তাপমান।

* গোয়ালারা ইহা জানে। দধি বসাইবার সময় তাহারা দুগ্ধে সাজ দিয়া হাঁড়িকে নিরন্ত আগুনের নিকট রাখে।

‡ দুই তিন দিবসের পুরাতন দধি অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দধ্যম্লবীজাণু ব্যতীত উহাতে অসংখ্য বক্তিরি (Bacteria) নামক অপর জাতীয় উদ্ভিদ কোষাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাহাদের অবিশ্রান্ত গতি দেখিলে সহসা কীটাণু বলিয়া ভ্রম হয়। বস্তুতঃ কোন 'ফলারে' ব্রাহ্মণ দধিতে তৎসমুদায় দেখিয়া দধির প্রতি

আর একটী কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। দুই তিন চারি দিবসের পুরাতন দধিতে অসংখ্য দধ্যম্লবীজাণু দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন, উহাতে কখন কখন আর এক প্রকার কোষাণু দৃষ্ট হয়। এ গুলির এই বিচিত্র যে প্রত্যেকের ভিতরে জীবকেন্দ্র (nucleus) দেখা যায়। সাধারণতঃ যে দধ্যম্ল কোষাণু দেখা যায়, তাহা এত ক্ষুদ্র যে, তন্মধ্যে জীবকেন্দ্র বা অপর কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরি উক্ত কোষাণু গুলি বড়, কতকটা সুরাবীজাণুর মত দেখায়। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন থাকে, অধিকাংশই মালার আকারে পরস্পর সংলগ্ন থাকে। ইহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র দধ্যম্ল বীজাণুর কি সম্পর্ক, তাহা নিরূপণ করিতে পারি নাই। দুই জাতীয়কে পৃথক্ করিয়া দুগ্ধ শর্করায় রোপণ করিলে কি ফল হয়, তাহা না জানিলে এ প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারে না। *

আর একটী কথা। কখন কখন দধিকে আটাল হইতে দেখা যায়। দধির প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না। অনেকেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক, এই রূপ বিকৃত দধিকে রুচিপূর্ব্বক আহার করা যায় না। সাজব তারতম্যে দধির এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আর এক প্রকার কোষাণু, দধির এবম্বিধ বিকারের কারণ। এই কোষাণু দুগ্ধ শর্করাকে এইরূপ আটাবৎ পদার্থে পরিণত করে। পাস্তুর সাহেবের মতে ইহা ইক্ষুশর্করাকেও এইরূপ আটা বিশেষে পরিবর্ত্তন করে।

পুরাতন ছানার জলেও বিস্তর দধ্যম্ল কোষাণু দেখা যায়। বস্তুতঃ ছানার জল দিয়া অনায়াসে দধি বসান যাইতে পারে। দধি যোগে দুগ্ধের ছানা প্রস্তুত করিলে দধির দধ্যম্লবীজাণু ছানার জলে যথেষ্ট থাকিয়া যায়। ছানার জলে দুগ্ধ শর্করা বর্ত্তমান। সুতরাং তাহাতে দধ্যম্লবীজাণুর পরিপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি বিলক্ষণ হইতে থাকে।

উপযুক্ত খাদ্য দিয়া বিলাতে সুরাবীজ পৃথগ্‌ভাবে জন্মান হয়। লক্ষাধিক সের সুরাবীজ এইরূপে প্রস্তুত করিয়া টিনের কৌটায় বিক্রয় হয়। সচরাচর ইহাকে 'রুটীওয়ালার' বীজ বা 'ঈষ্ট' বলে। সুরা প্রস্তুত করিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, পাঁওরুটী ফুলাইবার জন্য সুরাবীজ যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে তাড়ীতে ও মদ্য প্রস্তুতকালে ভাটিতে প্রচুর পরিমাণে সুরাবীজ জন্মে। এই সুরাবীজের কোনরূপ ব্যবহার আমাদের দেশে নাই। বৃথা তৎসমুদায় ফেলিয়া দেওয়া হয়।

দধিবীজে কোষাণু গুলি পৃথক্ করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে না কি? আমাদের দেশে দধির যেরূপ ব্যবহার, অন্যত্র কোথাও তদ্রূপ নাই। সাজব ইতর বিশেষে, উহার অম্লরসের পরিমাণ অনুসারে, ও অপরাপর কোষাণুর ক্রিয়ানুসারে দধির গুণাগুণের প্রভেদ ঘটে। অবিমিশ্র দধ্যম্ল কোষাণু উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে স্বাদু দধি প্রস্তুত করা সহজ হইবার সম্ভাবনা। সুরা-

বীতরাগ হইয়াছেন। উত্তম স্বাদু দধি ২৪ ঘণ্টা পরে দেখিলে তাহাতেও অল্লাধিক বক্‌তিরি দেখা যায়। বাস্তবিক, বকতিরি নিবারণ করা একপ্রকার অসম্ভব।

* রাসায়নিক উপায়ে স্মিজ সাহেব (Schmitz) দধ্যম্লবীজাণুতে জীবকেন্দ্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সকল বড় কোষাণু দধ্যম্লবীজাণুর রূপান্তর হইতে পারে। (See De Bary's comparative morphology and liology of the Fungi.)

বীজ পাত্রের তলায়, গায়ে সঞ্চিত হয়, তাহাতেই তাহাকে সহজে পৃথক্ করিয়া জল দিয়া ধৌত ও পরিষ্কৃত করিতে পারা যায়। দধ্যম্লবীজাণু অতিশয় ক্ষুদ্র, ইহাকে পৃথক্ করা তত সহজ নহে। কিন্তু চেষ্টা করিলে অনায়াসে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। এরূপ করিতে পারিলে, দুগ্ধের পরিমাণ অনুসারে উচিত পরিমাণ শুষ্ক দধ্যম্লবীজাণু মিশ্রিত করিয়া সহজে ইচ্ছানুরূপ দধি প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে।

এক্ষণে একটি গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে। এই সকল সন্ধানবীজের উৎপত্তি কিরূপে? ময়লায় কত প্রকার কীট জন্মে, জান্তব পদার্থ পচিয়া গেলে উহাতে নানাবিধ জীবাণু দৃষ্টিগোচর হয়। খেজুর রস রাখিয়া দিলে উহা ফেনিল হইয়া উঠে। ইহার কারণ যদ্যপি উদ্ভিদ কোষাণু হইল, তবে খেজুর রসে উহা কোথা হইতে আইসে? দুগ্ধ রাখিয়া দিলে উহা নষ্ট হয় এবং উহাতে অম্লত্ব অনুভূত হয়। মধু রাখিয়া দিলে কিয়ৎদিন পরে উহার অম্লগুণ জন্মে। এ সকল স্থলে কোন কোষাণু বা বিশেষ বীজ রোপিত হয় না, অথচ কিরূপে বিশেষ বিশেষ জীবাণু সকল উৎপন্ন হয়?

এই জটিল প্রশ্নের সমুচিত উত্তর দিতে হইলে, একখানি প্রকাণ্ড পুঁথি লিখিতে হয়। জীব হইতে জীবোৎপত্তি, না অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি? বহুকালাবধি জীববিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা এ প্রশ্ন আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ বিগত খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপে অজীব হইতে জীবোৎপত্তি মত বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে স্বেদজ জীব বলিয়া জীবশ্রেণী আছে। কিন্তু বলা বাহুল্য নানাবিধ পরীক্ষা ও পরিদর্শন করিয়া "জীবাৎ জীবঃ" এই মতটি এক্ষণে পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতেছেন। সূক্ষ্মদেহী জীবাণু সকল অনায়াসে বায়ুতে ধূলিবৎ ভাসিয়া বেড়ায়। দধ্যম্লবীজাণু ও সুরাবীজাণু এইরূপে বায়ুতে ভাসমান আছে। উপযুক্ত সামগ্রীতে পড়িলে তাহাতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত মধুর রসপূর্ণ বোতলের মুখ বন্ধ রাখিলে তন্মধ্যস্থিত রস বিকৃত হয় না। তুলাপিণ্ড দ্বারা মুখ বন্ধ করিলে তুলাতে জীবাণু সকল প্রতিরুদ্ধ হয়। চালনি দ্বারা যেমন তুঁষ হইতে তণ্ডুল পৃথক্ করা যায়, তদ্রূপ তুলা, জীবাণুগুলিকে ছাঁকিয়া শুদ্ধ বায়ু বোতলে যাইতে দেয়। এজন্যই মধুর রস বিকৃত হয় না। কিন্তু বোতলে কিম্বা তুলাতে জীবাণু সকল যাহাতে না থাকে তাহা করিয়া লইতে হইবে। এই সকল সূক্ষ্মদেহী জীবাণু বায়ুতে ভাসমান থাকে বলিয়া দুগ্ধ, মধু, খেজুর রস প্রভৃতির শর্করা ঐ সকল বীজাণুর জৈবনিক ক্রিয়াবশতঃ বিকৃত হয়। মৃতদেহ পচিবার কারণও সূক্ষ্মদেহী জীবাণু। মৃতদেহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ঐ সকল জীবাণু স্বীয় দেহপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি করে। ইহাতেই মৃতদেহ অন্যান্য পদার্থে পরিণত হয়। অতএব একদিকে লয়, অন্যদিকে উৎপত্তি; একদিকে প্রাণ বিয়োগ, অন্যদিকে প্রাণ সঞ্চার চলিতে থাকে; এক প্রাণ যায়, অন্য প্রাণ আসে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

দেবস্বপ্ন।

শরতের সায়াহ্নে একদা
বসে আছি মহানদী তটে,
অস্তমিত রবি করমালা
ঝলকিছে গগনের পটে।
বিম্বিত কমলাবর্ণে মাথা
মহানদী স্বর্ণ নদী প্রায়;
কূলে আঁটা শ্যাম শৈলগুলি
অতি দূরে দূরে শোভা পায়।
ঊর্দ্ধে অধে যেন দুটি নদী
তরল আলোক জলময়,
মাঝে তার শ্যাম শৈল রাজি—
তট প্রায় যেন মনে হয়।
দেখিতে দেখিতে সেই শোভা
নিদ্রাভরে পড়িনু ঢলিয়া;
মনে হল দীপ্ত স্রোতে ভেসে
কোথা যেন যেতেছি চলিয়া।
পার হয়ে প্রান্তর ভূধর,
পার হয়ে স্বর্গ স্বর্ণ নদী,
পার হয়ে স্বর্ণ রাজ্য শত,
পার হয়ে স্বর্ণ মহোদধি,
উতরিনু আলোক রঞ্জিত
ভূমি শূন্য মহাদেশ কূলে;
দাঁড়াইনু বিস্ময়ে আকুল
মেঘস্তর স্থাপি পাদ মূলে।
সে রাজ্যের তিলমাত্র শোভা
ধরাধামে দেখি নাই কভু,
সঙ্গীত গাহে না কেহ সেথা
সুসঙ্গীতে পূর্ণ দেশ তবু।
নাহি গিরি নাহি তরু লতা
নাহি পাখী নাহি সমীরণ,
সুধু এক তরল আলোকে
ভাসিতেছে সে দিব্য ভুবন।

দাহ শূন্য দীপ্ত আলো রাশি,
অতি স্নিগ্ধ, বাঁধে না নয়ন,
তারি মাঝে নিত্য ফুটে উঠে
নব নব শোভা অগণন।
দাঁড়াইয়া আছি মেঘস্তরে,
ধৌত দেহ সে পুণ্য আলোকে;
নব নব ভাব আসি কত
প্রাণমূলে খেলিছে পুলকে।
হেনকালে আলোক সাগরে
মৃদু মৃদু উঠিল কম্পন,
স্থূল এক জ্যোতির্ম্ময় মেঘ
পুরোভাগে দিল দরশন।
অমনি মধুর-তর গীতি
বিমোহিল শ্রবণযুগল;
অমনি এ স্বার্থপর প্রাণ
বিশ্বপ্রেমে হইল পাগল।
ভাঙ্গি সেই স্থূল জ্যোতিরাশি,
কোলে লয়ে শিশু মনোহর,
শিশু এক বালিকা আসিয়া
দাঁড়াইল ধরি মোর কর।
চিনিয়া সে দেব দেবী ছবি
কাঁদিয়া ধরিনু দগ্ধ বুকে;
ব্যাকুল পরাণে প্রাণ ভরে
চুমিলাম দুটি মুখ সুখে।
কহিলাম, "আমার মতন
আর জন কাঁদে যে ধরায়,
আমা হতে বেশী যার স্নেহ,
প্রাণ যার গড়া মমতায়,
সে যদি আমার মত আজি
এমনি পারিত বুকে নিতে!"
রুদ্ধ কণ্ঠ হইল অমনি
কথাগুলি কহিতে কহিতে।

কহিল বালিকা স্নেহ-ভরে,
"এ নগরে দুঃখ শোক নাই।
এস, মোরা দেখাব নগরী;
এই পথে চল সবে যাই।
অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমি তার
কিছু দূর হয়ে অগ্রসর,
অন্য এক জ্যোতির্ম্ময় দেহ
হেরিলাম অতি মনোহর।
দাঁড়ালেন সম্মুখে আসিয়া
ভাসিয়া জ্যোতির দেহস্তর,
শিরে রাজ-মুকুট পরিয়া
দেবরূপী পুরুষ প্রবর।
ভক্তি ভরে পদতলে পড়ি
যাচিলাম পুণ্য আশীর্ব্বাদ;
হাত ধরি তুলিয়া আমারে
কহিলেন "আজি কি আহ্লাদ!
"আঁধারে ভারত ছিল ভরা
ব্রহ্ম নাম ছিল লুপ্তপ্রায়
"নগরে নগরে আজি তথা
নর নারী ব্রহ্মনাম গায়।
"ঋষির তপস্যাক্ষেত্রে আসি
খ্রীষ্ট শিষ্য কত ইংরাজ,
"শিখাইত নর-পূজাবিধি,
স্থাপি সেথা খ্রীষ্টান সমাজ।
"বরং প্রতিমা পূজা ভাল,
নরপূজা মহাপাপময়;
"সেই পাপ হেরি তিরোহিত
প্রাণ ভরি গাই ব্রহ্মজয়।
"ভারতের অশেষ দুর্গতি
নেহারিয়া ব্যথিত অন্তরে,
"গিয়াছিনু কহিতে জানিম
সেই কথা ইংরাজ নগরে।
"সাধ ছিল, সেথা হতে ফিরে
স্বদেশের সেবিব চরণ!
"কিন্তু ইচ্ছা বিশ্ব নিয়ন্তার,
সেই দেশে হইল মরণ!
"যে কাজে একেলা ছিনু আমি,
সেই কার্য্য করিতে সাধন,
"—প্রসন্ন ভারত ভাগ্য বটে—
জনমিল বীর কত জন।"
"হে রাজন কোথা তাঁরা সবে?
একবার হেরিব নয়নে!
"এ দেশে কি এসেছেন কেহ?
কিম্বা সবে আছেন জীবনে?"
শুনি কথা কহিল বালিকা
আবার ধরিয়া মোর কর,
"জীবন মরণ কথা আমি
কহিতেছি হও অগ্রসর;
"ইহপরে প্রভেদ কোথায়?
আজি কালি একসূত্রে বাঁধা;
"একি রাজ্যে সবে করি বাস
জন্ম মৃত্যু নয়নের ধাঁধা!
"বিশেষ ব্রহ্মের নামে যারা
সমর্পণ করে মন প্রাণ,
"একি জ্যোতি রাজ্যে তারা সবে
করে বাস, নাহি ব্যবধান।
"ওই হের জ্যোতি লোকে তাঁরে,
যাঁরে মনে করগো জীবিত।"
হেরিলাম দেবেন্দ্র মূরতি
ধ্যানে মগ্ন; হইনু বিস্মিত!
তার পর আলোক নগরে
ঘুরে সবে করিনু ভ্রমণ;
বালিকা দেখাল, এক যোগী,
ব্রহ্মানন্দে আনন্দে মগন!
বহুদিন পূর্ব্বে হেরেছিনু,
চিনিলাম কে সে যোগীবর;
সেই হাসি প্রসন্ন অধরে
এবে বটে অধিক সুন্দর;

সেই সুগৌরাঙ্গ তনুখানি
জ্যোতি ভরে অধিক উজ্জল,
মধু কণ্ঠে সেই "মা" "মা" ধ্বনি
শুনি কর্ণ হইল শীতল।
বসিলাম তাঁর পদতলে;
পরশিয়া সে চারু চরণ
কহিলাম, "আজি একবার
তত্ত্বকথা করাও শ্রবণ।"
সুধাস্রোত সুকণ্ঠে ঝরিল,
কহিলেন, "কি শুনিবে আর?
"হেথা নাই ভেদ কোলাহল
প্রেমে বাঁধা সবি হেথাকার।
"কূট তর্ক কিছু হেথা নাই,
তত্ত্ব-যুদ্ধ সুধুই ভরম;
"ব্রহ্ম ভক্তি সর্ব্ব ধর্ম্ম সার,
এই নববিধান চরম।"
হেন কালে হেরিনু অদূরে
আরো দুই মূর্ত্তি মনোহর,
জ্ঞানেতে শঙ্কর দুই জন,
দুজনাই দয়ার সাগর।
এক জন ডাকিলেন মোরে
পরিচিত মধুর বচনে;
ছুটে গিয়ে প্রণামি অমনি
সুধাইনু, "ছিনু কি স্মরণে!"
তপস্যাবিশীর্ণ তাঁর তনু
হেরিলাম জ্ঞানপুষ্ট অতি;
আছে মাত্র কালীকৃষ্ণ নাম,
দেহ ভরি সুধু খেলে জ্যোতি।
আর জন পারশে তাঁহার;
পর দুঃখে এখনো বিহ্বল;
বিধবার দুঃখ-অশ্রুহারে
সুশোভিত চরণ যুগল।
পরশিয়া সে দেব চরণ,
প্রাণ মোর পূরিল উল্লাসে;
অনিমিক্‌ রহিনু চাহিয়া,
শিশু দুটি স্থাপি বক্ষ পাশে।
হেরিতে হেরিতে মেঘস্তরে
খেলাইল চারু ইন্দ্রধনু;
দেখিলাম বিস্মিত নয়নে,
বসিয়া আছেন রামতনু!
জীবনে মরণে নাহি ভেদ,
ভাবিতেছি হইয়া স্তম্ভিত,
অমনি ভাঙ্গিল নিদ্রা মম!
কোথা দেশ আলোক রঞ্জিত?

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

স্বর্গীয় মহাত্মা কিশোরীলাল রায়।

"Some mute inglorious Milton here may rest
Some Cromwel guiltless of his country's blood."

সংসার-অটবীর এককোণে নীরবে এক একটী কুসুম ফুটিয়া থাকে, যাহা রাজো-দ্যানে থাকিলে অতুল শোভা বিকীর্ণ করিত, কিন্তু স্থান ও অবস্থা দোষে আপনাতে আপনি লুক্কায়িত, অনাঘ্রাত, অনাদৃত ও অস্পৃষ্ট। স্বার্থপর ক্ষুদ্রাশয় জগৎ! যাহারা শূন্যগর্ভ, গর্ব্বস্ফারিত, ও আত্ম-গুণ-ঘোষণা-তৎপর, তুমি তাহাদের জন্য যশের জয়ঢক্কা নিনাদিত কর, আর যাঁহারা প্রতিভা-পূর্ণ, সচ্চরিত্র, স্বার্থত্যাগী, যশাকাঙ্ক্ষা যাহাদের ধর্ম্মধন বিসর্জ্জনে সমর্থ নয়, আত্মাভিমান, অলীক গর্ব্ব, জাঁকাল বিজ্ঞাপন যাঁহাদের গুণ ঘোষণায় নিযুক্ত হয় না, তাঁহারাই তোমার নিকট তুচ্ছ ও বিড়ম্বিত।

আজি আমি এই শ্রেণীর এক জনের নাম করিব, যাঁহার অন্তর্দ্ধানে সমগ্র উত্তর বঙ্গের সাহিত্য-গগন আজি নিষ্প্রভ, বগুড়া আজি অন্ধকারময়। ইনি রাজা, জমিদার অথবা অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট উপাধিধারী নহেন। যে যে গুণ থাকিলে মানব—মানব নামের উপযুক্ত, যে গুণ থাকিলে মানব ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, যে গুণ থাকিলে মানব বিদ্বজ্জন সমাজে সম্মানিত, ইনি সেই সমস্তগুণ সম্পন্ন। কিন্তু দুঃখ এই, জগৎ তাঁহাকে চিনিল না। তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়া সংবাদ পত্রের প্রশংসা লাভ করিল, কিন্তু সাধারণে তাহার আদর করিল না। এ অধম বঙ্গদেশের কথা কি বলিব, যেখানে কবি শিরোমণি মহাত্মা মধুসূদন দাতব্য-চিকিৎসালয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন,আর যে দেশে সচিত্র বিদ্যা-সুন্দর-প্রকাশক মহাপুরুষ মধ্যে গণ্য, সে দেশের কথা স্বতন্ত্র।

বগুড়ার কবি, দার্শনিক, ভক্ত, সাধক, যোগী কিশোরীলাল আজ ইহলোকে নাই। যাঁহার প্রণীত "Free enquiry after truth" এবং "Essay on Happiness" ইউরোপের মনীষীগণেরও হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, যাঁহার প্রণীত দেহতত্ত্ব গভীর কবিত্ব ও গবেষণা পূর্ণ বলিয়া সুবিখ্যাত, সর্ব্বোপরি যাঁহার প্রণীত মনোহরণকারী সঙ্গীত ভক্ত চিত্ত বিনোদন এবং আজও কর্ণে মধুর ধারা বর্ষণ করিতেছে, তিনি আজ নিষ্ঠুর নিয়তির চক্রে অপূর্ণ বয়সে ইহজগৎ হইতে তিরোহিত হইয়াছেন। সে সরল, সৌম্য, উদার মূর্ত্তি আর দেখিব না। যে গভীর গবেষণা, সে চিন্তাশীলতা ও জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য আর ইহলোকে দেখিব না। সে ভক্তি ও সাধুতার প্রতিমূর্ত্তি আর এজগতে পাইব না।

১২৪৬ সালে কিশোরীলাল বগুড়ায় সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা পরম বৈষ্ণব, সুতরাং শৈশব হইতেই তাঁহার মন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিল। শৈশবে পিতৃহীন হওয়াতে তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি কতক কতক বিনষ্ট হইয়াছিল। এবং ইঁহার পূর্ণ শিক্ষাও হইতে পারে নাই। কিন্তু সে অভাব তাঁহার অধ্যয়নশীলতা কর্ত্তৃক দূর হইয়াছিল। তাঁহার "Free enquiry after Truth" প্রকাশিত হইলে বগুড়ার সেই সময়ের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া হেডক্লার্কের শূন্য পদ প্রদান করেন, এবং এরূপ আশা দেন যে, কালে তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদ পর্য্যন্ত প্রদান করিবেন। কিন্তু সাহিত্য-সেবক, ধর্ম্মপিপাসু কিশোরীলালের কেরাণীগিরি কার্য্য মনঃপুত হইল না, তিনি বলিলেন, আমাকে শিক্ষকতা পদ প্রদান করুন। তদনুসারে উক্ত সাহেব তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের একটী শিক্ষকতা কার্য্য প্রদান করেন। পরে কাকিনিয়ার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী তাঁহার পুত্রের শিক্ষক ও অভিভাবক পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন, এবং তথাকার মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদ প্রদান করেন। কয়েক বৎসর ওখানে থাকিয়া পরে কিশোরীলাল সামান্য পেন্সন্ লইয়া বাড়ী আইসেন।

শেষবয়সে কিশোরীবাবু দারিদ্র্যের কঠোর হস্তে নিষ্পেষিত হন। তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র অকালে মানবলীলা সম্বরণ

করায় এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সকল দিকে দৃষ্টি করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার উদার প্রশস্ত হৃদয়কে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি সময়ে সময়ে জগতের অগুণগ্রাহীতা ও সাধুতার অনাদর দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেন। যাহারা বোধোদয়ের অর্থপুস্তক ও মানসাঙ্কের সুলভ টীকা প্রণয়ন করে, তাহারা সুখে কাল যাপন করে, আর যাহারা তাঁহার ন্যায় দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গভীর গবেষণা-পূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহারা জগতে অনাদৃত, ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। কি দুঃখের বিষয়! এমন কি, সময়ে সময়ে সংসারের ভাবনায় তাঁহার অধ্যয়ন ও পুস্তক প্রণয়নে পর্য্যন্ত বিঘ্ন হইত। আমরা তাঁহার ক্লেশ ও অশান্তি দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। কিন্তু সাধ্য ছিলনা যে সে অভাব দূর করিতে পারি।

তাঁহার সাধু চরিত্র সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিত, তাঁহার বাল্য বন্ধুগণের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি কোন দিন তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারেন। তিনি নব্য সম্প্রদায়ের চরিত্রহীনতা ও ঈশ্বর নিষ্ঠার অভাব দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। লোকের সহিত অধিক মিশিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু যাঁহারা একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তাঁহারা তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞান, চিন্তাশীলতা, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই অসচ্ছল অবস্থার মধ্যেও তিনি নিয়মিত ভাবে সংবাদ পত্র গ্রহণ করিতেন। কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সকল বিষয়েই তাঁহার ভূয়োদর্শন ছিল।

লেখকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ হইল, তিনি অনেক দিন কিশোরী লালের সহিত গভীর তত্ত্বালাপে অতুল সুখসম্ভোগ করিয়াছেন। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সে দিন দুইবার দাস্ত ও বমনের পরই তাঁহার অবসাদ অবস্থা উপস্থিত হইল, সেই সময়ে আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম, তখন তিনি আমাকে তাঁহার তান্ত্রিক অভিধান প্রকাশের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন এবং এই কয়েকটী সার কথা বলিলেন,—"Monotheism has triumphed but the social problem is yet to be solved." একেশ্বরবাদ জয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু সামাজিক প্রহেলিকার এখনও মীমাংসা হয় নাই। মা জগন্ময়ী এখানে আছেন, এবং আপনি আধ্যাত্মিক ভ্রাতা উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি এখানে ও সাধু ভ্রাতাগণ পরলোকে আছেন, মা জগন্ময়ী সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। Keshub Babu was a great observer of human nature. কেশব বাবু মানব চরিত্রের গভীর তত্ত্বদর্শী ছিলেন। ইহারা সব হরিনামের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আপনাকে দেখিলে মা জগন্ময়ীর কথা মনে হয়। তিনিই ভক্ত, যাঁহাকে দেখিলে ভগবানের কথা স্মরণ হয়। আপনার প্রার্থনা অতি সরল ও অকপট।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন, যাহা তিনি তাঁহার ভালবাসার জন্যই বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তদুপযুক্ত নই, এজন্য তাহা লিখিলাম না। পরে তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি হইলে আবার বলিলেন, "মা জগন্ময়ী আমাকে সত্যই আহ্বান করিয়াছেন।" পরে সে কয়েক ঘণ্টা জীবিত ছিলেন, অধিক কথা বলিতে পারেন নাই। একবার বলিয়াছিলেন "To live is to suffer" বাঁচিলেই কষ্ট পাইতে হয়। ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার অবসন্ন দেহ হইতে জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইতে লাগিল, অবশেষে হাস্যমুখে তাঁহার অমর অপার্থিব আত্মা দেহরূপ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া অনন্ত

রাজ্যে উড়িয়া গেল, তাঁহার পার্থিব দেহ মুষ্টিমেয় ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। আর আমরা সে পবিত্র আত্মা ইহলোকে দেখিব না। আর মাঘোৎসব সময়ে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান সম্বলিত সুমধুর উপদেশ শ্রবণ করিব না!

কিশোরীলাল শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের সহপাঠী ছিলেন। পণ্ডিতবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে নাকি তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সূত্রে বিশ্বাস করেন। দর্শন শাস্ত্রে ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তৎপ্রণীত তান্ত্রিক অভিধান পড়িলেই জানা যাইবে, হিন্দুশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কিরূপ পাণ্ডিত্য ছিল। গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মধ্যে কিশোরী বাবুর স্থান কোথায়? আমি সমালোচক নহি, সুতরাং তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, ঋষি রাজনারায়ণ ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সংমিশ্রণ তাঁহাতে ছিল। এবং, তৎপ্রণীত মনোহরশায়ী সঙ্গীত বঙ্গ সাহিত্যে অতুল, এ বিষয়ে তিনি চিরজীব শর্ম্মার সহিত আসন গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাতে বৈষ্ণব কবিদের ভক্তিভাব মিশ্রিত, ভাষার লালিত্য সহকারে মার্জ্জিত রুচি সংযোজিত হইয়াছে। যখন তিনি নিজে ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া গান করিতেন, সে মধুর শোভা আর বিস্মৃত হইব না।

কিশোরীলাল তাঁহার সংসার-লীলা সমাপন করিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার কয়েকটী শিশু সন্তান ও বিধবা স্ত্রী ও ভ্রাতৃদ্বয় এবং অসংখ্যবন্ধু তাঁহার জন্য অশ্রু মোচন করিতেছেন। আর আমরা এই ইহকাল ও পরকালের সংযোগ স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সেই ইহকাল ও পরকালের সখা চিরসুহৃদ দয়াময় তাঁহার সংসার তাপে তপ্ত আত্মাকে বিমল শান্তি ও অমৃত প্রদানে সুখী করুন।*

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাসগুপ্ত।

অদৃষ্ট। (৮)

এই বিশ্বের যাবতীয় কার্য্য এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে সম্পন্ন হইতেছে—আকাশের গ্রহ নক্ষত্র হইতে মর্ত্তের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই এই শক্তি আছে। পদার্থ মাত্রই এই শক্তির অধীন, এবং এই শক্তির বলেই এক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের যোগ ও বিয়োগ ঘটিতেছে। আমাদের শক্তি আমরা যেমন অনুভব করি, সেই সঙ্গে আমাদের উপর বহুদূরস্থিত গগন-বিহারী গ্রহ নক্ষত্রগণেরও যে একটা শক্তি আছে, তাহা আমরা

* নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট এই মহাত্মা সুপরিচিত। তাঁহার চিন্তাপূর্ণ পবিত্র প্রবন্ধ সময়ে সময়ে নব্যভারতের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিয়াছে। এক দিকে প্রতিভা, আর এক দিকে পাণ্ডিত্য, এক দিকে গাম্ভীর্য্য, আর এক দিকে চিন্তাশীলতা,—এক দিকে ভক্তিবিশ্বাস, আর এক দিকে সচ্চরিত্রতার সমাবেশে এই মহাত্মা উত্তর বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বগুড়া তাঁহার শোকে কাতর, আমরাও সেই শোকোচ্ছ্বাসে একবিন্দু তপ্ত অশ্রু মিশাইতেছি। বিধাতা এই মহাত্মার অমরাত্মার কল্যাণ করুন। ন, স।

চেষ্টা করিলেই অনায়াসে অনুভব করিতে পারি। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহার উপর সূর্য্যের শক্তি আছে, সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে এই সসাগরা পৃথিবী শূন্যমার্গে থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট গতিতে সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে এবং পৃথিবীর গতি অনুসারে দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন হইতেছে এবং ঋতু ছয়টী পর পর যাওয়া আসা করিতেছে। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হইতেছে, পৃথিবী বক্ষে তৃণ শস্যাদি জন্ম গ্রহণ করিতেছে বা শুকাইয়া যাইতেছে, বৃহস্পতির সঞ্চার হইলে বারি বর্ষণ হইতেছে। পৃথিবী এবং তদুপরিস্থিত চেতন বা অচেতন পদার্থের উপর গ্রহ নক্ষত্রাদির আধিপত্য থাকিলে মনুষ্যের উপরও তাহাদের আধিপত্য থাকা অসম্ভব নয়।

আমাদের শরীরের উপর চন্দ্র সূর্য্যের আধিপত্য আছে, তাহা আমরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে উপলব্ধি করিয়া থাকি—পক্ষান্তে প্রায় অনেক লোকেরই শরীর অসুস্থ হয়; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ এবং মঙ্গল বুধাদিও গ্রহ—চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা অন্য কোন গ্রহেরই বল কম নয়। আমাদের শরীরের উপর ৯টী গ্রহ এবং ২৭টী নক্ষত্র সকলেরই যে আধিপত্য আছে, জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিলে তাহা জানা যায়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে এখন আর লোকের তত বিশ্বাস নাই, কিন্তু এক দিন ছিল, এক দিন পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে এ শাস্ত্রের আলোচনা ছিল, কালে উঠিয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসাও লোপ পাইতে বসিয়াছে, জ্যোতিষের গণনা এখন আর কেহ বিশ্বাস করেন না, আর শতাধিক বৎসর পরে একশত খানা গাছড়া একত্র করিয়া একটী ঔষধ প্রস্তুত করিলে তাহাতে যে একটী রোগ আরোগ্য হয়, ইহাও হয়ত কেহ বিশ্বাস করিবেন না। জ্যোতিষ মতে গণনা এবং আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা, এই দুই বহুকালের দর্শনের ফল—একশত খানা দ্রব্য একত্র করিয়া যে ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহাতে প্রত্যেক দ্রব্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণ পরীক্ষা করিতে হইয়াছে এবং এক দুই করিয়া এই একশত খানি দ্রব্য পর পর যোগ করিয়া তাহাতে যে রাসায়নিক গুণ হয়, তাহাও পরীক্ষা করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই রকম শত শত ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে, বিশেষ বিশেষ একশত খানি দ্রব্য যোগ করিলে যে রোগ বিশেষের এক একটী ঔষধ প্রস্তুত হইবে, এ কথা কে বলিয়া দিল এবং কত দিনেই বা এই পরীক্ষা শেষ হইল, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা হয় না।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম সময়ের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থিতি নিরূপণ করত তাহাদের বল এবং ফলাফল পরীক্ষা করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যোতিষ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কত কাল ধরিয়া কত লোকের যে জীবন পরীক্ষা করিতে হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু জ্যোতিষ যে সত্য নয়, এ কথা কে বলিতে পারে? ভৃগু, পরাশর, গর্গ, বশিষ্ট প্রভৃতি চিরস্মরণীয় মহর্ষিগণ এবং টলেমি, আরিষ্টটল, বেকন, কেপলার প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত দার্শনিকগণ যে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলনে জীবনপাত করিয়া যাহার ফল প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই সর্ব্বজন পূজিত, সর্ব্বজন-আদৃত জ্যোতিষ

শাস্ত্রকে এক্ষণে মিথ্যা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া, তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি জীবের কখনই কর্ত্তব্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা জ্যোতিষের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, জ্যোতিষের ফল সমস্তই মিথ্যা নয়, এখনও অনেক মিলে। শত করা যদি দশটা গণনাও মিল হয়, তাহা হইলে সে দশটাই বা মিলে কেন, তাহার অবশ্যই কোন কারণ আছে। দশটা ফল যখন মিলিতেছে, তখন জ্যোতিষের মধ্যে অবশ্যই কিছু না কিছু সত্য আছে, জ্যোতিষে যে কিছু সত্য আছে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করিয়া রোগ আরোগ্য না হইলে এখনও লোকে আয়ুর্ব্বেদের উপর দোষারোপ করিতে সাহস করে নাই, দোষ দেয় চিকিৎসকের অথবা তাহার ব্যবস্থার উপর, কিন্তু দেশের যে প্রকার গতি দাঁড়াইতেছে, তাহাতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও যে এক দিন উপহাসের সামগ্রী হইবে, শতাধিক দ্রব্য একত্র করিয়া যে একটী ঔষধ প্রস্তুত হয়, এ কথাও অসম্ভব মনে করিয়া এক দিন যে লোকে অবিশ্বাস করিবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থিতি অনুসারে মর্ত্ত্যের মনুষ্য-জীবনের গতি নির্ণয় হইতে পারে, এ কথা এখনকার দিনে অনেকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এক দিন তোমার আমার মত লোকের নয়, বড় ২ লোকের মূল্যবান জীবনের গতি নির্ণয় হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তবে যদি ঠিকুজীকুষ্ঠির ফলাফল মিল না হয়, সে দোষ জ্যোতিষশাস্ত্রের নয়, সে দোষ গণকের অথবা গণনার।

জ্যোতিষ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে অদৃষ্টসম্বন্ধে আর কোন গোল থাকে না, এবং অদৃষ্টের সহিত পুরুষকারকেও আর বিবাদ করিতে হয় না; এজন্য জ্যোতিষ সম্বন্ধে আর দুই এক কথা বলিয়া আমরা বক্তব্য শেষ করিব। জ্যোতিষে আমার জ্ঞান নাই, তবে মোটামুটি দু এক কথা যাহা জানি, তদ্বারা উদাহরণ দিয়া জ্যোতিষ যে উড়াইয়া দেওয়ার সামগ্রী নহে, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব, উদাহরণ স্থলে আমরা মহা প্রভু চৈতন্য দেবকে আনিতেছি, তাঁহার জন্ম সময় যদিও অনেকের জানা আছে, তত্রাচ তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে চির-প্রচলিত শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

চৌদ্দশত সাত শকে মাস সে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌর চন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
কৃষ্ণ হরি নামে ভবে ভাসে ত্রিভুবন।

চৈতন্যচরিতামৃত

চৈতন্য দেবের জন্ম সময়ে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থিতি নিম্নে দেখাইতেছি।
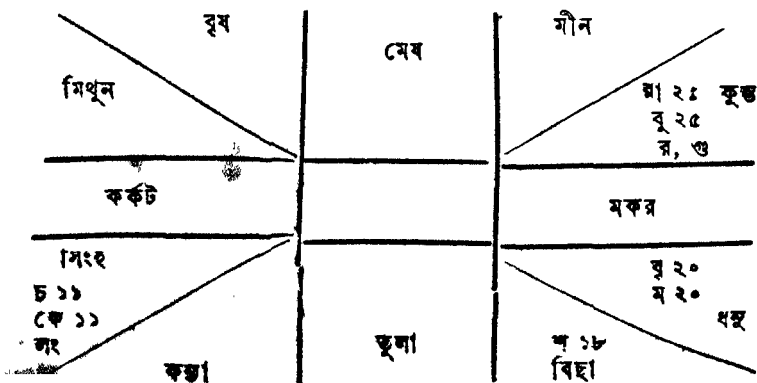
উক্ত জন্ম পত্রিকা দৃষ্টে জানা যায়, সিংহ রাশিতে এবং সিংহ লগ্নে মহা প্রভুর জন্ম হইয়াছিল ; মঙ্গল ও বৃহস্পতি এক রাশিতে ছিল, এবং সপ্তম স্থানে রবি, শুক্র, বুধ, ও রাহু এই চারি গ্রহের একত্র যোগ হইয়াছিল।

সিংহ রাশিতে জন্ম হইলে জাতক ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান, বাগ্মী, তেজস্বী, শ্রুতিধর, রাজদ্বারে পূজনীয়, এবং দেবগুরু পূজানুরক্ত হইয়া থাকেন।

সিংহ লগ্নে জন্ম হইলে জাতক সুবোধ, সাধু, গম্ভীর প্রকৃতি, পর্ব্বত ও বন গমন প্রিয়, দৃঢ় সুহৃৎ, আহ্লাদিত, দুঃখ-সহিষ্ণু, বিখ্যাত এবং সাধুগণ তাঁহার নিকট কুণ্ঠিত হইয়া থাকে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতি এক রাশিস্থ হইলে জাতক ভাগ্যবান, বুদ্ধিমান, সাহসী, কার্য্যক্ষম ও শাস্ত্রজ্ঞ হয়। যে অবস্থায় সে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, সে কীর্ত্তিমান, ন্যায়পরায়ণ, উচ্চমতিসম্পন্ন, ও ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে—এই দুই গ্রহ পরস্পরের সম সপ্তকে থাকিলেও উক্ত রূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। দশরথ তনয় রামচন্দ্রের ও শঙ্করাচার্য্যের মঙ্গল ও বৃহস্পতি সমসপ্তকে ছিল।

রবির সহিত অন্যতিনটী শুভাশুভ গ্রহের যোগ হইলে, জাতক খ্যাতাপন্ন ও লোক-পূজিত হয়, এবং ঐ চতুর্গ্রহের মধ্যে শুক্র থাকিলে সে ব্যক্তি নীতিজ্ঞ, পরোপকারী ও পরম ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

কেন্দ্রে চতুর্গ্রহের যোগ হইলে জাতকের সন্ন্যাস যোগ ঘটে। কেশবচন্দ্র সেনের লগ্নে রবি, বুধ, শুক্র ও শনি ছিল।

লগ্ন ও লগ্ন হইতে সপ্তম, এ দুইটীই কেন্দ্রস্থান।

এক্ষণে পাঠক, উপরে যে সকল ফলের কথা বলিলাম, মহা প্রভুর জীবনে সে সকল ফল ফলিয়াছিল কি না, মিলাইয়া দেখিবেন, এবং সেই সঙ্গে কেশব বাবুর লগ্নে রবির সহিত অন্য তিন গ্রহের যোগ হওয়ায় ও সেই তিন গ্রহের মধ্যে শুক্র থাকায় তিনি কি প্রকার ধার্ম্মিক, খ্যাতাপন্ন ও লোক-পূজিত হইয়া ছিলেন, তাহাও বিচার করিবেন।

সপ্তম পত্নি স্থান—সপ্তমে রবি থাকিলে স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং স্ত্রী দুর্ভাগা হয় ; এবং সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে স্ত্রীর নিমিত্ত সন্তপ্ত-হৃদয় হইতে হয়। মহাপ্রভুর সপ্তম স্থানে রবি এবং রাম চন্দ্রের সপ্তমে মঙ্গল ছিল। বলা বাহুল্য যে, মহাপ্রভুর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়, অপরা স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাগ্যে পতি সহবাস-জনিত সুখ সম্ভোগ কখন ঘটে নাই, এবং রাম চন্দ্রকে সীতার জন্য সন্তপ্ত হইতে হইয়াছিল।

সপ্তম গ্রহাধিপতি কেন্দ্রে অবস্থিতি করিলে এবং তাহার প্রতি শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, স্ত্রী পতিব্রতা হয়।

"কলত্রাধিপতৌ কেন্দ্রে শুভগ্রহ নিরীক্ষিতে শুভযুক্তে কলত্রেবা ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা।" সর্ব্বার্থচিন্তামণি

মহাপ্রভুর এবং রামচন্দ্রের সপ্তমাধিপতি শনি ও চতুর্থ স্থান কেন্দ্রে ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া এবং সীতা উভয়েই পতিব্রতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

লগ্নাধিপতি দশমে এবং দশমাধিপতি শুভ গ্রহ যুক্ত হইয়া কেন্দ্রে থাকিলে কর্ম্ম যোগ হয়, কেশব চন্দ্র সেনের এই যোগ ঘটিয়াছিল।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের উপর গ্রহগণ যে কি প্রকার আধিপত্য করিতেছে, তাহা এই দৃষ্টান্তেই

দ্বারাই বুঝা যাইতেছে। নিমাই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন শুনিয়া, এক দিকে তাঁহার মা আসিয়া নিমাইয়ের দুখানি হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কথা বলিলেন, কত মতে বুঝাইলেন, এক্লা ঘরে এই শেষ দশায় তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন, অন্য দিকে যুবতী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দুটী বাহু দ্বারা নিমাইয়ের গলদেশ বেষ্টন করিয়া চক্ষের জলে তার বক্ষ স্থল ভাসাইয়া দিলেন, তাঁর প্রাণাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা কি হইবে, নিমাইকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; নিমাইয়ের মুখে কথা নাই, তাঁর কেন্দ্রে চতুর্গ্রহের যোগ হইয়াছিল, একটী গ্রহের বল অতিক্রম করিবার মনুষ্যের ক্ষমতা নাই, তাতে চারিটী গ্রহ—রবি, শুক্র, বুধ ও রাহু কেন্দ্রে বসিয়া নিমাইকে টানিতেছিল, তিনি স্নেহের ডোর ছিঁড়িয়া প্রকৃত ডোর-কৌপিন পরিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রাবণ ছদ্মবেশে আসিয়া সীতাকে হরণ করিল। রামচন্দ্র কতই না মনোবেদনা সহ্য করিয়াছিলেন; রাবণকে বধ করতঃ সীতাকে উদ্ধার করিয়া বাড়ী আনিলেন, ইচ্ছা, সীতার সঙ্গে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন, কিন্তু তাঁর সপ্তম গৃহে রবি থাকায় স্ত্রী সহবাসজনিত সুখ সম্ভোগ তাঁর ভাগ্যে ছিল না, এজন্য লোকের কথায় নিতান্ত বাধ্য হইয়া সীতাকে বনে দিলেন। সীতার দেহ মন যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক ছিল, তাহা রামচন্দ্র জানিতেন, এজন্য অকারণে সীতাকে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় বনে দিয়া রামচন্দ্রের মনস্তাপের সীমা ছিল না।

শুভাশুভ গ্রহের বলে এবং মহাপ্রভু ও রামচন্দ্রের উপর সেই সকল গ্রহের যে আধিপত্য ছিল, তাহারই ফলে যদি তাঁহাদের একজন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ ও অপরে স্ত্রীকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অদৃষ্টের সহিত পুরুষকারের বিবাদ এই খানেই শেষ হয়। মহাপ্রভু এবং রামচন্দ্র উভয়েই যে প্রকার করুণ-হৃদয় ছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের মা'র বা স্ত্রীর একফোটা চক্ষের জল শত পুরুষকারের বল হইতেও যে অধিক ক্ষমতা ধরিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র যখন প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণকে কাঁদাইয়া সীতাকে বনে পাঠাইয়া দেন, তখন তাঁর প্রাণও কাঁদিয়াছিল। তুমি যাহাকে পুরুষকার বল, সেই মহাপুরুষ আসিয়া রামচন্দ্রকেও নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সপ্তমস্থ মঙ্গলেরই জয় হইয়াছিল। পুরুষকার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র যদি নিয়তির লিখন অন্যথা করিতে না পারিয়া থাকেন, তাঁর পুরুষার্থ যদি মঙ্গল গ্রহের নিকট পরাভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমি কে?

সকল গ্রহেরই নির্দ্দিষ্ট গতি আছে এবং গ্রহগণ মানব জীবনের উপর যে আধিপত্য করেন, তাহারও নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। এই আধিপত্য করার নাম ভোগ এবং যে গ্রহ যতদিন আধিপত্য করেন, তাহার নাম দশা। এক গ্রহের ভোগাধিকারের মধ্যে অন্য গ্রহের উদয় হইলে, রবির আধিপত্য কালে মঙ্গলের ভোগ আরম্ভ হইলে, তাহাকে মঙ্গলের অন্তর্দশা বলে এবং এক গ্রহের অন্তর্দশায় অন্য গ্রহ উপস্থিত হইলে, যথা রবির দশায় এবং মঙ্গলের অন্তর্দশায় বুধ দেখা দিলে, তাহাকে বুধের প্রত্যন্তর দশা বলে। হিন্দু

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া কোন্ গ্রহের কতদশা, কত অন্তর্দশা এবং কত প্রত্যন্তর্দশা,তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রহগণ নির্দ্দিষ্ট গতিতে এক রাশির পর অন্য রাশিতে উদয় হইতেছে। সওয়া দুই নক্ষত্র এক একটী রাশি কল্পনা করিয়া ২৭ নক্ষত্রকে মেষ:বৃষাদি বারটী রাশিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক রাশি হইতে জাতকের এক প্রকার ভাবের বিচার হইয়া থাকে; প্রথম রাশি হইতে তনুভাব অর্থাৎ জাতকের আকৃতি রূপ, বর্ণ, শারীরিক বল, স্বাস্থ্য ইত্যাদি, দ্বিতীয় রাশি হইতে ধন, তৃতীয় রাশি হইতে সহোদর, এইরূপ পর ২ বন্ধু, পুত্র, রিপু, জায়া, নিধন, ধর্ম্ম,কর্ম্ম, আয়, ব্যয়, এই দ্বাদশ ভাবের বিচার দ্বাদশ রাশি হইতে করা যায়। গ্রহগনই রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে; শুভাশুভ গ্রহের গতি এবং স্থিতি অনুসারে মনুষ্য জীবনে সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ হইতেছে।

শুভ বা অশুভ ভাবের রাশিতে শুভাশুভ গ্রহের উদয় হইলে, কি শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, ফল বেশী কম হয় এবং কখন কোন ফল এক কালে নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই জ্যোতিষের মূল সূত্র। এই সূত্র অবলম্বন করতঃ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন এবং গ্রহের দশা ধরিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জবীনে তাহার নিজের এবং পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের কোন্ দিন কি ঘটিবে,কে কবে জন্মিবে, কে মরিবে,কে কবে কি কাজ করিবে, সে কাজের কি ফল হইবে এবং কোন্ ফল কত দিন স্থায়ী থাকিবে, কে ধার্ম্মিক এবং অধার্ম্মিক হইবে, আকৃতি প্রকৃতি কাহার কি রকম হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া থাকেন। আজ কাল সকলের কোষ্ঠীর সকল ফল সত্য হয় না, আমি স্বীকার করি; কিন্তু জ্যোতিষের চর্চ্চা বহুকাল হইল লোপ হইয়াছে, এ অবস্থায় অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আজ কালের পণ্ডিতদের গণনা বা বিচার ভুল হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু শতকরা দশটা ফল মিলিলেও তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে,জ্যোতিষে অবশ্যই কিছু না কিছু সত্য আছে। কতক ফল যখন মিলিতেছে, এবং বাকী ফলও মিলিবে বলিয়া জ্যোতিষ যখন এতদূর স্পর্দ্ধা করিতেছে,তখন তোমার আমার কোষ্ঠীতে দুই পাঁচটা ভুল বাহির হইয়াছে বলিয়া এত দিনের পুরাতন শাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া এক বারে উড়াইয়া দিতে পার না।

জ্যোতিষ সত্য হইলে এবং উপরে আমরা যে সকল ফলের কথা বলিলাম, জ্যোতিষের গণনায় তাহা নির্ণয় হইলে, আমাদের পুরুষকার বা স্বাধীনতা কোথায় থাকে? একজনের কোষ্ঠী দৃষ্টে যদি তাহার পিতা পুত্র, শত্রু মিত্র, এবং ভাই ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের জীবন-গতি স্থির করা যায়, তাহা হইলে ত আমরা আমাদের পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী পুরুষের সহিত শত্রু মিত্রের সঙ্গে এক শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া আছি। ছায়াবাজীর পুতুলের ন্যায় আমরা গ্রহ নক্ষত্রাদির দ্বারা প্রতি পদে চালিত হইতেছি। শুভ গ্রহের ফলে সুখ এবং অশুভ গ্রহের ফলে দুঃখভোগ করিতেছি।

মানুষ যে লগ্নে জন্মাইতেছে এবং যাহার গ্রহ যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, সে

তদনুরূপ ফল ভোগ করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ জগতের সমস্ত কার্য্যই এক নৈসর্গিক নিয়মের অধীনে সম্পন্ন হইতেছে। গ্রহগণ স্থির গম্ভীর ভাবে রাশি চক্রপরিভ্রমণ করিতেছে; তাহাদের সঞ্চার অনুসারে, কোথাও সুবৃষ্টি হওয়ায়, লোকে সুখে কালাতিপাত করিতেছে; কোথাও অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি জন্য ক্লেশের এক শেষ হইতেছে। কোথাও ঝড় হইয়া গ্রাম নগর এক কালে উচ্ছন্ন যাইতেছে। গ্রহের ফলে মানুষও কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুস্থ, কেহ কঠিন রোগগ্রস্ত, কেহ খঞ্জ, কেহ কুব্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক আমরা যে সকল দুঃখভোগ করি, তাহার এক মাত্র কারণ কুগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ। ঈশ্বর কোন দেশের জন্য অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ব্যবস্থা করেন না, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অনুসারে ক্লেশ দেওয়ার জন্য ঈশ্বর কাহাকেও বিকলাঙ্গ করিয়া সংসারে পাঠান না; স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির জন্য তাঁর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই! গ্রহদোষে আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে কেহ কেহ দৈব ক্রিয়া করিতে বলেন। দৈব ক্রিয়া অর্থে শান্তি স্বস্ত্যয়ন অথবা গ্রহ দেবতার পূজা। তাঁহাদের মতে কোন গ্রহ দেবতা কুপিত হইয়া থাকিলে দৈবক্রিয়া দ্বারা যদি তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইতে পারে। আজ যদি তোমাকে বাঘে কামড়াইত, তৎপরিবর্ত্তে তোমাকে বিড়াল আঁচড়াইতে পারে—কোন গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কেহ আছেন কি না, জানি না, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব, থাকি মর্ত্ত্যলোকে, আমাদের উপর তাঁহারা রুষ্ট হইবেন কেন, তাহাও বুঝি না। এক খানা শাড়ী বা দু' কাহন কড়ি উৎসর্গ করিয়া স্তব পাঠ করিলে তাঁহারা তুষ্ট হন কি না, তাহাও বলিতে পারি না, তবে শুনিতে পাই, সিদ্ধির ঝুলি হিন্দু শাস্ত্রে শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা আছে, এবং রাম বাবুর ছেলেটীর কোষ্ঠীর ফলে এই মাসে তাহার অপঘাত মৃত্যু ছিল, কিন্তু গ্রহের শান্তি করায় ছেলেটী রক্ষা পাইয়াছে। গণিত শাস্ত্রানুসারে চারিকে চারি দিয়া গুণ করিলে ১৬ হয়, ১৫ হয় না, বা ১৭ হয় না। জ্যোতিষ যদি সত্য হয়, এবং জ্যোতিষের গণনা অনুসারে আজ যদি তোমাকে বাঘে কামড়ায় বা তোমার অপঘাত মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমাকে কখন বিড়ালে আঁচড়াইবে না বা তোমার অপঘাত মৃত্যু কখন নিবারণ হইবে না, নিবারণ হইলে হয় বলিব, তোমার অদৃষ্টে বিড়ালে আঁচড়ানই ছিল, বাঘে কামড়ান বা অপঘাত মৃত্যু যাহা গণনা হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা; না হয় বলিব, জ্যোতিষ মিথ্যা, জ্যোতিষের ফল মিথ্যা—জ্যোতিষের গণনা মিথ্যা। আমাদের বিশ্বাস, জ্যোতিষ কখনও মিথ্যা নয়, তবে গণনা ভুল হইতে পারে, লগ্নের সময় ঠিক হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনে যে দিন যে কাজ করিবে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম ফল পর্য্যন্ত গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে। গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কেহ থাকুন, বা না থাকুন, যদি কেহ কোন দিন তাহাদের পূজা করেন, গণনা দ্বারা তাহা ঠিক হইবে, এবং পূজার পর যে জন্য যে ফলই হউক, তাহাও গণনার দ্বারা জানা যাইবে—তাহা হইলে তোমাকে বাঘে কামড়াইত, পূজার

ফলে বিড়ালে আচড়াইল, এ কথা আর বলিতে পার না। পূজার পর দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়া যদি বলিয়া দিতেন, কাহার অদৃষ্টে কি ছিল এবং তিনি প্রসন্ন হওয়ার জন্যই বা কি হইল, তাহা হইলে আমাদের কোন কথা ছিল না, নচেৎ কেবল ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের কথায় জ্যোতিষের ফল কমাইয়া শান্তি স্বস্ত্যয়নের ফল বিশ্বাস করিতে পারি না।

এক অদৃষ্টের কথায় আমরা অনেক কথা বলিলাম, অপ্রাসঙ্গিক কথাও অনেক বলিলাম, পাঠক ক্ষমা করিবেন। শেষ কথা আমাদের মনে হয়, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবনের সমস্ত ঘটনাই যেন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে ঘটিতেছে—কোন্ লগ্নে জন্ম হইলে, এবং জন্ম কালে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে থাকিলে কি ফল হয়, তাহা যেন দুশ্ছেদ্য নিয়ম সূত্রে বাঁধা আছে। সেই নিয়ম অনুসারে মানুষ আপন আপন লগ্ন এবং গ্রহের বল অনুসারে ফল ভোগ করিতেছে। এক জন বিকলাঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল, তাহার সে দুর্দশা কেন হইল, তাহা তুমি তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা করিতে না পারিয়া, জাতক তাহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অনুসারে খঞ্জ বা কুব্জ হইয়াছে বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাক, কিন্তু কর্ম্মফল বিশ্বাস করিতে আমাদের যে আপত্তি, তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি আমাদের নাই—পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অনুসারে আমরা সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেছি, ইহা আমাদের অনুমান ভিন্ন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ বিষয়ে আমাদের কিছুই নাই; পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই, তৃণ গুচ্ছ হইতে তোমার আমার সকলের উপরই গ্রহ নক্ষত্রের বল আছে এবং সেই অনুসারে কার্য্য হইতেছে। ছায়াযুক্তস্থানে বীজ রোপণ করিলে সে স্থানে সূর্য্যের দৃষ্টি নাই বলিয়া সে বীজ হইতে কখন সতেজ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, তাহা হইলে জরায়ুস্থিত শিশুর প্রতি গ্রহ বিশেষের দৃষ্টি না থাকিলে সে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে অসম্পূর্ণ হইবে, ইহা কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এ অবস্থায় অনুমানের উপর নির্ভর করত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে তুমি অন্ধ হইয়াছ, না বলিয়া, যখন মাতৃগর্ভে তোমার সঞ্চার হইয়াছিল, তৎকালে তোমার চক্ষুর উপর শুভ গ্রহের দৃষ্টি না পড়ায় অথবা অশুভ গ্রহের দৃষ্টি পড়ায়, যে কারণেই হউক, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলে, বোধ হয় পাঠক আমাদিগকে ঘৃণা করিবেন না। জ্যোতিষের ফল যে ভাবে স্থির করা হয়, তাহাতে মানব প্রকৃতির সহিত গ্রহ নক্ষত্রের সম্বন্ধ বিচার করিয়া কর্ম্ম ফল অপেক্ষা জ্যোতিষের ফলই যেন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় এবং বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফল অনুসারে ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ বা কষ্ট দিতেছেন বলিলে, তাঁহাকে নির্গুণ না বলিয়া সগুণ বলিতে হয় এবং তাঁহার দেবত্বের ও ঐশিক ভাবেরও যেন লাঘব করা হয়, পক্ষান্তরে জ্যোতিষের ফল বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরকে যে ভাবেই কেন ভাব না, তাহাতে কিছুই বোধ হয় না।

অদৃষ্টের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে আমাদের এই মনে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা নহে—তাঁর ব্যবস্থা এক; অনাদিকাল হইতে তাঁর স্নেহ ব্যবস্থানুসারে

এক নিয়মে, এক ভাবে কার্য্য হইয়া আসিতেছে, তাহাতে যে দেশের ভাগ্যে যাহা হইবার, এবং যে লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটিবার, তাহাই হইতেছে, তাহাই ঘটিতেছে।

গ্রহগণ কর্ত্তৃক আমরা চালিত হইতেছি, একথা বলিলে কোন কার্য্যের উপরই আর আমাদের দায়িত্ব থাকে না, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের পাপ পুণ্যে বা দেশ বিদেশের উন্নতি পতনে জগতের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। এজগতে ভাল লোক জন্মাইতেছে, এবং তুমি যাহাদের মন্দ লোক বল, তাহারাও জন্ম গ্রহণ করিতেছে। ভাল কাজের ফল ভাল হইতেছে এবং অনেক মন্দ কাজের ফলও ভাল দেখা যাইতেছে; ভাল এবং মন্দ কাজ গড় করিয়া দেখিলে জগতের মঙ্গলই সাধন হইতেছে—মঙ্গলময় পুরুষের মঙ্গলময় ইচ্ছা বুঝিতে পারি, তোমার আমার সে ক্ষমতা নাই। সমাপ্ত।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পরিত্যক্তা।

১

যা ভাবে যা খোঁজে লোকে, আশায় চিন্তায় শোকে,
সুখে হর্ষে পূর্ণ প্রীতি, পায় তা সবাই।
আমারি অদৃষ্ট পোড়া, ছাই ভস্ম আগা-গোড়া
ছত্রভঙ্গ এ জীবনে মেলে না তাহাই।

২

বজ্রনাদ কড় কড়, ঝঞ্চাবাত মহা ঝড়,
রৌদ্র বৃষ্টি শিরে চির রহে না কাহার—
অভিশপ্ত-অভিশাপ, মহাপাপী-মহাপাপ,
লক্‌ লক্‌ হুতাশন, কলঙ্কের ভার।

৩

বিধবা হৃদয় বাঁধে, পুত্র মুখ চেয়ে কাঁদে,
যাবেনাক চিরদিন এমনি কখন—
নিত্য মাগে পদ-ধূলি, নিত্য দেয় পুষ্পাঞ্জলী
দেবতা-চরণে আঁকে সুখের স্বপন।

৪

বন্ধুহীন গৃহহীন, উনমত্ত উদাসীন
অন্ন কষ্ট চিরদিন—কিছু নাই নাই—
পায় অন্ন-পূর্ণ গেহ, অযাচিত প্রীতি স্নেহ,
অনন্ত ধরায় সেও দাঁড়াবার ঠাঁই।

৫

আমারি অদৃষ্ট মন্দ মেলেনাক সে আনন্দ,
প্রলয় গর্জ্জিছে যেন প্রাণে নিরন্তর!
উন্মত্ত বাসনা-স্রোত সদা বহে ওতপ্রোত,
সপ্ত সিন্ধু উথলায় হৃদে ভয়ঙ্কর।

৬

কিছুতে মেটেনা সুখ, কিছুতে ভরে না বুক,
কি অশান্তি, কি অসুখ, একিরে বালাই।
নিত্য প্রাণে যোঝাযুঝি, ভাবে আঁচে বোঝাবুঝি
ভাবনা উজান-স্রোতে ভেসে চলে যাই।

৭

পূরিল না তবু আশ মিটিল না সে পিয়াস
শুধু পথ-প্রতীক্ষায় প্রভাত জীবন।
শুধু চিন্তা, শুধু শ্রম, অযতন প্রাণপণ,
শুধু কাঁদা, শুধু চাওয়া, সজল নয়ন।

৮

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষযুগ পায় পায়,
বিফল বাসনা লয়ে, কাটে বিভাবরী,
অঞ্চলে মুছিয়া জল আজো বুকে ধরি বল,
সুমঙ্গলে অমঙ্গল আশঙ্কায় মরি।

৯

পরিপূর্ণ পরিষ্কার কোথা প্রেম-পারাবার!
হৃদয়-দেবতা কোথা দাও দরশন!
জীবনে মরণাধিক, তবু আঁখি অনিমিক;
হুহু করে প্রাণ মন মানে না বারণ।

১০

পাষাণে বেঁধেছি বুক— লুকাইব পাপ মুখ;
এখনো শুনিতে শেষ রয়েছে এ প্রাণ।
পাব কি না পাব দেখা, সে মোর অদৃষ্ট-লেখা,
আত্ম হত্যা মহাপাপে কর পরিত্রাণ।

শ্রীচুনিলাল গুপ্ত।

মানব-দেবতা বা রামমোহন।*

যে সকল মহাত্মার আবির্ভাবে পৃথিবীর দেশ ও সমাজের দূষিত বায়ু আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মহাত্মা রাজা রামমোহন তন্মধ্যে একজন। বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের কারণ প্রধানতঃ তিন ব্যক্তি—আমেরিকার থিওডোর পার্কার, ইতালীর ম্যাট্‌সিনি এবং ভারতের রামমোহন। ইঁহারা তিনজনই মানবদেহে ঐশী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, তিনজন পৃথিবীর তিন প্রধান ভূভাগে অবতীর্ণ হইয়া মানব সমাজের উদ্ধারের জন্য জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবনের অসাধারণত্বের কথা ভাবিলে আমরা স্তম্ভিত হই, ইঁহাদের মহত্ত্ব স্মরণ করিলে মোহিত হই। ইঁহারা তিন জনই মানব-দেবতা।

সৃষ্টির প্রতি বস্তুতেই বিশেষত্ব বিদ্যমান। আপন বিশেষত্বে প্রতি বস্তুই সর্ব্ব প্রধান। প্রতি মানুষ আপন বিশেষত্বে প্রধান, ইহা চিন্তার এক দিক্, সৃষ্টির এক বিভাগ। আর এক বিভাগ আরও মনোরম, আরও সুন্দর। সে বিভাগের বিশেষত্বে আবার অসাধারণত্ব আছে। পৃথিবীর সমস্ত বিশেষত্ব সেখানে কেন্দ্রীভূত, সেখানে ঘনীভূত। পৃথিবীর সকল বর্ণ যেমন রামধনুতে প্রতিফলিত, পৃথিবীর সকল বিশেষত্ব, সেইরূপ, সেই স্থলে প্রতিবিম্বিত। সে কিরূপ কথা, বলিতেছি।

পৃথিবীতে বড় কে, ছোট কে? মহৎ কে, সামান্যই বা কে? নিজ অনুভূতির আদর্শানুসারে মানুষ কাহাকেও বড় বা মহৎ, কাহাকেও ছোট বা সামান্য বলিয়া অভিহিত করে; প্রকৃতপক্ষে বড় ছোট বিচারের আর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যন্ত্র নাই। দেখিতে পাই, সংসারে কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, কেহ ভক্ত, কেহ বা সংসারী। ইহার মধ্যে কে বড়, কে ছোট? প্রতিভা বা বুদ্ধি, মনোবল বা শারীর বল, ইহার মধ্যে কে বড়, কে বা সামান্য? যাহার আদর্শ যেরূপ, সে তাহাকেই আদর করে; তাহাকেই বড় বলে। প্রকৃতপক্ষে, এই সকলের মধ্যে বড় ছোট, বা সামান্য অসামান্য, এ বিচার চলে না। বিধাতার সৃষ্টিতে সকলেরই প্রয়োজন আছে, সুতরাং প্রয়োজনানুসারে সকলেই আপন আপন বিভাগে বড় বা মহৎ। যত গুণ, যত সৌন্দর্য্য, যত শক্তি—ইহার মধ্যে কেহই কাহার অপেক্ষা হীন নহে; আপন আপন বিভাগে সকলেই মহৎ। রাজা কর্ত্তৃত্বশক্তিতে প্রধান, প্রজা আনুগত্যে

* ২৬শে ফাল্গুন, এই প্রবন্ধটী রামমোহন রায় ক্লবে পঠিত হইয়াছিল।

প্রধান,মন্ত্রী বুদ্ধিবলে প্রধান, সেবক সেবাতে প্রধান। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানী জ্ঞানে, কর্ম্মী কর্ম্মে, বিশ্বাসী ভক্তিতে, কবি কবিত্বে প্রধান। এ এক রাজ্যের কথা। সাধারণতঃ পৃথিবীর সৃষ্ট জীব জন্তু সকলই এইরূপ নানা বিশেষত্বে পূর্ণ। কিন্তু এই সকল বিশেষত্ব, কোন কোন স্থলে আবার ঘনীভূত হইতে দেখা যায়। দেখা যায়—সকল নদী,সকল উৎস মিলিয়া মহাসাগরের সৃষ্টি করিতেছে। দেখা যায়, জ্ঞান আর প্রেম, বিশ্বাস আর ভক্তি, অধ্যবসায় আর কর্ম্ম, বুদ্ধি আর প্রতিভা, মনোবল বা ইচ্ছাবল—সব যেন একাধারে সম্মিলিত হইয়াছে; দেখা যায়—কোথাও কোথাও সৃষ্টির সকল বিশেষত্ব একাধারে পরিশোভিত, পৃথিবীর সকল বর্ণ, সকল সৌন্দর্য্য একত্র প্রতিফলিত। প্রতি বস্তুর বিশেষত্বে ও বৈচিত্র্যে শোভা আছে, অস্বীকার করি না, কিন্তু সকল বিশেষত্ব, সকল বৈচিত্র্য যখন একত্র সন্নিবিষ্ট, তখনকার শোভা অতুল। পৃথিবীর ঝরণা, উৎস, নদ নদীর শোভা বর্ণনার আয়ত্বাধীন, কিন্তু সেই সকল মিলিয়া যখন মহাসাগরে পরিণত, তখন তাহা বর্ণনা করিতে সাধ্য কার? সে শোভা অতুল,—অকথিত, অজ্ঞানিত, অশেষ, অব্যক্ত।

প্রকৃতিতে যাহা মহাসাগর, মানবে তাহা মহাপুরুষ। সকল বাষ্প, সকল মেঘ এবং সকল নদ নদীর জল মিলিয়া যেমন মহাসাগরের উৎপত্তি, সেইরূপ, সকল মানুষের সকল বিশেষত্ব, সকল মনুষ্যত্ব মিলিয়া মহাপুরুষ। পুরুষকারও স্বীকার করি, অথচ মহাপুরুষবাদও মানি। সকল ফুলের আঘ্রাণ, সৌন্দর্য্য, সুষমা যিনি একত্র সমাবেশ করিতে পারেন, সকল আধারের বিশেষত্ব যিনি আত্মস্থ করিতে পারেন, সকল শক্তি যিনি আয়ত্বাধীন করিতে সমর্থ—তিনি অসাধারণ ব্যক্তি বা মহাপুরুষ। তাহা পারে কে, পারে না বা কে? যে উপেক্ষা করে, সে-ই পারে না; যে যত্নসহকারে গ্রহণ করে, সে-ই পারে। প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্য, সকল বিশেষত্ব মানুষের নিকট প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হইতেছে,—আয়ত্ত বা আত্মস্থ করে না মানুষ কেবল উপেক্ষায়। মানুষের শক্তি সমূহ অনুশীলনে (culture) জাগ্রত হয়; বুদ্ধি বল বা প্রতিভা বল, জ্ঞান বল বা প্রেম বল, মানসিক বল বল, বা শারীরিক বল বল, অনুশীলনে সকলই জাগ্রত হয়। বিনা অনুশীলনে মানুষের অন্তরনিহিত ঘুমন্ত শক্তি জাগে না। যত চর্চ্চা, যত মার্জ্জনা, যত অনুশীলন, ততই শক্তির স্ফূর্ত্তি। এক শক্তি-সাগর হইতে প্রাপ্ত শক্তি সকলেরই একরূপ, অনুশীলনের ন্যূনাধিক্যে মানুষের অসাধারণত্ব,বিশেষত্ব বা বৈচিত্র্য প্রস্ফুটিত হয়। যাঁহারা সকল শক্তির সম অনুশীলন করিতে পারেন, তাঁহাদের সকল শক্তিই জাগ্রত হয়, অথবা তাঁহারা সকল বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন। ইহাকেই মহাত্মা পার্কার সমঞ্জসীভূত উন্নতি (simultaneous development) বলেন। হেলায় মানুষ রতন হারায়। প্রত্যহ যে সূর্য্য গগনে উঠে, প্রত্যহ যে ফুল বাগানে ফুটে,—তাহা সকলের ভোগ্য; কিন্তু যে উপেক্ষা করে, তুচ্ছ করে, তাহার নহে। ঐ শোভা দেখিয়া কত লোক স্বর্গে যায়, কিন্তু কত লোক যেমন ছিল,তেমনই থাকে। এরূপ হয় কেবল, অবহেলায়, তাচ্ছল্যে। বিধাতার বিধানের কথা যদি বলিতে চাও, তবে তাহা সকলের পক্ষে

সমান। অঙ্কুরে মানুষের সকল শক্তি সমান। অনুশীলনে কাহারও জাগ্রত, এবং অসদভাবে কাহারও সুষুপ্ত। মানুষ,মানুষ হউক,বিধাতার ইচ্ছা; একদিন নিশ্চয় মানুষ মানুষ হইবেও তাঁহারই ইচ্ছায়। এখন যে মানুষ পাপে ডুবিতেছে বা হীন কাজে মজিতেছে, সে কেবল অবহেলায়। অনুশীলনের আয়ত্বাধীন কি নয়, জানি না। অধ্যবসায়ে, পরিশ্রমে যে কি সিদ্ধ হয় না, তাহা বুঝি না। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথায় বলে—"গাইতে গাইতে গায়ক, আর বাজাইতে বাজাইতে বাদক।" বাস্তবিক কথাটা ঠিক। যত মস্তিষ্ক চালনা করিবে, ততই বুদ্ধি মার্জ্জিত ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, যত হস্ত পদ চালনা করিবে, তত কার্য্যকরী শক্তি বাড়িবে। বুদ্ধি বা প্রতিভা,জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, প্রেম বা দয়া—এ সকলই অনুশীলনে উপার্জ্জিত হয়। "মানুষ যাহা হইয়াছে, চেষ্টা করিলে মানুষ তাহা হইতে পাবে"—এক জন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন। গভীর চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায়, উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে আমাদের শক্তিসমূহ সুষুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে বিচার আজ থাকুক্।

মহাপুরুষবাদ, সহজ কথায়, এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। এক এক সময়ে দেশের প্রচলিত আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য— এক এক প্রকার বায়ু সৃজন করে। সেই বায়ুরাশি এক এক স্থানে সঞ্চিত হয়; অথবা এক এক জন আত্মস্থ করেন। সেই বায়ুরাশিতে ডুবিয়া মজিয়া এক এক জন সকলের বিশেষত্বে, অসাধারণত্বে মহাশক্তি, মহাবল লাভ করিয়া ধরায় মস্তক উত্তোলন করেন। তাঁহাদের পরাক্রমে জগৎ কম্পিত, মোহিত এবং স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাঁহাদের প্রভাবে পৃথিবীর প্রবাহিত বায়ু আমূল পরিবর্ত্তিত হয়। ইহারাই মহাপুরুষ, ইহারাই মানব-দেবতা।

সকলের সকল বিশেষত্বে যে মহাপুরুষদিগের জন্ম,সে মহাপুরুষদিগের বিশেষত্ব কি? তাঁহাদিগের ভিতর এমন কি শক্তি দেখা যায়, যাহা আর কোথাও মিলে না? পৃথিবীর সকল বিশেষত্ব—পুরুষের বীর্য্য, নারীর প্রেম, বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য, বালকের কোমলত্ব, সব যখন মিলিয়া গিয়াছে,—জ্ঞান প্রেম পুণ্য, যোগভক্তি কর্ম্ম যখন এক স্থানে সম্মিলিত, সত্ব, রজ, তম বা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী যখন জীবন-প্রয়াগে সম্মিলিত,তখন কি বিশেষত্বের অভ্যুদয় হইতেছে? বিশেষত্ব—একে তিন, তিনে এক হইয়া এক অদ্বৈত মহাশক্তির উদয়। সেই শক্তিই মানব-দেবত্ব। সেই শক্তিই চরিত্র। সেখানে সাহস, বীর্য্য, স্বার্থত্যাগ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম মিলিয়া মহা চরিত্র উৎপন্ন করিয়াছে। তাঁহার তুলনায় সমগ্র পৃথিবী মুষ্টিমেয়, ধরা সেখানে শরার স্থায়। সে চরিত্র-শক্তির সংস্পর্শে সাধারণ মানুষ আত্মহারা, দিক্‌ভ্রান্ত, লক্ষ্য-শূন্য। মানব পরিবার সে চরিত্র বলের যেন হাতের ক্রীড়ার বস্তু। সেখানে বক্তৃতা নাই,অথচ আন্দোলন আছে, —সেখানে মানুষকে কেহ চালায় না, অথচ সেই শক্তির অনুসরণ করে; যেন মানুষ আপন-ভোলা। সিজর, আলেকজেণ্ডার, নেপোলিয়নের দর্প চূর্ণ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত চরিত্রের প্রতাপ কখনও খর্ব্ব হয় না। ঈশা মরিয়াও পৃথিবীতে চিরজীবিত,শাক্য নির্ব্বাণ লাভ করিয়াও চিরসঞ্জীবিত। এই মহাপুরুষ-দিগের আবির্ভাবেই ধরা ধন্য—পৃথিবী পরিত্রাণ পাইয়াছে। চির-নির্ব্বাসিত করিয়া

কি অষ্ট্রীয়া ম্যাট্‌সিনির প্রতাপ খর্ব করিতে পারিয়াছিল? অথবা শত্রুতা সাধন করিয়া আমেরিকা পার্কার-শক্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল? খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে য়িহুদী জাতির কুসংস্কার, শাক্যের বিরুদ্ধে মায়পিপূনের প্রবল আধিপত্য, শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধে সংসারাসক্তি, পার্কারের বিরুদ্ধে দাস ব্যবসায়ী দলের চক্রান্ত, ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার প্রবল প্রতাপ, এবং রামমোহনের বিরুদ্ধে কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুসমাজের মহাপরাক্রম কি অবশ্য কাজ করে নাই, জানি না; কিন্তু কোথায় সে সকল অবস্থা, আর কোথায় ইঁহাদের তেজ, সাহস, বীর্য্য। অগ্নিতে যেমন তৃণরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইঁহাদের চরিত্র-তেজে, তীব্র আন্দোলন, দারুণ অত্যাচার তেমনই ভস্মীভূত হইয়াছে। জাহাজ যেমন অবিরাম গতিতে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া লক্ষ্য স্থলে চলিয়া যায়, কোন বাধায় ফেরে না, ইঁহারাও তদ্রূপ সকল বাধা, সকল বিপদ অমানুষী ধৈর্য্য সহকারে ভেদ করিয়া লক্ষ্য সাধন করিয়া চলিয়া যান। কাহারও সাধ্য নাই, ইঁহাদিগকে থামাইতে পারে। ইঁহারা অধিক কথা বলেন না, তবুও মানুষ মজে, ইঁহারা কাহাকেও চালাইতে চান না, তবুও মানুষ বশ হয়। এমন বশ হয় যে, দিবালোকে শ্রেণীবদ্ধ প্রজাপুঞ্জকে বন্দুকের গুলিদ্বারা প্রাণনাশ করিয়াও অষ্ট্রিয়া-গবর্ণমেণ্ট ম্যাট্‌সিনির অনুরক্ত দলকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। যে শক্তিতে এই সকল মহাপুরুষেরা অনুপ্রাণিত, সে শক্তির তেজে পৃথিবী অবনত-মস্তক। ইঁহারা কামনা-রহিত কামনা-যুক্ত, বাসনা-বিবর্জ্জিত বাসনাযুক্ত। ইঁহারা ফল-শূন্য ফলবাদী, ইঁহারা সংসারশূন্য সংসারী। ইঁহারা ব্যক্তিত্ব মানেন না, সমষ্টি মানেন; ইঁহারা পরিবার ত্যাগ করেন, বিশ্ব-সংসারে ঘর বাঁধেন। ইঁহারা কোনরূপ ফল না পাইয়াও শরীর বিসর্জ্জন দেন, ইঁহারা কিছু প্রত্যাশা না রাখিয়া সকলের দাস হন। সমগ্র পৃথিবী ও মানব-সমাজ তাঁহাদের ভালবাসার জিনিস। তাঁহাদের সংস্পর্শে, তাঁহাদের আদর্শে জগৎ রূপান্তর ধারণ করে। ধীরে ধীরে তাঁহাদের প্রভাবে ধরা পরিবর্ত্তিত হয়,—বায়ুর গতি এবং নদীর স্রোত ফিরে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই শ্রেণীর লোক। ধীরভাবে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, রামমোহন তদানীন্তন কালের সমস্ত বিশেষত্বের, সমস্ত শক্তির রাজা ছিলেন। তিনি পার্থিব জগতের জড়পদার্থের রাজা ছিলেন না, কিন্তু অজেয়, অদম্য, চিন্ময় শক্তিতে রাজা ছিলেন। এমন কোন শক্তি দেখি না, যাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্ব-মুখী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় উন্নতির যে কথা ভাবি, সে সকলেরই তিনি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুসমাজের সতীদাহ নিবারণ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন নিবারণ করিয়া রাজা যে কি অসীম, অজেয়, অদম্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, ভাবিলে অবাক্ হই। বুদ্ধি ও প্রতিভা, সাহস ও অধ্যবসায়, জ্ঞান ও প্রেম, ভক্তি ও কর্ম্ম—এ সকলের অনুশীলন করিয়া তিনি বঙ্গের এবং তৎসহ ভারতের ভাবী উন্নতির সকল উপায় উজ্জ্বল রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন মানব-

পরিবারের উন্নতি এবং একতার উপায় নাই, ইহা বুঝিয়া তিনি ভাষার উন্নতি এবং ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে মনোসংযোগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সেই সময়ের অবস্থার কথা ভাবিলে চক্ষে জল পড়ে, উচ্ছৃঙ্খল বঙ্গসমাজের তদানীন্তন কালের ধর্ম্ম-শিথিলতা স্মরণ করিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় আদিরস-ঘটিত কবিত্বের তখন কত আদর! ব্যভিচার, মদ্যপান তখনকার লোকের অলঙ্কার ছিল, ভাষা যেন বাঙ্গালীর রিপু সেবার সহচর ছিল। বৈষ্ণব কবিদিগের ভাবপূর্ণ লেখাও তখন আদিরস উদ্দীপনে সহায়তা করিত। আর ধর্ম্মহীনতার কথা কি বলিব—শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকল লোক ব্যভিচার ও মদ্যপানে তখন মাতোয়ারা; ধর্ম্ম, প্রেম, পুণ্য, নীতি, পবিত্রতা—তখন কল্পনার জিনিষ ছিল। শুনিয়াছি, তখন এমন লোক বিরল ছিল, যাহার অধীনে বেশ্যা থাকিত না, এবং এমন শিক্ষিত লোক পাওয়া যাইত না, যাহারা মদ্যপান করিত না। ঋষি-তুল্য রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছেন "তাঁহাদের সময় পর্য্যন্ত মদ্যপান করা নিন্দার জিনিষ ছিল না।" রামমোহন এইরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম গ্রহণের পর হইতে যেন ধীরে ধীরে বাঙ্গালা দেশ আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পরশমণির সংস্পর্শে মাটী যেমন সোণা হয়, রামমোহন-শক্তির সংস্পর্শে বঙ্গসমাজ ৫০ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ যে সমাজের নানা বিভাগের এত উন্নতি দেখিতেছি, ইহার মূলে তিনি। আজ যে বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি দেখিতেছি, ইহার মূলেও তিনি। বাঙ্গালা ভাষার দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত লেখার উপায় তিনিই প্রথম আবিষ্কার করিলেন;—পদ্যময় বাঙ্গালা ভাষাকে উন্মুক্ত-ক্ষেত্র গদ্যে লইয়া আসিলেন। আর ধর্ম্মের কথা কি বলিব, আজ যে ভারতে এত অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মান্দোলন উঠিয়াছে, ইহার মূলেও তিনি। তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হও, সকলেই ঈশ্বরের পুত্র, সকলেই তাঁহার উপাসনার অধিকারী; এ কথা এবং তৎসহ আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ, এ কথা তিনিই প্রচার করেন। জগতের ভাবী ধর্ম্মকে আবিষ্কার করা, যেমন তেমন কাজ নয়। একেশ্বরবাদ যে জগতের ধর্ম্ম হইবে, কে তাহাতে সন্দেহ করিতে পারে? সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক সংস্কার ব্যাপারে পথপ্রদর্শকরূপে তিনি হস্তক্ষেপ না করিলে, এ সকল যে আমাদের কর্ত্তব্য, ইহা আমাদের ধারণা হইত কি না, সন্দেহ। আমাদের দুর্ভাগ্য—আমরা আজও এমন মহাপুরুষকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারি নাই। তিনি ভাষা সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া কেহ তাঁহার একটু আদর করেন; তিনি রাজনীতি সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া কেহ আর একটু আদর করেন; তিনি সমাজসংস্কার করিয়াছেন বলিয়া আর কেহ একটু আদর করেন। তিনি ধর্ম্ম সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া আর কেহ একটু সম্মান করেন। কিন্তু ইহা কি তাঁহার প্রকৃত সম্মান? খ্রীষ্ট জীবন ঢালিয়া কোটী জীবনে আধিপত্য করিতেছেন; কই, রামমোহন রায় যাঁহাদের জন্য জীবন ঢালিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়জনের চরিত্রে তাঁহার শিক্ষা ও জীবনত্যাগের আধিপত্য আছে? খ্রীষ্ট একটী সত্য রক্ষার জন্য জীবন দিয়াছিলেন, আজ দেখিতেছি, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী

কোটি ২ লোক সভ্য রক্ষার জন্য জীবন দিতেছেন। প্রকৃত সম্মান, প্রকৃত মহত্তের পূজা এই খানে। খ্রীষ্ট নরসেবায় মাতোয়ারা ছিলেন, আজ দেখিতেছি, নরসেবার জন্য তাঁহার দলের লোক দেশ বিদেশে অকাতরে অম্লানচিত্তে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। প্রকৃত মহত্বের সম্মান এই খানে। কত জ্ঞানিত এবং অজ্ঞানিত, কথিত এবং অকথিত, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী লোক হিংস্র জন্তু সম অসভ্য জাতির উদ্ধারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন, কে জানে? ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু হইতে জল পড়ে। আর মহাত্মা রামমোহন রায়, যিনি এ দেশের জীবন সঞ্চারের জন্য জীবন দিলেন, তাঁহার প্রতিভা বা জ্ঞান, মহত্ব বা চরিত্রের চিন্তা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করা দূরে থাকুক, তিনি যে সকল কাজে জীবন উৎসর্গ করিলেন, তাহার একটুও অনুকরণ বা অনুসরণ করি না। ধিক্ বাঙ্গালী জাতি, ধিক্ বাঙ্গালী চরিত্র।

আর ব্রাহ্মসমাজকেও ধিক্কার দি, ব্রাহ্মসমাজও এই মহাত্মার প্রকৃত সম্মান সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া এ কথা বলিতেছি না, তাঁহার চরিত্র, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম্মভাব, তাঁহার ঐকান্তিক পরিশ্রম, তাঁহার দেশীয় এবং বিদেশীয় শাস্ত্রানুরাগ, তাঁহার সমদর্শিতা, তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার নিরপেক্ষ ভাব ও স্বদেশ-সেবা—আমাদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া এ আক্ষেপ করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজে ভগবান্ ঈশ্বরের পূজা হয় সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায় জাতি-নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের পুত্র কন্যাকে কই ব্রাহ্মসমাজ ভালবাসিতে পারেন? ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের সার্ব্বভৌমিকত্ব, মতগ্রস্ত কুয়াসায় ডুবিয়া যাইতেছে কেন? তিনি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের জন্য যেরূপে খাটিতেন, আমরা সেরূপ খাটিতে পারি কই? তিনি অসাধারণ অধ্যয়ন-পিপাসায় সকল জাতির শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া মানব পরিবারের উদ্ধারের জন্য, কি অমূল্য অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন! ঈশ্বর ও মানবাত্মার সাক্ষাৎ ভাবে যোগ, গুরু নাই; মধ্যবর্ত্তী নাই, এ কথা তিনিই প্রচার করেন। বলেন যে, সম্প্রদায় ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই ব্রহ্মপূজার অধিকারী। সংসারে থাকিয়াও যে ধর্ম্ম সাধন হয়, নূতন ভাবে তিনিই ব্যক্ত করেন। মহাত্মা মোক্ষমূলর প্রভৃতি তাঁহার মতের উপর বর্ত্তমানধর্ম্ম বিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এতদূর সম্মান করি যে, তাঁহার গ্রন্থরাশির পৃষ্ঠাও একবার উলটাইয়া দেখি না; তাঁহার উদার ধর্ম্ম মতের গভীরতা উপলব্ধি করি না। এমনই সম্মান-বোধ, এমনই অনুকরণ পিপাসা! পরম সৌভাগ্যের বিষয় এতকাল পর মহাত্মার নামে এই ক্লব প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাপুরুষের মহত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই সভার সভ্যগণকে, এজন্য, অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

কিন্তু যা হউক, তা হউক, একদিন এ দেশ এবং সকল দেশ তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিবে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি; বিধাতার কৃপা ললাটে ধারণ করিয়া একেশ্বরবাদ জগতের সকল স্থানকে জয় করিবার জন্য দূর হইতে দূরান্তর ছুটিতেছে, দিগ্বিদিকে নিনাদিত [illegible]

এই ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুপ্রবেশ করিতেছে। দিব্য চক্ষে দেখিতেছি—সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের সকল বিদ্বেষ ভাবকে পরাজয় করিয়া, এই ধর্ম্ম, আপন মূল প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। দেখিতেছি, দেশ হইতে দেশান্তরে, রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে ইহা বিস্তৃত হইতেছে। বক্তৃতার ধর্ম্ম যখন বিশ্বাসে এবং বিশ্বাসের ধর্ম্ম যখন চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মরণের কোল হইতে জাগরিত হইয়া, অসংখ্য মানব প্রাণে রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন। যতদিন এই ধর্ম্ম বক্তৃতার বিষয়, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার উপদেশরাশি অবহেলিত; যখন ধর্ম্মমত বিশ্বাস ও চরিত্রে প্রতিফলিত হইবে, যখন ধর্ম্মের উপদেশ প্রতিপালিত ও জীবনগত হইবে, তখনই মহাশক্তিতে মানুষ পুনর্জ্জীবিত হইবে, তখন মহাপুরুষের চরিত্র মানব প্রাণে ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যখন এই প্রকৃত মহাপুরুষ চরিত্র মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাহ্যাড়ম্বর তিরোহিত হয়; অন্তরের শক্তি জাগরিত হয়, মানুষ দেবত্বে উথিত হয়। তখন পিতাপুত্রের সম্মিলন হয়। তখন ভক্তি ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মানুষ জগতের কল্যাণের জন্য অম্লানচিত্তে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। প্রকৃত জীবন বিসর্জ্জন; তখন কথায় ব্যক্ত হয় না, কাজে ব্যক্ত; নরসেবা বা দয়া তখন বক্তৃতায় নহে, প্রত্যক্ষে। হায় সে দিন কবে আসিবে, যে দিন কথার স্রোত প্রতিহত হইবে এবং চরিত্রের বলে দিগ্বিজয় হইবে—কবে বক্তৃতা থামিবে এবং প্রকৃত নর সেবারূপ কার্য্যারম্ভ হইবে? যে দিন সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে, সেই দিন আমরা জীবন্ত রামমোহন রায়কে পুনরুত্থিত দেখিব ও সেই দিন প্রকৃত ভক্তির সহিত তাঁহাকে পূজা করিতে শিখিব। বিধাতা সে দিন আনয়ন করুন।

বিবাহোৎসব।

(প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের শুভবিবাহোপলক্ষে রচিত।)

সখীর গান।

(সম্প্রদানের পূর্ব্বে)

১মা। সুখেতে অবশ প্রাণ,
থামা' থামা' তোরা গান।
দেখ দেখ চেয়ে সখীর মু'পানে
কিবা শরমের ভাণ!

ঠোঁটের হাসিটি—দেখলো চাহিয়া,
আঁচলে চাপিয়া লুকাইতে গিয়া
কেমন পড়িছে ধরা!
মুখ-পানে বালা চায় না চাহিতে,
চপল দিঠিটি চায় লুকাইতে—
কিবা সুখ মন-গড়া!
দেখ গো ওগো দেখ গো!

২য়া। চিকুর জড়ান' ফুলে,
গলে ফুলমালা দুলে।
চিকণ দুকুলে ঢাকা দেহখানি,
ঘোমটা পড়িছে খুলে।

নূপুর বাজিছে পায়,
আঁচল লুটিয়া যায়।
সখীরো হাসিটি . পায়ে না সহিতে,
সরমে লুকাতে চায়।

ব'লো না গো অত কথা,
এখনি পাইবে ব্যথা।
হাসিতে লাজেতে ফেলিবে কাঁদিয়া,
নুইয়া পড়িবে মাথা।
থাম গো ওগো থাম গো!

৩য়। দেখ বুকে হাত দিয়া—
কাঁপিছে সখীর হিয়া।
বহিলে বায়ুটি কাঁপিলে পাতাটি
উঠে কেন চমকিয়া!

তবে না, শরম-লতা,
ভাবনি তাহার কথা!
দিন যে যাইত হেসে গেয়ে সুখে,
কবে পেলে বুকে ব্যথা?
বল গো ওগো বল গো!

সখার গান।

কি কুহকী ফুলবাণ,
মধুময় কি সন্ধান!
কে জানে কখন্ মলয় বহিল—
কুয়াসা টুটিল, কুসুম ফুটিল,
বিহগ গাহিল গান।
শিহরিল দেহ, উথলিল স্নেহ,
জাগিল হৃদয়ে কবেকার গেহ,
কবে সেই প্রাণ-দান।
কি কুহকী ফুলবাণ!

২য়। চারিদিকে চায় আকুল হৃদয়,
হাসিছে বাশীতে ধরা মধুময়!
কার কথা যেন মনে হয় হয়,
তবুও হয় না মনে!
পথপানে চেয়ে সে যেন এখনি
বিজন [illegible] পথ গণি' গণি';

চেপে কত কথা, মুকে কত ব্যথা,
কোলে মালা অযতনে।
তবুও হয় না মনে!

৩য়। এস প্রিয়সখি, তিথি অনুকূল,
আশা পিপাসায় প্রাণে কত ভুল!
কত গাহি গান, কত তুলি ফুল—
মজিয়া তোমার ধ্যানে!
সেই সুখে সাধে, সেই প্রেমে লাজে
দাঁড়াও দাঁড়াও এসে ধরামাঝে!
এস প্রতি পলে, এস প্রতি কাজে,
এস মনে, এস প্রাণে।
ঘুচাও বিষাদ শোক পাপ তাপ,
নর-জীবনের চির অভিশাপ—
তোমার প্রণয়দানে!
এস প্রেমময়ি, এস সুমঙ্গলে,
ডাকিছেন মাতা ল'য়ে দুর্ব্বাদলে,
সখারা ডাকিছে গানে।
এস মনে, এস প্রাণে।

বরের গান।

(সম্প্রদান কালে)

আয় প্রিয়ে আয়!
কত জনমের স্মৃতি আঁখি কোণে চমকায়!
কত আশা, কি পিপাসা,
কত স্নেহ-ভালবাসা
অধরে না পেয়ে ভাষা হাসি-সনে মিশে যায়!
প্রেম আলিঙ্গন-আশে
বাহু আগুসরি আসে,
লোক-লাজে অভিমানে আধ-পথে থমকায়।
মরমে মরমে খেলা,
শরমে কি হেলা-ফেলা!
গলে যেন বর-মালা যেন কত অমিয়ায়!

কবির গান।

(বাসরে)

তোমরা কে হে—
লভিছ অমর সুখ এই মর-দেহে!
নয়নে নয়নে হয়
কিবা প্রাণ বিনিময়!
কি মধুর লীলা-ছলা সাধের সন্দেহে!
অনিমিষ আঁখি কাছে,
শত ভয় জেগে আছে!
দুজনে ধরিতে চাহ দুজনার স্নেহে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? (১)

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? পরমেশ্বর মঙ্গলস্বরূপ ও পূর্ণপবিত্র। তবে তাঁহার রাজ্যে এত দুঃখ ও পাপ কেন? ইহা অতি গুরুতর ও গভীর প্রশ্ন। সকল কালে,সকল দেশে, ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে এই গভীর প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। এই সুকঠিন প্রশ্নের সন্তোষপ্রদ উত্তর দান করা সহজ নহে। সহজ না হইলেও যে, ইহার সদুত্তর নাই, এমন নহে। সরল ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। যথাসাধ্য এ বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ যাঁহারা অবিশ্বাসী বা সংশয়বাদী,—যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও দয়া স্বীকার করিতে চান না, তাঁহাদের যুক্তি একটী একটী করিয়া সমালোচনা করিয়া তৎপরে জগতে দুঃখ ও পাপ সত্ত্বেও কেন আমরা জগতের কর্ত্তাকে দয়াময় বলি, তাহার উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক।

কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ সংশয়বাদী বলেন যে, পরমেশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময়, এই উভয় লক্ষণসম্পন্ন হন, তবে তাঁহার জগতে কেমন করিয়া দুঃখ যন্ত্রণা সম্ভব হইতে পারে? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; সুতরাং জীবের দুঃখ দূর করিবার শক্তি তাঁহার আছে। তিনি দয়াময়; সুতরাং দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছাও তাঁহার আছে। যখন শক্তি ও দয়া উভয়ই আছে,তখন জগতে এত দুঃখ কেন? তাঁহার দয়া বলিতেছে, জীবের দুঃখ দূর হউক। শক্তি, এক মুহূর্ত্তে জীবকে পূর্ণ সুখ প্রদান করিতে পারে। তবে জীবের এত দুঃখ কেন?

এস্থলে সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ পরিস্কার করিয়া বুঝা আবশ্যক। সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ কি? যে সময়ে রাজা রামমোহন রায় এদেশে বেদবেদান্ত প্রতিপাদ্য নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এদেশের অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বিচারযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় নিরাকার ব্রহ্মবাদ সমর্থন করিয়া সাকার উপাসনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে নানা প্রকার আপত্তি উপস্থিত করিলেন। তন্মধ্যে একটী আপত্তি এই যে, পরমেশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন তিনি স্বভাবতঃ চিন্ময়,নিরাকার হইলেও সাকাররূপে প্রকাশ হইতে পারিবেন না কেন? তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্ তখন স্বভাবতঃ নিরাকার হইলেও দেহধারী হইতে পারিবেন না কেন?

রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে

বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও আত্মস্বরূপ বিনাশে তিনি সক্ষম, এরূপ বলা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। যদি নিরাকার ব্রহ্ম, আত্মস্বরূপের বিপর্য্যয় করিয়া সাকার হইতে পারেন, তবে এমনও বলা যায় যে, যিনি অবিনাশী নিত্য, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া আত্মবিনাশে সক্ষম। কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ। যাহার বিনাশের সম্ভাবনা আছে, তাহা কখনই ব্রহ্ম নহে। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও আত্মস্বরূপের অন্যথা করিতে পারেন না।

রামমোহন রায়ের যুক্তিটী আলোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, যদি এরূপ স্বীকার করা যায় যে, পরমেশ্বর সৃষ্টি লীলা সম্বন্ধে যেমন, আত্মস্বরূপ সম্বন্ধেও সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্;—অর্থাৎ জগৎকে যেমন তিনি পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, সেইরূপ আত্মস্বরূপকেও পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে ঘোরতর সংশয়বাদ ও নাস্তিকতায় উপনীত হইতে হয়। লোকে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাকারবাদ ও অবতারবাদ সমর্থন করিতেছে, সেই যুক্তি দ্বারাই যে বাস্তবিক নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ সমর্থিত হয়, ইহা তাঁহারা বুঝেন না।

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; সুতরাং তিনি স্বভাবতঃ সত্যস্বরূপ হইলেও অসত্য হইতে পারেন; জ্ঞানময় হইলেও অজ্ঞান হইতে পারেন; অনন্ত হইলেও পরিমিত হইতে পারেন; আনন্দময় হইলেও ঘোর দুঃখে নিমজ্জিত হইতে পারেন; শান্তিনিকেতন হইলেও বিষম অশান্তিবিষে জর্জ্জরিত হইতে পারেন; কৃপাময় হইলেও নির্দ্দয় হইতে পারেন। পবিত্র হইলেও পাপময় হইতে পারেন। সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া তাঁহাতে সকলই সম্ভব। এমন কি, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং আত্মহত্যা করিতে পারেন। তাঁহার সর্ব্বশক্তি, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিতে পারে। কোন নিরীশ্বরবাদী বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং হয়ত, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রদত্ত শক্তিতে জগৎ আপনা আপনি চলিতেছে।

সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, সৃষ্টিলীলা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার সীমা নাই। তাঁহার আত্মস্বরূপ বিপর্য্যয় বা বিনাশ করিবার শক্তি আছে, স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না, এমন কি, নাস্তিক হইতে হয়।

আত্মস্বরূপের উপরে তাঁহার ক্ষমতা চলে না বলিলে, তাঁহার মহিমার লাঘব করা হয় না। তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করা হয়। তিনি অজ্ঞান হইতে পারেন না, অর্থাৎ তিনি চিরজ্ঞানময়; তিনি আপনাকে দুঃখময় করিতে পারেন না, কেননা তিনি সচ্চিদানন্দ পুরুষ। তিনি আপনার মধ্যে অশান্তি আনিতে পারেন না, কেমনা তিনি চিরশান্তি নিকেতন। তিনি নির্দ্দয় হইতে পারেন না, কেননা অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম তাঁহার স্বরূপ। তিনি অপবিত্র হইতে পারেন না, কেননা তিনি চির দিনই স্বভাবতঃ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন। এই সকল কথা বলাতে তাঁহার মাহাত্ম্যের লাঘব হয় না। তাঁহার প্রকৃত মহিমাই ব্যক্ত করা হয়। তিনি এত ভাল যে, কখনই মন্দ হইতে পারেন না। সর্ব্ব-

শক্তি, যেমন তাঁহার একটী স্বরূপলক্ষণ, সেইরূপ পবিত্রতা প্রভৃতিও তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ গুলির মধ্যে অবশ্য স্বভাবতঃ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। একটী স্বরূপ লক্ষণ আর একটীর অন্যথা করিতে পারে না।

এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা স্বভাবতঃ চিরদিনই অসম্ভব। কোন শক্তি তাহা সম্ভব করিতে পারে না। একই সময়ে, একই স্থানে আমি আছি ও নাই, এ উভয়ই কখন সত্য হইতে পারে না। একই সময়ে, একই স্থানে আমি আছি এবং আমি নাই, ইহা অসম্ভব। কোন শক্তি ইহা সম্ভব করিতে পারে না। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া যাহা স্বভাবতঃ চিরদিনই অসম্ভব তাহা তিনি সম্ভব করিতে পারেন, ইহা স্বীকার করি না। স্বীকার করিলে সত্যাসত্যের কোন প্রভেদ থাকে না। সত্য ও অসত্যের মধ্যে অবিনশ্বর নিত্য প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা অনন্ত শক্তির অতীত।

পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যেমন সম্ভব ও অসম্ভব রহিয়াছে; সৃষ্ট পরিমিত জীব সম্বন্ধেও সেই রূপ সম্ভব ও অসম্ভব আছে। জীবের পক্ষে যাহা স্বভাবতঃ অসম্ভব, তাহা চিরদিনই অসম্ভব। অনন্ত শক্তিও তাহার অন্যথা করিতে পারে না। পরমেশ্বর সকল সীমার অতীত। জীব পরিমিত ও বদ্ধ। সুতরাং পরমেশ্বরের পক্ষে বিশেষ ভাবে যাহা সম্ভব ;—যাহা তাঁহার বিশেষ লক্ষণ, বিশেষ গুণ, জীবের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই অসম্ভব।—ঈশ্বর, ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার বিশেষত্ব আছে। জীব, জীব বলিয়া তাহারও বিশেষত্ব আছে। ঈশ্বরের যাহা বিশেষত্ব তাহা জীবে সম্ভব নহে। জীবের যাহা বিশেষত্ব তাহা ঈশ্বরে সম্ভব নহে। ইহা নিত্যপ্রভেদ। কোন শক্তি এই প্রভেদ বিনাশ করিতে পারে না। জীব, ব্রহ্ম হইতে পারে না। ব্রহ্মও জীব হইতে পারেন না।

সৃষ্ট জীবের পক্ষে দুঃখ স্বভাবতঃ অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্ট হইলেই পরিমিত; পরিমিত হইলেই অভাববিশিষ্ট; অভাববিশিষ্ট হইলেই দুঃখ সম্ভব। সৃষ্ট হইলেই অপূর্ণ। অপূর্ণ জীবের দুঃখের অভাব অসম্ভব। আমাদের শক্তির সীমা, জ্ঞানের সীমা, সকল বিষয়েরই সীমা রহিয়াছে; আমরা অপূর্ণ, দুর্ব্বল জীব। সুতরাং আমাদের দুঃখ সম্ভব। কেবল সম্ভব কেন, অবশ্যম্ভাবী।

এস্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে পরমেশ্বর কি আমাদিগকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিতে পারিতেন না? পূর্ণ অথচ সৃষ্ট, ইহা অসম্ভব। ত্রিকোণ বৃত্ত, সোণার পাথর বাটী, তেঁতুলের আমসত্ব যেমন, পূর্ণ অথচ সৃষ্ট পদার্থও সেইরূপ। উহা স্বভাবতঃ অসম্ভব। কালে যাহার সৃষ্টি ও স্থিতি, তাহা অবশ্য কালাধীন হইবে। সুতরাং সৃষ্টপদার্থ পূর্ণ হইতে পারে না। আর এক প্রকারে দেখ। সৃষ্ট পদার্থ হইলেই উহা কার্য্য; কার্য্য হইলেই কারণের অধীন; অধীন হইলেই অপূর্ণ; অপূর্ণ হইলেই অভাববিশিষ্ট, অভাববিশিষ্ট হইলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জীবের দুঃখ স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী। পরমেশ্বরকে তজ্জন্য দায়ী করা অযুক্ত ও অসঙ্গত।

পরমেশ্বর জীবকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্ট করিতে পারেন না, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল। পূর্ণ ও অনন্ত একই কথা। দুই পূর্ণ বা অনন্ত

পুরুষ অসম্ভব। এ বিষয়ে অধিক কথা বলিব না। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট দুই ব্যক্তি সম্ভব কি না ? কখনই না। একজনের শক্তি আর একজনের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কেহই সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না। দুই জন সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ কল্পনা করুন। মনে করুন, উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইল। কাহার জয় হইবে, কে বা হারিবে ? কেহই জয়ী হইতে পারিবে না। কেহই পরাজিত হইবেন না। এক জন আর একজনকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ কেমন করিয়া হইলেন ? সুতরাং এই প্রতিপন্ন হইল যে, উভয়ের মধ্যে কেহই সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। এক জনের শক্তি আর একজনের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতেছে। অনন্ত শক্তি-বিশিষ্ট দুই ব্যক্তি অসম্ভব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সৃষ্ট জীবের পক্ষে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী (necessary)। এস্থলে অনুষঙ্গ ক্রমে আর একটী কথা বলি। জনৈক সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সংশয়বাদী বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেন, তবে তাঁহাকে জগতের কার্য্যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে কেন ? সকল ব্রহ্মাণ্ডে দেখিতে পাই, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার ইচ্ছামাত্র সকলই হইবে। তিনি উপায়ের সাহায্যে উদ্দেশ্য সাধন করিবেন কেন ?

একটু চিন্তা করিলেই এই আপত্তির অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার ইচ্ছামাত্র সকলই হয়। উপায় উদ্দেশ্য উভয়ই তাঁহার ইচ্ছা মাত্র হইয়াছে। তবে উপায় অবলম্বন করিলেন কেন ? তাঁহার নিজের সুবিধা জন্য নহে, আমাদের জন্য। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ; আমরা প্রত্যেক জীব সর্ব্বশক্তিমান্ নহি। ধারণ করিবার জন্য,—কার্য্য করিবার জন্য হস্ত দিয়াছেন ; চলিবার জন্য পদ দিয়াছেন। দেখিবার জন্য চক্ষু, শুনিবার জন্য কর্ণ—ইত্যাদি ইন্দ্রিয় নিচয় দিয়াছেন। আমরা ইচ্ছামাত্র সকল কার্য্য করিতে পারিব না,—আমরা পরিমিত জীব, সেই জন্য তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ উপায় দিয়াছেন। আমরা যে সকল কার্য্য করিব, তাহার উপযোগী উপায় সকল সর্ব্বত্র রাখিয়া দিয়াছেন। দৈহিক কার্য্য করিবার জন্য দৈহিক উপায় দিয়াছেন। কিন্তু এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড সংগঠনে উপায়ের সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কেন ? উহা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর নিজের জন্য করেন নাই। উহাও আমাদের জন্য করিয়াছেন। যদি কার্য্য কারণ সম্বন্ধ,—উপায় ও উদ্দেশ্যের প্রণালীতে ব্রহ্মাণ্ড সংগঠিত না হইত, তাহা হইলে এজগতের তাৎপর্য্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কার্য্যকারণসম্বন্ধরূপ শৃঙ্খল ধরিয়া, উপায় ও উদ্দেশ্যরূপ পথ দিয়া আমরা সৃষ্টি কার্য্যের তাৎপর্য্যে উপনীত হই। এই কার্য্যকারণসম্বন্ধ,—উপায় ও উদ্দেশ্য, আছে বলিয়াই বিজ্ঞান-সম্ভব হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর নিজের জন্য এসব করেন নাই। আমাদের জন্য,—আমাদের শিক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছেন। এপ্রকার না করিলে জগৎ কার্য্যের জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে

অসম্ভব হইত। তিনি সর্বশক্তিমান্ হইলেন তাহাতে কি? আমরা প্রত্যেকে ত এক এক ঈশ্বর নহি। আমরা পরিমিত ক্ষুদ্র জীব। সুতরাং আমাদের কার্য্যের জন্য, উন্নতির জন্য, দেহ ও মনের মধ্যে তাহার উপযুক্ত উপায় সকল বিধান করিয়াছেন, এবং সৃষ্টি কার্য্যে কৌশলজাল বিস্তার করিয়া, কার্য্য কারণসম্বন্ধ,—উপায় ও উদ্দেশ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদের জ্ঞানোন্নতির পথ প্রমুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। সৃষ্ট জীবের পক্ষে দুঃখ অবশ্য স্থায়ী। পরমেশ্বর তজ্জন্য দায়ী হইতে পারেন না। তবে তিনি আমাদিগকে উন্নতিশীল করিতে পারেন। তাহা তিনি করিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার দয়া প্রকাশ পাইতেছে।

পরমেশ্বর যে দয়াময়, ইহা বুঝিতে বা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলে, জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারি না। এমন অনেক দুঃখ যন্ত্রণা আছে, ঈশ্বর তাঁহার বিধান কেন করিলেন বুঝিতে পারি না। বিশেষ বিশেষ স্থল সকল বুঝিতে না পারিলেও, একটী তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি যে, সমগ্র জগতের গতি মঙ্গলের দিকে। জগতে এমন অনেক দুঃখ যন্ত্রণা দেখিতেছি, যাহার মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র হৃদয় তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি,—সকল বিজ্ঞান শতকণ্ঠে ইহা প্রচার করিতেছে যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিরন্তর মঙ্গলের দিকে ধাবমান্ হইতেছে।

প্রথমতঃ মানবজাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা কর। জনৈক পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন যে, মানবজাতির ইতিহাসে মঙ্গলের কখন বিনাশ হয় নাই।* যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু হিতকর, তাহা কখনই চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইতে পারে না। সত্যের জয়, মঙ্গলের জয় পরিণামে হইবেই হইবে। অতীতসাক্ষী ইতিহাস একথা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, মানবজাতির ইতিহাস যে জ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিতেছে, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? প্রাচীন গ্রীস্, রোম্, ও ভারতের অবস্থা আলোচনা করিলে কি যথার্থই বলা যায় যে, মানবজাতি ক্রমোন্নতি পথে ধাবিত হইতেছে? প্রাচীন ভারত, গ্রীস্, রোম এখন কোথায়? তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিয়া কেমন করিয়া বলিব যে, ইতিহাস মানবজাতির ক্রমোন্নতি পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে? ভারত, মিশর, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের শোচনীয় অবনতি সত্ত্বেও ইহা বলিতে হইবে যে, সমগ্র মনুষ্যজাতি গড়ে ক্রমোন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতি পর্য্যালোচনা করিলে কি ইহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না? ইউরোপ ও আমেরিকায় জ্ঞান ও সভ্যতার যেরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি দেখিতেছি, তাহাতে ইহা অসঙ্কোচে বলিতে হয় যে, গ্রীস্ ভারত প্রভৃতি দেশের অবনতি সত্ত্বেও পৃথিবী গড়ের উপরে উন্নতি পথে দৌড়িতেছে।

প্রাচীন ভারত, প্রাচীন গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে যে কোন বিষয়ে, যাহা কিছু ভাল

* "In the History of mankind nothing good has ever failed."

ছিল, তাহা কি জগতের পক্ষে নষ্ট হইয়া গিয়াছে? কখনই না। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ সমাদরের সহিত ইয়োরোপে অনুবাদিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন দর্শন, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় সমাদৃত হইতেছে। ইংলণ্ড, জর্ম্মেনি, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে সংস্কৃতের সমাদর হইয়াছে। উক্ত দেশবাসিগণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া ভারতের প্রাচীন গৌরব সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছেন। গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতবাসী কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহাও জ্ঞানালোকসমুজ্জল ইয়োরোপ ও মার্কিন দেশে প্রকাশিত হইতেছে। আর প্রাচীন ভারতে যে আশ্চর্য্য ধর্ম্মোন্নতি হইয়াছিল, তাহার বিষয় জ্ঞাত হইয়া সুসভ্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ অবাক্ হইতেছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা যে সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন ভারতের গৌরব বর্ত্তমান সময়ে উজ্জল স্বর্ণাক্ষরে সুসভ্য জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র, ইউরোপীয় ভাষা সকলে অনুবাদিত হইয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছে। প্রাচীন ঋষিগণ যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা জগতের পক্ষে বিলুপ্ত হইবার নহে। ভারতের অবনতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতে যাহা কিছু ভাল ছিল, তাহা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। গ্রীস্ ও রোমের অবনতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু গ্রীস্ ও রোমে যাহা কিছু ভাল ছিল, তাহা সুসভ্য জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রীস্ ও রোমে যাহা কিছু ভাল ছিল, তাহা সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা ভোগ করিতেছে। কিন্তু ভারত, গ্রীস্, রোম কি আবার উন্নতি পথে ধাবিত হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে। এখনই তাহার চিহ্ন সকল লক্ষিত হইতেছে। এখনই ঐ সকল প্রাচীন দেশে নব জীবনের সঞ্চার দেখিতেছি। ভাবী ভারত, জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মভাবে প্রাচীন ভারতকেও পরাস্ত করিবে। গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। ইহা একটী অমূলক আশা নহে। বিজ্ঞান এই আশার ভিত্তিমূল প্রদর্শন করিতেছে।

বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম (Law of evolution) আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, সমগ্র জগৎ ক্রমোন্নতি পথে চিরদিন ধাবমান। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের তত্ত্ব বা নিয়ম (The law of natural selection) যাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে দুঃখ যন্ত্রণা, দুর্ব্বলতা, অস্বাস্থ্য, নির্ব্বুদ্ধিতা ও কদর্য্যতা নষ্ট হইয়া প্রকৃতি ক্রমশঃ সুখ, সবলতা, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের দিকে দৌড়িতেছে। জীব সকল যে স্ত্রী ও পুরুষ জাতিতে বিভক্ত, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত যে স্বাভাবিক নিয়মে মিলিত হইতেছে, তদ্দ্বারা জগতে চিরদিন অবিরল ভাবে জীব স্রোতঃ প্রবাহিত। সৌন্দর্য্য, বল ও স্বাস্থ্য দেখিয়া জীব নিচয়ের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়। যে অধিকতর সৌন্দর্য্য, বল ও স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছে, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় নির্ব্বাচনক্রিয়ায় তাহারই নির্ব্বাচিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ সবল প্রাণীর মধ্যে, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় নির্ব্বাচনে এই

একটী বিশেষ তত্ত্ব বিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় নির্ব্বাচনের নিয়মে (The law of sexual selection) বল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য লক্ষিত হয়; অর্থাৎ যে প্রাণী অধিকতর বল-শালী, সুস্থ ও সুন্দর, সে অধিকতর সহজে তাহার সহচর বা সহচরী লাভ করিবে, ইহাই প্রকৃতির ক্রিয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির গতি বল, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের দিকে। বৈজ্ঞানিকগণ অখণ্ড-নীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সন্তান সাধারণতঃ পিতৃ মাতৃ গুণ ও শক্তির উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং বংশপরম্পরায় বল, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের ক্রমোন্নতি হইতেছে। প্রকৃতি গূঢ় কৌশলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মদ্বারা অর্থাৎ দুর্ব্বলতা, অস্বাস্থ্য ও কদর্য্যতা পরি-হার পূর্ব্বক বল, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অভি মুখে জগৎকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। জগতে, বহু যুগে, বহু বংশপরম্পরায়, বল, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের ক্রমোন্নতি হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ইহা অসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছে। রুগ্ন ও দুর্ব্বলের বংশ থাকে না। সুস্থ ও সবল প্রাণীর বংশ রক্ষা হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য ও বল জগতে স্থায়ী ও উন্নতি-শীল। নির্ব্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞান হারিয়া যাই-তেছে; বুদ্ধি ও জ্ঞান জয়যুক্ত হইতেছে। প্রকৃতি বাছিয়া বাছিয়া যাহা কিছু ভাল, তাহা রক্ষা করিতেছেন; যাহা মন্দ, ক্রমে ক্রমে সুকৌশলে তাহা অদৃশ্য করিয়া দিতে-ছেন। কিন্তু প্রকৃতি কি? নিরীশ্বরবাদ বা বিজ্ঞানের ভাষায় যাহা প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক শক্তি, ধর্ম্মের ভাষায় তাহাই ঈশ্বর বা ঐশীশক্তি। প্রকৃতি অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর জগৎকে ক্রমশঃ উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। জগৎ স্বাস্থ্য, বল, সৌন্দর্য্য বুদ্ধি, জ্ঞান, সুখ, এক কথায়, মঙ্গলের দিকে চিরদিন ধাবমান। জগৎ সম্বন্ধে ইহাই বিধাতার চিরবিধান। জগৎ ক্রমাগত মঙ্গলের দিকে দৌড়িতেছে। (১)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

উপনিষদঃ। *

বাবু সীতানাথ দত্ত বেদান্তদর্শন সুন্দর রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। বেদান্তের মূল সূত্র উপনিষদে পাওয়া যায়। উপনিষদে যাহা ছায়ার ন্যায় শাসনের বহির্ভূত অথচ সহচরীর ন্যায় নিত্য অনুবর্ত্তিনী আর্য্য ধী শক্তির যৌবন-সুলভ তেজস্বীতার যে কূট প্রশ্নের অসংযত মীমাংসা, বাদরায়ণ তাহাই সংযত সীমাবদ্ধ করিয়া বেদান্তদর্শনে গ্রথিত করিয়াছিলেন। বেদান্ত-সূত্র বেদান্তদর্শনের

(১) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তত্ত্ব এস্থলে বিস্তৃতরূপে পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যাত হওয়া সম্ভব নহে। উহা বর্ত্তমান শতাব্দীর একটী অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। জগৎ যে ক্রমশঃ মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতেছে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এ স্থলে উক্ত তত্ত্বের আভাস মাত্র দেওয়া হইল। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য ওয়ালেস্ প্রভৃতি সুপ্র-সিদ্ধ পণ্ডিতগণ সুবিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্ঞান-পিপাসু পাঠক উক্ত গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া এই প্রয়ো-জনীয় বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারেন।

* অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য, এই ছয়খানি উপনিষদ বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত "শঙ্কর কৃপা" নাম্নী টীকা ও "প্রবোধক নামক বঙ্গানুবাদ সহিত" মূল্য ১, ২১০/৩/২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, প্রাপ্তব্য।

প্রাচীন, বৌদ্ধদর্শনের প্রাচীন, উপনিষদ যুগে তাহার আরম্ভ। আচার্য্য সেনা বিচক্ষণ গবেষণার সহিত সম্প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ তিনশত বৎসরের পূর্ব্বতন নহে। এখন ভারতবর্ষে অষ্টোত্তর শত উপনিষদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। দর্শনশাস্ত্রের ইতিবৃত্তে তাহাদের উপযোগিতা সামান্য। কিন্তু সীতানাথ বাবু যে ছয়খানি উপনিষদ টীকা ও অনুবাদ সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাদের কোন কোন খানি বৈদিক ভাষায় লিখিত। তাহারাই বাদরায়ণের পূর্ব্বতন, শাক্যসিংহ ও পাণিনী একদিন সেগুলি পাঠ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অনেকস্থলে বুদ্ধি বলে স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা সংযোজিত করিয়া উপনিষদের সরল অর্থ দুরূহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষ্যের অনেক কথা সাধারণ পাঠকের সুবোধ্য বা আবশ্যক নহে, আবার কোথাও কোথাও তাঁহার ভাষ্য ভিন্ন মূল সূত্র আদৌ বোধগম্য হয় না। এজন্য শঙ্করভাষ্য অবলম্বন করিয়া সীতানাথ বাবু অতি সুখবোধ্য শঙ্করকৃপা নামে একটী নূতন টীকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ যথাযথ এবং এমন সরলভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, যাঁহারা কিছুমাত্র সংস্কৃত না জানেন, তাঁহারাও উপনিষদের মতামত সহজে বুঝিতে পারিবেন। এই অনুবাদে ভট্ট মোক্ষমুলর সীতানাথ বাবুকে অসামান্য সাহায্য করিয়াছেন বোধ হইল।

উপনিষদ সন্ন্যাসীর অবলম্বন। যাহারা মনে করেন, অকৃষ্ণ আর্য্যক্ষেত্রে ইহাদের উৎপত্তি, অসভ্যাবস্থার ধুলি কর্দ্দমে ইহারা কলঙ্কিত, মাংসাশী ব্যাধ-জীবনের মৃগয়াসঙ্গীতে উপনিষদ পরিপূর্ণ, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। সে সময়ে আর্য্য সমাজে প্রকৃত সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যে সময়ে বশিষ্ঠ ও গৌতম, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া আর্য্য সমাজের ব্যবস্থা বিধান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে উপনিষদ সকল রচিত হইয়াছিল। বহুকাল মুখে মুখে থাকাতে একই উপনিষদ ভিন্ন ভিন্ন শাখার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কিছু রূপান্তরলাভ করিয়াছিল। ঐতরেয়, তলবকার প্রভৃতি উপনিষদ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায়, ইহারা আরণ্যকদিগেরও পূর্ব্বতন।

বিদেশী ও বিধর্ম্মীদিগের মধ্যেও উপনিষদের সম্মান অসামান্য। সাহজাহার পুত্র দারাসুকো বারাণসী হইতে পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে বসিয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশখানি উপনিষদ পারস্য ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। আঁকেটী ডুপেরোঁ নামে এক ফরাসী পণ্ডিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এই পারসী উপনিষদ লাটিন ভাষায় অনুবাদিত করেন। য়ুরোপে উপনিষদের প্রচার এই লাটিন অনুবাদ হইতে। রাজা রামমোহন রায়ের অনুবাদ অধুনা য়ুরোপে আদৃত হইতেছে। য়ুরোপীয় দার্শনিক মণ্ডলে সুপনারের প্রভাব অদ্বিতীয়। শ্লেগেল প্রভৃতি অনেকেই উপনিষদের সুখ্যাতি করিয়াছেন। কিন্তু সুপনারের মত পাশ্চাত্য কোন পণ্ডিত এমন মন খুলিয়া সুখ্যাতি করিতে পারেন নাই। সুপনার বলেন "It has been the solace of my life. It will be the solace of my death." তিনি আরো বলেন, ব্রুনো, মালিব্রাঁস, স্পিনোজা, য়ুরোপে যে

অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ তাহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। বৈদিক দুরূহ ভাষায় রচিত বলিয়া বাঙ্গালার সাধারণ পাঠকের নিকট উপনিষদের তাদৃশ আদর হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা অনুবাদ যথার্থ হইলেও তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল নহে। বাবু মহেশচন্দ্র পালের প্রচারিত অনুবাদে অনেক কাল্পনিক অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করভাষ্যের উপর অযথা নির্ভর করাতে তাঁহার অনুবাদের এই দোষ ঘটিয়াছে। বাবু সীতানাথ দত্তের অনুবাদে পাঠকেরা সুখে উপনিষদের গভীর অর্থ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। ইহাতে মূলটীকা ও অনুবাদ সকলি আছে।

রাজা রামমোহন রায়ের ও সীতানাথ বাবুর অনুবাদে কত ভিন্নতা, এই দুইটী অনুবাদ হইতে পাঠক তুলনা করিবেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১॥
ঈশোপনিষৎ

জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, সে সমুদায়কে পরমাত্মা-দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে (অর্থাৎ সমস্তই পরমাত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে)। এইরূপ বিষয়াসক্তিত্যাগ বুদ্ধি দ্বারা (পরমাত্মাকে) সম্ভোগ কর; কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।—সীতানাথ দত্ত।

পরমেশ্বরের চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামরূপ বিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে, সে সকলকে আচ্ছাদন করিবেক অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নামরূপ বিশিষ্ট বস্তু সকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে এমত জ্ঞান করিবেক যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপনার ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না।

রামমোহন রায়।

সীতানাথ বাবুর অনুবাদ যে রাজা রামমোহন রায়ের অনুবাদ অপেক্ষা প্রাঞ্জল, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সীতানাথ বাবু বলেন যে, তিনি আপনার মত গোপন করিয়া কেবল যথাযথ শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এ কথাটী কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। মানুষের প্রকৃতি অজ্ঞাতসারে তাহার বুঝিবার শক্তি শাসিত করে, কেহ আপনাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যিনি যত নিরপেক্ষ ভাবে বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করুন না কেন, প্রকৃতির নিকট তাঁহাকে পরাস্ত হইতেই হইবে। মানব প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তন অনুসারে ভাষারও প্রকৃতি বিবর্ত্তিত হয়। প্রাচীন ঋষিগণের প্রকৃতি না পাইলে তাঁহাদের ভাষা না পাইলে, তাঁহাদের ভাব বুঝা বা বুঝান উভয়ই দুরূহ। সকল অনুবাদককে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। আবার অনুবাদ সাধারণের বোধগম্য করিতে অনেক শব্দ উহ্য করিতে হয়, নূতন শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, যাহা মূলে নাই। রাজা রামমোহন রায় এজন্য শঙ্করের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কত নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত অনুবাদে দেখিতে পাওয়া যাইবে। যথাযথ অনুবাদের চেষ্টা করিয়া সীতানাথ বাবু নূতন শব্দের প্রয়োগ সঙ্কোচ করিয়াছেন, তথাপি কত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমাদের এই অনুবাদ হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

জগতে যাহা কিছু জগৎ, ইহা সকলই ঈশ দ্বারা ব্যাপ্ত। সন্ন্যাসী দ্বারা ভুঞ্জন হয়। কাহারও ধনে লোভ করিও না।

কিন্তু এরূপ অনুবাদ মূলের ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। এজন্য সীতানাথ বাবুকে

বাধ্য হইয়া নূতন শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যথেষ্ট সাবধান না হইলে এরূপ শব্দ প্রয়োগে অর্থের বিকৃতি ঘটে। সীতানাথ বাবু লিখিয়াছেন "জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে"—এখানে বস্তু অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল, ইহাতে অদ্বৈতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল। এই বিপদ নিরাকরণের জন্য রাজা বাহাদুর আপন অনুবাদে "মায়িক বস্তু" প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিপদ সম্পূর্ণ কাটে না। যাহার সত্তা আছে, তাহা বস্তু, বস্তু অর্থে স্থিরতা বুঝায়, কিন্তু মূলে আছে জগৎ অর্থাৎ যাহা অস্থির, গমনশীল, প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চের ভিতরে প্রপঞ্চে মায়ার মরিচীকা, সংসারের সকলি মায়ার মরিচীকা, তথাপি ঈশা দ্বারা সে সকল বাস্য। মূলে ঈশ আছে, সীতানাথ বাবু তাহার অর্থ পরমাত্মা ও রাজা বাহাদুর পরমেশ্বর লিখিয়াছেন। পরমেশ্বর বলিলেই সগুণত্ব প্রতিপাদন করা হয়। এজন্য বোধ হয় সীতানাথ বাবু পরমাত্মা লিখিয়াছেন।

কিন্তু পরমাত্মা বলিলেই জীবাত্মার অধ্যাস করা হয়, অদ্বৈতবাদে পুনরায় আঘাত লাগে। হয়ত কেবল আত্মা লিখিলেই ভাল হইত। অতঃপর বাস্য শব্দের আচ্ছাদনীয় অর্থ করা হইয়াছে। যেমন বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন, কিন্তু বস্ত্র ও মুখ, দুইয়ের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব আছে। জগতের বস্তুত্ব নাই। তবে জগৎ ঈশা দ্বারা কিরূপে আচ্ছাদন করা যাইবে? আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়ীভূত অবলম্বন করিয়া লইলে অদ্বৈতবাদ রক্ষা পাইত। মায়াময় প্রপঞ্চের আশ্রয় ঈশ, এরূপ অর্থেও আপত্তি হয়। আশ্রয় শব্দ প্রয়োগ করিলেও বস্তুত্বের অধ্যাস হয়, আত্মা ভিন্ন আর কিছু আছে বলিবার পথ নাই। আত্মা কেবল কেবল নহে। অপাদান, অধিকরণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, করণ আত্মা সকলই। আত্মার উপকরণে আত্মা দ্বারা আত্মা আত্মাকে আত্মাতে অবস্থিতি করিয়াছে। ভাষা পরাস্ত হয়, বিশেষণ লিঙ্গ কারক সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া যাহা একমাত্র সৎ, নির্গুণ, রূপে পরিণত হইয়াছে, নামরূপের অতীত যাহাকে সৎ বলিলেও সগুণত্ব প্রতিপালিত হয়, তাহার পক্ষে কোন্ ভাষা প্রযুজ্য? স্বয়ং আচার্য্য অদ্বৈতত্ব রক্ষা করিতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। কোন ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ হইতে পারে না। তবে ভাষার যাহা সাধ্য, সীতানাথ বাবু তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। এবং সাধারণ পাঠককে বলিতেছি, যদি উপনিষদের মর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষ থাকে, সীতানাথ বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। ভট্ট মোক্ষমোলরের অনুবাদ আরো কত খারাপ হইয়াছে পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন—

"All this, whatever moves on earth, is to be hidden in the Lord (the Self). When thou hast surrendered all this, then thou mayst enjoy. Do not covet the wealth of any man."

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

নরনারী।

(সেক্সপীয়র, শেলি এবং ডেন্টি হইতে
অনুবাদিত।)

নর।

(নারীর উক্তি)

ভালবাসা-লভিবারে
নর যেন ফাল্গুনের বায়,
হাত দুটি বাঁধা হলে
নর যেন শ্রাবণের প্রায়।

নারী।

(নরের উক্তি)

ধীরে আসে দ্রুত যায়,
বিবাহ 'বাসর'
ধীরে আসে দ্রুত যায়,
যৌবন সুন্দর;
ধীরে আসে দ্রুত যায়,
বাসন্তী সমীর;
দ্রুততর আসে যায়
প্রেম রমণীর!

প্রেম।

নরের উক্তি।

বসন্ত অতীতে
যেমন মেদিনী;
তপন বিহীন
যেমন যামিনী;
সুধাংশু যেমন
অমর হিমানী;
তেমনি ভুবন
বিহীন রমণী।

নারীর উক্তি।

দীপাধার ভেঙ্গে গেলে,
দীপ নিভে ভূমিতে গড়ায়;
মেঘ শুন্যে ছাড়া হলে,
ইন্দ্রধনু মাধুরী হারায়।
বাঁশীটি ভাঙ্গিয়া গেলে,
স্বরস্মৃতি কোথা চলে যায়;
প্রেমের প্রদীপ হলে জ্যোতিঃহীন,
জীবন-সমাধি মাঝে রমণী লুকায়।

শ্রীশশাঙ্ককুমার ঘোষ।

উৎকণ্ঠা।

(১)

জীবন সূর্য্যের ভাতি,
কেন জ্বলে অকারণ?
এই আছে এই নাই—
নিবিতেছে প্রতিক্ষণ!

(২)

আঁধিয়ায় ডুবে রবি,
আলো লয়ে আসে ফিরে,
অন্ধকার, যায় চলি,
আঁধারের কোন্ তীরে।

(৩)

আঁধারে আলোক ছায়,
আলো আলো ফিরে পায়,
জীবন কি নিজ ভাতি,
নাহি পায় পুনরায়?

(৪)

শিশু নন্দনের ফুল,
পুলকিত কলেবর,
কোথা হতে হেথা আসে,
মাখিয়া চাঁদের কর!

(৫)

শিশু আসে—ল'য়ে আসে,
স্বর্গের করুণা মায়া,
সন্তান নিরখি মাতা,
সুখে হন মাতোয়ারা।

(৬)

যে জীবন যায় চলি
তা'ই কি আবার আসে?
আসে যদি তবে কেন,
দুঃখের সলিলে ভাসে?

(৭)

এখানে যে যত প্রাণ
স্বজন ছাড়িয়া যায়,
আসে কি নবীন প্রাণ,
ছাড়ি কারো মমতায়?

(৮)

এসেছি যাদের ছেড়ে,
কোথা আপনার তারা?
পেয়েছি যাদের কাছে,
নাহি জানি কে তাহারা!

(৯)

আমারে জানে না তবু
আমারে পাইতে চায়,
যাইতে সরে না মন,
তবু কে লইয়া যায়!

(১০)

আপনার হ'য়ে কায়,
হইব আবার পর,
কত জন্ম মৃত্যু ল'য়ে,
ঘুরিব এ চরাচর!

(১১)

কোথা অদৃষ্টের ভাষা,
কোথা অনন্তের গান!
দিক্ ভ্রষ্ট নাহি দেখ,
হয় এ ব্যাকুল প্রাণ।

(১২)

অদৃষ্টের কর্ম্ম হেতু,
তবে কি জীবন হবে?
অথবা জীবন কর্ম্ম,
হেতু অদৃষ্টেতে রবে?

(১৩)

অবিবেকী বিবেকের
পাপ পুণ্য নির্দ্ধারণ,
মীমাংসায় বদ্ধতা,—
প্রমাদের প্রচারণ;

(১৪)

পাপ পুণ্য নানা কথা,
এতো দেখি লোক যায়,
অক্ষর কল্পনা করা
সমুদয় পরমাণ।

(১৫)

তবু যেন মনে হয়,
জীবনের পর পারে,
যার তরে আকুলতা,
দেখিতে পাইব তারে।

শ্রীবনোয়ারীলাল গোস্বামী।

একটী মুহূর্ত।

বুঝিব বুঝিব করি' জীবন হইল গত,
বুঝিতে নারিনু কিছু বুঝিবার ছিল যত!
কি যে নয়, কি যে মায়া স্নেহ আশা মানুষের,
কিসেতে জনম তার কিসেতে বিলয় ফের,
বুঝিতে যতন করি বুঝিতে পারিনে কিছু;
যত হই অগ্রসর তত তারা রহে পিছু!
নিতুই নূতন ল'য়ে বাঁধি এই ভাঙ্গা বুক,
আশায় আশ্বাস-বাণী কেবল বাড়ায় দুঃখ!

পথে যেতে যেতে, হায়, কত দেখি কত পাই,
আগে স্মৃতি, পরে অশ্রু, শেষে দেখি তা'ও নাই।
তার পর কোন মতে কেটে যায় বাকী দিন,
জগতের ধূলি-কণা সেই সে ধূলায় লীন!
পাষাণ-পাষাণে যেই করিত না দৃকপাত,
একটি মুহূর্ত্ত-ভারে, হায়, সেই ভূমিসাৎ।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দু'টি মেঘ।

১

দুই ধার হ'তে দুটি
মেঘ ভেসে আসে,
ছুটিয়া, দোহার দে'হে
মিলনের আশে।

২

দুজনেই বিচলিত
শিহরে মধুর,
সত্বর মিলিত হবে—
বিরহ বিধুর।

৩

কে ছাড়িবে আহা হেন
প্রণয় সুযোগ ;—
তিলেক সহেনা যেন
বিরহ—বিয়োগ।

৪

ধায় দোঁহে দোঁহাপানে
হ'য়ে মোহময়,
মিলনের মধুপানে
বিলম্ব না সয়।

৫

ওরে দেখিছে চেয়ে—
দিঠি অনিমেষ,
অশ্রুবিন্দু বেয়ে পড়ে—
কি সুখ আবেশ!

৬

নিয়ে কুসুমের দল
মৃদু মৃদু হাসে,
কহে যেন "দুটি প্রাণ
এত ভালবাসে।"

৭

কহে দিগঙ্গনা সবে
দেখে' প্রেম সেই,
"কে জানে কাহার হবে
কে পর ক্ষণেই।"

৮

মহান্ আকাশ হেরে
প্রশস্ত হৃদয়,
কহে বিমুগধ দু'টি
প্রণয়ের জয়।"

৯

দূর হ'তে গ্রহতারা
হেরে সে পিরীতি,
কহে "এ বিশ্বের ধারা
ইহা চির রীতি।"

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পর্ব্বত ও সমুদ্র।

যতবার নাম তার এ দণ্ড অবধি
করিয়াছি উচ্চারণ,
প্রতি-এক নামগুলি জড়দেহ ধরি—
বিশদ মর্ম্মর-কান্তি শিলা অগণন,
স্তূপাকার হইয়াছে পর্ব্বত-প্রমাণ,
হেন হয় জ্ঞান।
যেদিন প্রথমে মম-হৃদয়-কাননে,
ভালবাসা-বসন্ত-পবন,
অশ্রুফুল ফুটাইতে আসিত ফাগুনে—

ত্রিদিবের সৌরভ সদন,
সে অবধি যত ফুল পড়েছে ঝরিয়া,
হইয়া তরল,
অই যেন রচিয়াছে সমুদ্র-বিশাল,
তার, তরঙ্গ চুম্বিছে নাম-শৈল-পদতল।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

সরস্বতী। (১)

হে পবিত্রে, অন্নযুক্তে, সুনৃতভাষিণি! (২)
নিরন্ন ভারতে তবে কেন আগমন?
কোথা সেই পবিত্রতা, আদি প্রবাহিণি!
কোথা সেই নৃত-ভাব?—আছে কি এখন?
বাক্‌দেব ব্রাহ্মণস্পতে! বাক্‌দেবি জননি!
তোমাদের ধর্ম্মবাক্ কে শুনে এখন?
প্রকৃতির চারুচিত্রে যে ধর্ম্ম কাহিনী
চিত্রিত—সে মান-চিত্র কে করে দর্শন?
ঐশিক বিভূতি যাহা নিসর্গে প্রকাশ,
অপূর্ব্ব পেশিলে তাহা বেদেই চিত্রিত;
যেখানে যে ধর্ম্ম আছে তাহারি আভাস,
এখন সে মহা গ্রন্থ হেথা উপেক্ষিত!
উপেক্ষিত বেদ, লুপ্ত বৈদিক দেবতা;
কে জানে উষার নাম, পূষার প্রকৃতি?
আছে কি বরুণ রুদ্র ইলা বা সুনৃতা,
সকলি বিলুপ্ত হেথা—কি মহা বিস্মৃতি!

জানে কি হিন্দুরা আজ হিন্দু দেবগণ?
যা জানে তা স্বধর্ম্মের দারুণ বিকৃতি।
চেনে কি তোমার মুখ? তবে কি কারণ
হতভাগ্য দেশে তুমি আসিতেছ সতি?
কি কারণে বৎসরান্তে দেবি একাকিনী
ছদ্মবেশে একবার দাও দরশন।
বলিতে কি বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠে জননি!
কি করে তাঁদের এবে বংশধরগণ?
তাঁহারা ত হর্ষচিত্তে অনার্য্য শূদ্রাসে,
আর্য্যের প্রধান স্থানে করিয়া স্থাপন,
আর্য্যানার্য্য মিশ্র করি অতীব উল্লাসে,
করেছিলা মহাজাতি হিন্দুর সৃজন।
বর্ণ-ভেদ, কর্ম্ম-ভেদ ছিলনা তখন,
নব বলে যুক্তজাতি হ'ত অগ্রসর;
একতার ফল ফুলে আর্য্য নিকেতন,
নন্দন সমান ছিল শোভিত সুন্দর।
গৃহে গৃহে দেবদেবী হতেন পূজিত,
ধর্ম্ম স্বাধীনতা তদা হৃত হয় নাই,
গৃহস্থ যজ্ঞের অগ্নি করি প্রজ্জ্বলিত,
কাম্য পূজা করিতেন দেব দেবী ঠাঁই।
আর আজ জাতি-ভেদ নরক-অনলে,
দগ্ধ হইতেছে হিন্দু জাতি সাধারণ,
ভুলিয়াছে পিতৃধর্ম্ম তাঁহারা সকলে,
ফল তার হইয়াছে ভীষণ পতন!
বীণাযন্ত্রে দেবি! তব কিবা প্রয়োজন?
বসন্তের সুধা হাসি সাজে কি তোমায়?
বৃথা তব মুখরিত নিকুঞ্জকানন!
বৃথা চূতমুকুলেতে মধুপ ঝঙ্কার!
প্রভূত নয়ন জল বর্ষণ উচিত,
কেঁদে কেঁদে বল গিয়া দেবতা সকলে,
যেখানে যজ্ঞের অগ্নি হ'ত প্রজ্জ্বলিত,
পুড়িছে সেখানে হিন্দু অধর্ম্ম-অনলে।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

---

(১) ঋক্‌বেদে সরস্বতী নদী দেবীরূপে পূজিতা হইতেন। এমন ঋক্‌ও আছে, যাহাতে অহ্যাকে নদী ও বাক্‌দেবী উভয়ই বলা হইয়াছে। যথা ১।৩।১২। এই কবিতায় বৈদিক সরস্বতী বর্ণিত হইয়াছেন; পৌরাণিক সরস্বতী নহে।

(২) ঋক্‌বেদের ১ম মণ্ডলের ১০।১১ ঋক্ হইতে এই বিশেষণগুলি গৃহীত।

মগধের রাজবংশ।*

ভারত সংগ্রামের চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে মগধরাজ জরাসন্ধের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সহদেব মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুরুক্ষেত্রে চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে মহাবীর অভিমন্যুর হস্তে মগধপতি সহদেব নিহত হয়েন। সহদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সোমাপি (অপর নাম মার্জ্জারি বা মেঘসন্ধি) মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য পাণ্ডবগণ একমাস কাল নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করতঃ হস্তিনার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের বিংশতি দিবস পরে ভীষ্ম দেহত্যাগ করেন। (অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৮ অঃ।) এই ঘটনার কিছুদিন পরে আত্মীয় স্বজন বধ জন্য পাপ মোচনার্থ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব করেন, ও তৎসম্পাদনার্থ ধন আহরণ জন্য পাণ্ডবগণ হিমালয়ে গমন করেন।

পাণ্ডবগণ হিমালয়ে গমন করিলে, অভিমন্যুর পত্নী বিরাট রাজ দুহিতা উত্তরা (ক) ৭ম মাসে পরীক্ষিতকে প্রসব করেন (আদিপর্ব্ব ৯৫ অধ্যায়)। পরীক্ষিতের জন্মের এক মাস পরে পাণ্ডবগণ হিমালয় হইতে ধন রত্ন গ্রহণ করতঃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (ম, ভা আশ্ব ৭০ অ)। তৎপর চৈত্র মাসীয় পূর্ণিমা দিবস মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েন (অশ্বমেধ ৭২ অঃ) তৎপূর্ব্বেই আশ্বমেধিক অশ্ব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করতঃ হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল।

জরাসন্ধ পৌত্র মগধপতি সোমাপি আশ্বমেধিক অশ্বের গতিরোধ ও অর্জ্জুনের সহিত অতিশয় পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন (১)। অর্জ্জুন অশ্বসহ মগধ রাজ্যে উপস্থিত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন,—"তোমার এই অশ্বকে অবলা জন-রক্ষিত বলিয়া বোধ হইতেছে।" কিন্তু পরিশেষে অর্জ্জুনের হস্তে তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল।

ভারত সংগ্রামের ২৬ বা ৩৬ বৎসর পরে যদুবংশ ধ্বংস হয় (২), ও মহাত্মা বাসুদেব

---

* [illegible] নব্যভারতে প্রকাশের জন্য এই প্রবন্ধ আমরা পাইয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই। ন, স।

(ক) মহাভারতের বর্ণনানুসারে জ্যেষ্ঠ মাসে উত্তরার বিবাহ হয়।

(১) পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন "পুরাবৃত্ত" প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "পরীক্ষিত, জরাসন্ধ পৌত্র অপেক্ষা দ্বাদশ কি দশ বৎসরের বড়; তাহা অসম্ভব নহে।" (জন্মভূমি ২য় ভাগ ১৩ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভ।) আমরা বলি, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পরীক্ষিতের বয়স ৩।৪ মাসের অধিক ছিল না। কিন্তু জরাসন্ধ পৌত্র এ সময়ে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই পরীক্ষিতের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সন্দেহ নাই।

(২) স্ত্রীপর্ব্বের ২৫ অধ্যায়ে ৩৬ (ষট্ ত্রিংশ) বৎসরের উল্লেখ আছে; কিন্তু মৌষল পর্ব্বের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় ২৬ (ষড় বিংশ) বৎসরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বোম্বাই সংস্করণে সর্ব্বত্র ৩৬ বৎসর দৃষ্ট হয়। মাননীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ বলেন, ভারত সমরের ৫৭ বৎসর পরে যদুবংশ ধ্বংস হয় (ভারতী ১২৮৯ সাল ফাল্গুন—পাণ্ডববংশ প্রবন্ধ দেখ)। মহাভারতে

ইহলোক পরিত্যাগ করেন (৪)। কৃষ্ণগত-প্রাণ পাণ্ডবগণও কৃষ্ণ বিরহে সংসার অসার ভাবিয়া পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া মহারাজ পরীক্ষিত ইহলোক পরিত্যাগ করেন (৫)। বিষ্ণুপুরাণে সোমাপি ও তৎপুত্র শ্রুতবান্ বা শ্রুতশ্রবা সহোদর পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়ের সমসাময়িকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বায়ু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণমতে সোমাপি ও তৎপুত্র শ্রুতশ্রবার রাজত্বকাল যথাক্রমে ৫৮ ও ৬৭ বর্ষ। (৬)

পৌরাণিক বর্ণনানুসারে, জরাসন্ধের ২২ পুরুষ অধস্তন রিপুঞ্জয়ের পর মগধরাজ্য প্রদ্যোতবংশীয় নৃপতিগণের অধীনস্থ ও জরাসন্ধের বংশ বিলুপ্ত হয়। এই বংশের আদি পুরুষ বৃহদ্রথের নামানুসারে এই বংশকে 'বার্হদ্রথ বংশ' বলে। বৃহদ্রথ চন্দ্রবংশীয় চেদীশ্বর উপরিচর (ইনি কুরুর অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ) রাজার পুত্র। মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র বৃষভ, তৎপুত্র পুষ্পবান, তৎপুত্র সত্যহিত, (বিষ্ণুপুরাণের মতে সত্যধৃত) তৎপুত্র ঊর্জ্জ তৎপুত্র সম্ভব; সম্ভবের পুত্র জরাসন্ধ। (হরিবংশ ২৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

বার্হদ্রথ বংশের অবশিষ্ট কাল সম্বন্ধে পুরাণে কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ভারত সমরের পর কতদিন উক্ত বংশ

ইহার পোষক প্রমাণ নাই। বরং স্ত্রীপর্ব্বে ও মৌষল পর্ব্বে এই সিদ্ধান্তের বিরোধী উক্তি দৃষ্ট হয়।

(৪) বিষ্ণুপুরাণের ৫।৩৭।১৩ লিখিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শতাধিক বর্ষ (বর্ষাণামধিকং শতং) জীবিত ছিলেন। ইহার টীকায় শ্রীধর স্বামী শ্লোকোক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর ইহলোকে অবস্থান করতঃ বিবিধ লীলা করেন। সম্ভবতঃ আমরাও এই মত ১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "কলিযুগারম্ভ" শীর্ষক প্রবন্ধে (১৪৮পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। মহাভারতীয় দ্রোণপর্ব্বের ১৯২ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, মৃত্যুকালে দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ বৎসর ছিল।

"আকর্ণপলিতঃ শ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ।
রণে পর্য্যচরৎ দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ॥"

দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই দ্রোণাচার্য্য অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, অনুমান করা অসঙ্গত নহে। শ্রীকৃষ্ণ যে যুধিষ্ঠির অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে।

শ্রীধরস্বামীর মতানুসরণ করিয়া যদুবংশ ধ্বংস কালে শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন, স্বীকার করিলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে তাঁহার বয়স (১২৫—২৬ বা ৩৬ =) ৯৯ বা ৮৯ বৎসর ছিল ধরিয়া লইতে হয়। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৯ বৎসর ছিল স্বীকার করিলেও তিনি দ্রোণাচার্য্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়া পড়েন। সুতরাং আমরা শ্রীধরস্বামী ধৃত শ্লোকোক্তির উপর নির্ভর করিতে পারিলাম না।

বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি,এ, বলেন, "ভারতযুদ্ধ সময়ে যুধিষ্ঠিরের বয়স ৯০ বৎসর।" (সাহিত্য-কল্পদ্রুম ২য় বর্ষ, ২৭৭ পৃষ্ঠা, প্রথম খণ্ড।) এ কথা সত্য হইলে তিনি দ্রোণগুরু অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন বলিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, "বর্ষাণাং অধিকং শতং" অর্থাৎ একশত অপেক্ষা কিছু বেশী দিন জীবিত ছিলেন। অর্থ শত পাঁচ বৎসর থাকিলে, ভারতযুদ্ধ কালে তাঁহার [illegible] ৬৯ বৎসর ছিল। ইহা অসঙ্গত নহে। ৬৯ বৎসরই আমাদের অধিক সঙ্গত বোধ হইতেছে। কেন না মৌষলই সংস্করণের সর্ব্বত্র "৩৬ বৎসর পরে যদুবংশ ধ্বংস হয়" এ কথা আছে।

(৫) মহাভারত আদি পর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়ে।
পরিপাল্যো বয়স্তস্য ষষ্টি বর্ষো নরাধিপঃ।
দিষ্টান্তঃ স মহারাজ সর্ব্ব দুঃখকর প্রভুঃ॥"

(৬) মৎস্যপুরাণ অনুসারে শ্রুতশ্রবার রাজত্বকাল ৬৪ বৎসর মাত্র।

মগধে রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণোক্ত বংশতালিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারত সংগ্রামের পর সহস্র বৎসর জরাসন্ধের বংশধরগণ মগধ শাসন করেন। তৎপরে প্রদ্যোত বংশীয় ৫জন নরপতি ১৩৮ বৎসর ও শিশুনাগবংশীয় দশজন ভূপতি ৩৬২ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। ইঁহার পর মহানন্দ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ভারত সংগ্রামের ১০০০+১৩৮+৩৬২= ১৫ শত বৎসর পরে মহারাজ নন্দ আবির্ভূত হয়েন। সুতরাং নন্দ ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে ১৫ শত বৎসরের অন্তর দেখা যাইতেছে।

বিগত ১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "কলিযুগারম্ভ" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে আমি সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করি যে, উক্ত সিদ্ধান্ত পুরাণসম্মত। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১২৯৮ সালের পৌষমাসে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে জন্মভূমিতে "পুরাবৃত্তম্" ইতি শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই বৎসরের মাঘ মাসের "সাহিত্য-কল্পদ্রুম"এ বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। 'জন্মভূমি'তে তর্করত্ন মহাশয় যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও, নন্দ ও যুধিষ্ঠিরের অন্তর কাল সম্বন্ধে কোন মতভেদ ছিল না। তাঁহার যে সকল মত আমার নিকট আপত্তিজনক বোধ হইয়াছিল, তাহার কতকগুলির প্রতিবাদ তৎকালে "হিতবাদী" ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় করিয়াছিলাম। বিগত বৈশাখ মাসের জন্মভূমিতে তর্করত্ন মহাশয় "মাস ও বৎসর" শীর্ষক প্রবন্ধে আমার ও চারুবাবুর প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করেন। তৎপরে বিগত আশ্বিনমাসের নব্যভারতে চারুবাবু উক্ত প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয় "মাস ও বৎসর" প্রবন্ধে চারুবাবুর মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া, তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত আমার 'কলিযুগারম্ভ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার মত চারুবাবুর মতের অনুকূল নহে। এই অপরাধে চারুবাবু নব্যভারতে আমাকে একটু তীব্রভাবে ব্যঙ্গপূর্ণ ও একস্থলে একটু অভদ্র ভাষায় আক্রমণ করেন। চারুবাবুর কথার প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা আমার না থাকিলেও, চারুবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সত্যের অনুরোধে তাহার সমালোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

পুরাণ-বর্ণিত বংশ তালিকা সম্বন্ধে চারুবাবু বলেন,—'এক্ষণে বৃহদ্রথ বংশীয় রাজগণের রাজ্যকাল ১০০০ বৎসর, প্রদ্যোত বংশীয় ১৩৮ বৎসর, শৈশুনাগ বংশের ৩৬২ বৎসর, সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০০ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল। * * * সুতরাং ইতিহাসানভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের যে ইহাতে ভ্রান্তি জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?" নব্যভারত, ২৮৯ পৃষ্ঠা, আশ্বিন।

তার পর ইতিহাস তত্ত্বজ্ঞ চারুবাবু বলিতেছেন,—"আমি দেখাইতে চাই যে, এ প্রশ্নের ঐতিহাসিক মীমাংসাই এই খানে হইবে। যেরূপ ভাবে তর্করত্ন (ও লেখক) মহাশয় এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বৃহদ্রথবংশীয় রাজগণের কাল-নির্ণয় কালে কি বুঝিতে হইবে না যে, বংশের আদি পুরুষ বৃহদ্রথ অন্ততঃ কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন? জরাসন্ধের পৌত্র সোমাপি (অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর) হইতেই ধর্ত্তব্য বুঝিতে হইবে কেন? [illegible]

কয়েক পুরুষ পরে বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজগণের রাজ্যারম্ভ? বাস্তবিক জরাসন্ধ ও যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ব হইতেই এই বংশ রাজত্ব করিতেছিল। সুতরাং পরীক্ষিতের সমসাময়িক সোমাপি হইতে সহস্র বৎসরের ভুক্তাবশিষ্ট কয়েক শত বৎসরই ধরিতে হইবে না কি? সে মাপের পরে যে ১৮ জন (প্রকৃতপক্ষে ২০ জন) রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজ্যকাল মোট ৫।৬ শত বৎসরের অধিক নহে। * * * এক্ষণে এই ৬ শত, প্রদ্যোত বংশীয়দিগের ১৩৮ ও শৈশুনাগদিগের ৩৬২ বৎসর যোগ করিলে, প্রায় এগার শতই হয়; * * * অতঃপর তর্করত্ন মহাশয় বুঝিবেন, এ কথার অবতারণায় যুক্তি আছে কি না? নিজে তলাইয়া বুঝিবেন না, অথচ বলিবেন,--আমি চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছি—এ কথার উত্তর আমি দিতে চাহি না। কিন্তু পাঠকমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন, এ তর্ক কোন কাজের কি না?" নব্যভারত, আশ্বিন, ২৮৯।৯০ পৃষ্ঠা।

[বন্ধনীর মধ্যগত কথাগুলি প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সংযোজিত—চারুবাবুর নহে।]

চারুবাবুর "এ তর্ক—এ ঐতিহাসিক মীমাংসা কোনও কাজের কি না? ও স্বীয় মত বজায় রাখিবার জন্য তিনি "চাতুর্য্য প্রকাশ" করিয়াছেন কি না, তাহা বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ আলোচনা করিলেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং প্রথমে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। বিষ্ণু পুরাণের ৪র্থ অংশের ২৩ অধ্যায়ে বার্হদ্রথ বংশের রাজত্ব কাল কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভ এইরূপ,—

"পরাশর উবাচ। মাগধানাং বার্হদ্রথানাং ভবিষ্যাণাং অনুক্রমং কথয়ামি ॥১॥ অত্র হি বংশে মহাবলা জরাসন্ধ-প্রধানাঃ বভূবুঃ ॥২॥ জরাসন্ধ-সুতাৎ সোমাপিঃ তস্মাৎ শ্রুতবান্, * * ভবিষ্যতি। ইত্যাদি।"

অনুবাদ;—পরাশর কহিলেন, বৃহদ্রথ বংশীয় ভবিষ্যৎ মগধাধিপতিগণের অনুক্রম কহিতেছি ॥১॥ এই বংশে মহাবল সম্পন্ন জরাসন্ধ প্রভৃতি নরপতিগণই প্রধান ছিলেন ॥২॥ জরাসন্ধ পুত্র (সহদেব) হইতে সোমাপি ও সোমাপি হইতে শ্রুতবান্ জন্মগ্রহণ করিবে। ইত্যাদি।"

এখানে দেখিতেছি, বিষ্ণু পুরাণের, এই অধ্যায়ে বৃহদ্রথ বংশীয় যে ভবিষ্যৎ ভূপালগণের কথা বলা হইয়াছে, জরাসন্ধ পৌত্র সোমাপি (যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন) তাঁহাদের প্রথম। তারপর এই অধ্যায়ের উপসংহার এইরূপে করা হইয়াছে; যথা,—

"তস্যাপি রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ; ইত্যেতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি ॥৩॥"

অনুবাদ—তৎপুত্র (বিশ্বজিতের পুত্র) রিপুঞ্জয়; এই বার্হদ্রথ নৃপতিগণ এক সহস্র বর্ষ রাজত্ব করিবেন।"

এই প্রমাণে জানা গেল, এই অধ্যায় বর্ণিত নৃপতিগণ, যাঁহারা ভবিষ্যতে রাজ্য করিবেন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং সোমাপি যাহাদের প্রথম ও রিপুঞ্জয় শেষ নরপতি, তাঁহারা সহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। সোমাপির পূর্ব্ববর্ত্তী বৃহদ্রথ বংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যকাল এই সহস্র বৎসরের অন্তর্ভুক্ত নহে। বিষ্ণু পুরাণকারের মতে বৃহদ্রথবংশীয়গণের স্থিতিকাল সহস্র বৎসর নহে—উক্ত বংশের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ জরাসন্ধ পুত্র সহদেবের পরবর্ত্তী নৃপতিগণেরই রাজ্যকালের সমষ্টি সহস্র বৎসর। কেন না, এই অধ্যায়ে কেবল "ভবিষ্যৎ" নরপতিগণের কথাই বলা হইয়াছে, প্রাচীন ভূপতিগণের বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়,—

"অথ মাগধ রাজানো ভাবিনো যে বদামি তে।
ভবিতা সহদেবস্য মার্জ্জারি যৎ শ্রুতশ্রবাঃ।"

* * * *

* * বিশ্বজিৎ বৎ রিপুঞ্জয়ঃ ।

বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্র বৎসরং ॥"

— স্কন্ধ ২২ অধ্যায়

শ্রীধর স্বামী কৃত টীকোপসংহার,— 'সহস্র সংবৎসর-মেতে ভাব্যাঃ ভূপালাঃ ; ততঃপরং ভাব্যান্ দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যতি ।'

অনুবাদ,—অতঃপর ভবিষ্যতে যাঁহারা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি । সহদেবের মার্জ্জারি অপর (নাম সোমাপি) নামে এক পুত্র হইবে । তৎপুত্র শ্রুতশ্রবা (বা শ্রুতবান্)। * * * বিশ্বজিতের পুত্র রিপুঞ্জয়। বার্হদ্রথ বংশীয় ভবিষ্যৎ ভূপালগণ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবেন ।"

এখানে "ভাবিনঃ" ও "ভাব্যাঃ" পদ প্রযুক্ত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই অধ্যায়ে যে ভবিষ্যৎ নৃপতিগণের নাম কীর্তন করা হইয়াছে কেবল তাঁহাদেরই রাজত্বকাল সহস্র বৎসর। সুতরাং সোমাপির পূর্ব্ববর্ত্তী নয় জন নরপতির রাজত্ব কালকে এই সহস্র বৎসরের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক। চারুবাবু যদি বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের বচনগুলি একটু "তলাইয়া" বুঝিতে চেষ্টা করেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার "ঐতিহাসিক মীমাংসা"টী পুরাণকারের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। শ্রীধরস্বামীও এরূপ মীমাংসা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—বৃহদ্রথ-বংশীয় ভবিষ্যৎ ভূপালগণ সহস্র বৎসর মগধ শাসন করিবেন।" কিন্তু পুরাণজ্ঞ "শ্রীধরস্বামী যাহা বলিতে সাহসী হন নাই" চারুবাবু "তাহা অবাধে বলিয়া গেলেন ! যদি তাঁহার" পৌরাণিক "ইতিহাস জ্ঞান না থাকিত, * * তাহা হইলে সহসা এ কথা বলিবার অগ্রে তাঁহাকে একটু বিশেষ ভাবিতে হইত। বিচারকালে পৌরাণিক মত দিবার চেষ্টা বাহাদুরী বটে !"

বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণে বার্হদ্রথ নৃপতিগণের প্রত্যেকের নামও রাজত্বকাল পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় সহস্র বৎসর পরে বার্হদ্রথ বংশ বিলুপ্ত হয়। চারুবাবুর অবগতির জন্য নিম্নে সেই বংশতালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বংশতালিকা ।

নাম	বায়ু	মৎস্য	ব্রহ্মাণ্ড
সোমাপি	৫৮	৫৮	৫৮
শ্রুতবান্	৬৭	৬৪	৬৭
অযুতায়ুঃ	৩৬	৩৬	৩৪
নিরমিত্র	৫০	৪০	৫০
সুক্ষত্র	৫৮	৫৬	৫০
বৃহৎকর্ম্মন্	২৩	২৩	২৩
সেনজিৎ (১)	২৩	৫০	৫০
শ্রুতঞ্জয় (২)	৪০	৪০	৪০ ?
বিপ্র	৩৫	২৮	২৮
শুচি (৩)	৫৮	৫৮	৫৮
ক্ষেমক	২৮	২৮	২৮
সুব্রত (৪)	৬৩	৬৪	৬৪
ধর্ম্ম (৫)	৫	২৮	৫
সুশ্রম (৬)	৫৮	৫৮	৫৮
দৃঢ়সেন (৭)	৪৮	২৮	৪৮
সুমতি	৩৩	৪৮	৩৩
সুবল (৮)	৩২	৩৩	৩২
সুনেত্র (৯)	৪০	৪০	৪০
সত্যজিৎ (১০)	৮০	৮০	৩০
বিশ্বজিৎ (১১)	৩৫	৩৫	৩৫

(১) বায়ুপুরাণের কোনও কোনও পুস্তকে [illegible] বৎসর কথিত হইয়াছে। (২) [illegible] বৎসর মৎস্যপুরাণের

রিপুঞ্জয়	৫০	৫০	৫০
	——	——	——
	৯২১	৯৩৫	৮৮১

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে সুশ্রমের পর সুব্রত নামক আর একজন রাজা ৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ——

সুতরাং মোট—৯৫৯

উপরি উদ্ধৃত বংশতালিকা ও তৎসন্নিবিষ্ট ফুটনোটগুলি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কথিত পুরাণগুলি বর্ত্তমান কালে নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন। অনভিজ্ঞ লিপিকারের দোষে ও অন্যান্য কারণে উহাতে বহুবিধ অশুদ্ধি ও পাঠান্তর ঘটিয়াছে। দুই এক স্থানে দুই একজন রাজার নাম ও রাজত্বকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল দোষ সত্বেও, ইহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারত সমরের পর বৃহদ্রথের-বংশীয় ভূপতিগণ সহস্র বা হাজার খানেক বৎসর মগধ শাসন করিয়াছিলেন, ইহা বলাই পুরাণকার ঋষির অভিপ্রেত (৭)। এই সহস্র বৎসরের সহিত প্রদ্যোত ও শিশুনাগ বংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যকাল যোগ করিলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও নন্দের মধ্যে ১৫ শত বৎসরের অন্তর পাওয়া যায়। এ কথা বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বর্ণিত বংশতালিকা সম্মত —"ইতিহাসানভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের ভ্রান্তি" নহে। ফলকথা, চারুবাবুর যদি পৌরাণিক "ইতিহাসে অভিজ্ঞতা থাকিত" তাহা হইলে তিনি কখনই এরূপ বিসদৃশ মীমাংসাকে "ঐতিহাসিক মীমাংসা" বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতে সাহসী হইতেন না। পূর্ব্বাপর "না দেখিয়া, না পড়িয়া যাহা তাহা" বলিয়া মত বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলে, "নিজের তর্কপ্রিয়তা দেখান হইতে পারে

পাঠান্তর। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উল্লেখ বড় অস্পষ্ট। (৩) ৬৪ বর্ষ মৎস্য পুরাণের পাঠান্তর। (৪) ৬০ বৎসর বায়ু ও মৎস্যপুরাণের পাঠান্তর। (৫) ৫৮ (?) বৎসর বায়ু পুরাণের ও ৩৫ ও ৫০ বৎসর মৎস্য পুরাণের পাঠান্তর। (৬) ৩৮ বর্ষ বায়ু পুরাণের পাঠান্তর। (৭) ৫৮ বৎসর বায়ু পুরাণের পাঠান্তর। (৮) ২২ বৎসর বায়ুর পাঠান্তর। (৯) ২২ বর্ষ মৎস্যের পাঠান্তর। (১০) ৮২ বর্ষ বায়ুর পাঠভেদ। (১১) ২৫ বৎসর বায়ু ও মৎস্য পুরাণের পাঠান্তর।

(৭) উদ্ধৃত বংশতালিকায় আমরা সহদেব সহ ২২ জন নরপতির নাম পাইতেছি। কিন্তু বায়ু পুরাণে এই তালিকার শেষে কথিত হইয়াছে যে,—"দ্বাত্রিংশচ্চ নৃপাহ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাৎ। পূর্ণং সহস্রবর্ষং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি।" সুতরাং 'দ্বাবিংশতিঃ' স্থলে এই শ্লোকে ভ্রম ক্রমে 'দ্বাত্রিংশচ্চ' (২২ স্থলে ৩২) লিখিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা, পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটে। এই একটা শ্লোকের জন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত অত বড় বংশ তালিকাটাকে ভ্রমপূর্ণ বলিতে হয়। বস্তুতঃ বৃহদ্রথ বংশীয় ৩২ জন রাজার রাজ্য শাসনকাল ১ সহস্র বৎসর নহে—জরাসন্ধের পরবর্ত্তী ২২ জন রাজারই শাসনকাল সহস্র বৎসর। এ কথা বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ সম্মত।

মৎস্য পুরাণে "বৃহদ্রথাৎ"এর পরিবর্ত্তে 'বৃহদ্রথাঃ' এইরূপ পাঠ আছে। ইহা শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কেন না, এই বংশ তালিকাধৃত নরপতিগণ ('বৃহদ্রথাঃ') বৃহদ্রথ বংশীয় বটে, কিন্তু বৃহদ্রথের পর হইতে ('বৃহদ্রথাৎ) ইহাদের গণনা হইতে পারে না। এই ভবিষ্যৎ নরপতিগণের আদি পুরুষ সহদেব ও বৃহদ্রথের মধ্যে ৮।৯ পুরুষের অন্তর। সুতরাং ইহাদের সংখ্যা কীর্ত্তনকালে ইহাদিগকে 'বৃহদ্রথাৎ' (বৃহদ্রথের পর হইতে) বলা অপেক্ষা "বৃহদ্রথ" (বৃহদ্রথ বংশোদ্ভূত) বলা অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

এই সকল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, উক্ত শ্লোকের

দ্বাবিংশতি নৃপাহ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ।
পূর্ণং সহস্র বর্ষং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি॥

এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত।

বটে, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়া থাকে ?"

পাঠকগণ দেখিলেন, ভারত সংগ্রামের পর বৃহদ্রথ বংশীয় নরপতিগণ যে সহস্র বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এ কথা আমাদের কপোল কল্পিত নহে—ইহা প্রাচীন পৌরাণিক মত। কিন্তু চারুবাবুর বিশ্বাস অন্যরূপ। তিনি বলেন "ভারতীয়" পুরাতত্ত্ব ঘটিত অনেক বিষয় সুন্দররূপে মীমাংসা" করার "জন্য কেবল শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস ও যুক্তির আশ্রয় লইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। * * * কিন্তু আজ কাল প্রাচীন মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন মত সংস্থাপনের চেষ্টা কেমন একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইযাছে।" কথাটা মিথ্যা নহে। পুরাণকারগণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে প্রাচীন ভূপতিগণের রাজত্বকালকে ঐতিহাসিক মীমাংসাচ্ছলে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের রাজত্ব-কালের অন্তর্ভুক্ত করিবার একটা নূতন চেষ্টা, রোগ বৈ কি ?

স্থানান্তরে চারুবাবু বলিয়াছেন—"তাঁহারা সত্য নির্ণয় অপেক্ষা নিজেদের বাহাদুরী দেখানই আবশ্যক মনে করেন।" সেই জন্যইত অদ্ভুত ঐতিহাসিক মীমাংসার সৃষ্টি !

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বৃহদ্রথ-বংশীয় ভবিষ্যৎ নৃপতিগণের রাজত্বকাল সহস্র বৎসর,এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে। বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণের বংশ তালিকা, পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণীয় উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং উক্ত বচনগুলির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। এখন বিষ্ণু ও ভাগবত-পুরাণের কোনও স্থলে যদি ইহার বিরুদ্ধ কোনও কথা দেখিতে পাই, তবে উহাকে প্রক্ষিপ্ত বা লিপিকর প্রমাদ বলিতে পারি কি না ?

দেখিযাছি, বংশতালিকানুসারে পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১৫ শত বৎসরের অন্তর। কিন্তু আবার উক্ত পুরাণদ্বয়ের স্থানান্তরে দেখিতে পাই ;—

যাবৎ পরিক্ষীতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেকং।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং ॥

বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৩২

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দের অভিষেক, এই দুই ঘটনার মধ্যে ১০১৫ বৎসরের অন্তর ; তথাচ ভাগবতে,—

"আরভ্য ভবতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরং ॥

ভাগবত ১২।২ অধ্যায়।

এতদনুসারে নন্দ ও পরীক্ষিতের মধ্যে ১১১৫ বৎসরের অন্তর স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই বচনগুলি বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণোক্ত বংশতালিকার বিরোধী। কাজেই অর্থের বৈচিত্র্য সাধন ও লিপিকর-প্রমাদ স্বীকার করিতে হইল। ভাগবতীয় বচনের কূটার্থ করিলে ১৫১০ এক হাজার পাঁচশত দশ বৎসর পাওয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে এইরূপ কূটার্থ গ্রহণ ভিন্ন পৌরাণিক বিরোধের পরিহার হয় না (৮)।

(৮) এই কূটার্থ গ্রহণের জন্য চারুবাবু আমাদের উপর যথোচিত নিন্দাবর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পৌরাণিক বিরোধ পরিহারের জন্য তিনিও স্বয়ং কূটার্থ গ্রহণ করিয়া বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন! কুমারিকা খণ্ডোক্ত—ত্রিষু দশাধিক শতত্রয়ে এই বচনের সরল অর্থ এই,—কলির ৩৩১০ বৎসর অতীত হইলে, নন্দবংশীয়েরা রাজা হইবেন। প্রাতঃস্মরণীয় ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই

বিষ্ণুপুরাণের বচনের কূটার্থ করিলেও সহজে অর্থলাভ হয় না—অনেক কষ্ট-কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং এখানে লিপিকর-প্রমাদের সম্ভাবনাই অধিক দৃষ্ট হইতেছে।

"জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং" স্থানে লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ "জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং" হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। বিশিষ্ট কারণ ব্যতি-রেকে বিষ্ণুপুরাণের একটা সমগ্র অধ্যায়কে (যে অধ্যায়ে জরাসন্ধের পরবর্ত্তী নৃপতি সমূহের নাম কীর্ত্তিত ও অবস্থিতিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) ভ্রমপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা একটি শ্লোকের অন্তর্গত একটি পদকে লিপিকর-প্রমাদ জনিত অশুদ্ধ মনে করা, আমি অধিক দোষাবহ মনে করি না। বিশেষতঃ ভাগবত, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্য পুরাণের বংশ তালিকা যখন বিষ্ণুপুরাণের উক্তির সমর্থন করিতেছে, তখন সমালোচ্য শ্লোকে অশুদ্ধি থাকাই অধিকতর সম্ভব মনে হয়। ইহাকে যদি চারুবাবু "বিচারকালে গোঁজা মিলন দিবার চেষ্টা" বা "যুক্তি মূলক ইতিহাসে অনভিজ্ঞতা" অথবা "সাহসের কথা" বলেন, তবে নিরুপায়।

মৎস্যপুরাণের একটী ব্যতীত সকল পুঁথিতেই "১০১৫ বৎসর" এই পাঠ আছে। কেবল একটিতে আছে, "১৫ শত বৎসর" কিন্তু সকল পুঁথির বংশ তালিকানুসারেই যখন পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১৫ শত বৎসর অন্তর" পাওয়া যাইতেছে, তখন যে পুথিতে "১৫ শত বৎসরের" পাঠ আছে, সেইটিকেই শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না কি?

চারুবাবু বলিয়াছেন (সাহিত্য কল্পদ্রুম, ১২৯৮ সাল মাঘ ২৭৭ পৃষ্ঠা) পুরাণকারগণের মতে কলির প্রারম্ভকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল ও তৎকালে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু শাকল্যগণনানুসারে সপ্তর্ষিগণ তৎকালে শ্রবণায় ছিলেন। তবেই পুরাণের সহিত শাকল্যের বিরোধ ঘটিতেছে। চারুবাবু স্বীকার করিয়াছেন, যে পুরাণ বিরুদ্ধ মত গ্রাহ্য নহে (সাহিত্য কল্পদ্রুম ২৭৮পৃঃ) তবে তিনি শাকল্যের মত গ্রহণ করিয়াছেন কেন? (নব্যভারত, আশ্বিন, পৃ ২৯১)

চারুবাবু বলেন, (সাহিত্য কল্পদ্রুম ২৭৭ পৃষ্ঠা) মৎস্যপুরাণ মতে সপ্তর্ষিগণ "কৃত্তিকায় যাইলে অন্ধ্রবংশীয়গণ রাজ্য লাভ করিবেন। নন্দ হইতে অন্ধ্রকাল ৮৩৬ বৎসর পরে।" অন্ধ্রবংশীয়গণের "রাজলাভ" কালে সপ্তর্ষি মণ্ডল কৃত্তিকায় থাকিলে, তাহার ৮৩৬ বৎসর পূর্ব্বে নন্দের রাজ্য-কালে তাঁহাদের শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিতি সম্ভব, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে থাকা কোনও মতেই সম্ভব নহে।

কিন্তু চারুবাবু মৎস্যপুরাণের কথা ভুল বুঝিয়াছেন। মৎস্যপুরাণের, শুধু মৎস্যপুরাণের মতে কেন—বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতেও, নন্দের ৮৩৬ বৎসর পরে অন্ধ্রবংশ ধ্বংস হয়; (১) এবং অন্ধ্র-

সরল অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। (বিধবা বিবাহ পুস্তক ৬ষ্ঠ সংস্করণ—১০৮।৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চারুবাবু উহার অর্থ করিয়াছেন,—কলির (৩০০০—২৯০=) ২৭১০ বৎসর হইলে নন্দরাজ্য হইয়াছিল।" কূটার্থ গ্রহণ ভিন্ন এই অর্থ সিদ্ধ হয় না। একেই বলে, "নিজের বেলায় আঁটি শুঁটি, পরের বেলায় দাঁত-কপাটি।"

(১) বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উল্লেখ মতে বুদ্ধের কিঞ্চিদ্‌ন চারিশত বৎসর পরে, অন্ধ্র

বংশীয় পুলোমতের সময় সপ্তর্ষিগণ কৃত্তিকায় ছিলেন। অন্ধ্রবংশীয় শেষ নরপতির নাম "পুলোমবিৎ"। এই পুলোমবিৎ ও পুলোমৎ যদি এক ব্যক্তি হয়েন, (সম্প্রতি এখানে আমার নিকট মৎস্য পুরাণ নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে অসমর্থ হইলাম) তাহা হইলে, অন্ধ্রবংশ ধ্বংস কালে সপ্তর্ষিগণ কৃত্তিকায় ছিলেন। এই ঘটনার ৮৩৬ বৎসর পূর্ব্বে নন্দের আবির্ভাব কাল, সুতরাং তৎকালে সপ্তর্ষিগণ শ্রবণায় ছিলেন বলিতে হয়।

মৎস্যপুরাণে দেখা যায়, অন্ধ্রবংশ বিনাশের ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে পুলোমৎ নামে একজন মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইঁহারই রাজত্ব কালে সপ্তর্ষিগণ কৃত্তিকায় ছিলেন, স্বীকার করিলে, নন্দের সময় তাঁহারা সম্ভবতঃ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাদি পুরাণ মতে নন্দের রাজত্বকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিল।

ফলকথা, সপ্তর্ষি সম্বন্ধে অনেক গোল। ১মতঃ, সপ্তর্ষির গতি আছে কি না? আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ সকলেই একবাক্যে সপ্তর্ষির গতি অস্বীকার করেন।

২য়তঃ, যদি গতি থাকে, তথাপি সেই গতি দ্বারা মঘা নক্ষত্রে তাঁহাদের উপস্থিতি সম্ভব কি না? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন—না।

৩য়তঃ; সপ্তর্ষিগণের এক এক নক্ষত্র ভোগের কাল কত? হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন, একশত বৎসর। ইউরোপীয়গণের মতে সহস্র বৎসর।

৪র্থতঃ, কলির প্রারম্ভকালে সপ্তর্ষিগণের অবস্থান সম্বন্ধে পুরাণের সহিত শাকল্যের ঐক্য নাই। পৌরাণিক মতে তৎকালে মঘাতে, শাকল্যের মতে শ্রবণায়। চারুবাবু বলেন, বরাহমিহিরের মতে নাকি কৃত্তিকায়।

৫মতঃ, পুরাণে কথিত হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘায় ও নন্দের সময় পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন। পুরাণকারগণ বলেন, সপ্তর্ষির এক এক নক্ষত্র ভোগের কাল একশত বৎসর। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের ও নন্দের মধ্যে সহস্র বৎসরের অন্তর। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত বংশতালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, প্রায় সকল পুরাণ অনুসারে নন্দের ১৫শত বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির প্রাদুর্ভূত হয়েন।

৬ষ্ঠতঃ, নন্দের সময় সপ্তর্ষির অবস্থান সম্বন্ধেও পুরাণকারগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবাদিপুরাণ মতে নন্দের রাজত্ব কালে তাঁহারা পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন; (১০) কিন্তু দেখিয়াছি, মৎস্যপুরাণের গণনা মতে ধনিষ্ঠা বা শ্রবণায় ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সময় মৃগশিরা বা আর্দ্রায় ছিলেন। সুতরাং নন্দ ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সহস্র বৎসর অন্তর, তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও তাঁহারা তৎকালে হস্তা নক্ষত্রে ছিলেন।

বংশ স্থাপিত হয়। উক্ত পুরাণগুলির মতে আন্ধ্রবংশের স্থিতিকাল ন্যূনাধিক সাড়ে চারিশত বৎসর। সুতরাং নন্দের ৮৩৬ বৎসর পরে আন্ধ্রবংশ স্থাপিত হয় নাই—[illegible] হইয়াছিল। চারু বাবু পুরাণগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে এ কথা বুঝিতে পারিবেন।

(১০) ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী আবার বলেন,—প্রদ্যোত বংশীয়গণের রাজত্বকাল কালে সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন, সুতরাং নন্দের সময় পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে ছিলেন। শ্রীধরস্বামী ভাগবতীয় বচনের উক্তরূপ অর্থ সাধন করিয়াছেন।

যমতঃ, বর্ত্তমানকালে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থিতি সম্বন্ধেও হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে এক্ষণে তাঁহারা অনুরাধা নক্ষত্রে, কাহারও বা মতে স্বাতিতে আছে। অপরে, মঘা নক্ষত্রে তাহাদের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তাই বলিতেছিলাম, সপ্তর্ষি সম্বন্ধে অনেক গোল। পুরাণ সপ্তর্ষি সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারি নাই। যাহা বুঝিতে পারি নাই, তাহার সম্বন্ধে বিচার করিতে আমি অসমর্থ।

ইহার পরেও যদি যুধিষ্ঠিরের ও নন্দের অন্তরকাল সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়; পরে বলিব। (১১)

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

১। কুরুক্ষেত্র কাব্য। (২)—"কুরুক্ষেত্র" যদি "চিত্রাঙ্গদা" হইতে—পৌরাণিক সাহিত্যের—এক ফোটা ঘটনা লইয়া যত কিছু ভাবের খেয়াল, প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম-বৈচিত্র্যের যত প্রকার ম্লানোজ্জ্বল স্ফূর্ত্তির বর্ণনীয় বিষয় হইত—সূক্ষ্মাংশকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম ভাবে পরিণত করা যদি নবীন বাবুর উদ্দেশ্য হইত, তবে কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিতেছি এবং যাহা বলিব, তাহার অধিকাংশ না বলিয়া পারিতাম। বহিরন্তে বসন্ত ঢুকিয়া মদনের ইঙ্গিত ক্রমে মুহূর্ত্তের জন্য চিত্রাঙ্গদার্জ্জুনকে যেরূপ স্বপ্নরাজ্যে উড্ডীন করিয়াছিল, কুরুক্ষেত্রের স্বপ্নরাজ্য তদ্বিধ নহে। নরনারী মুহূর্ত্তের জন্য ভূত ভবিষ্যৎ, স্বর্গমর্ত্ত্য ও আত্মপর ভুলিয়া গিয়া কামনার দাস দাসী হইয়া যেরূপ কৃপাপাত্র, হয় চিত্রার্জ্জুন তাহাই। কিন্তু ভদ্রার্জ্জুন তাহা নহে। "কুরুক্ষেত্র" "চিত্রাঙ্গদা" নহে। কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্য উচ্চ। ইহার আকাঙ্ক্ষা বঙ্গীয় সকল কাব্যাপেক্ষা উচ্চ। ইহার আকাঙ্ক্ষা ভগবৎ প্রেম—বিশ্বপ্লাবী মানব-প্রেম। প্রেম ও নবীনে যে প্রভেদ, চিত্তোচ্চতার ও হৃদয়ের আবেগে সেই প্রভেদ; সেই নবীনের যত কিছু হৃদয়ের শক্তি, তাহা যেন ভগবৎ প্রেমে পরিস্রুত হইয়া কুরুক্ষেত্রের ছত্রে ছত্রে স্বর্গীয় শিশির বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কুরুক্ষেত্র মেঘনাদ ও বৃত্র সংহারকে পরাজয় করিয়াছে। আর এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য অথবা এরূপ আকাঙ্ক্ষা ধারণ করিবার জন্য যে শ্রেণীর হৃদয় আবশ্যক, তাহা এ দেশের লেখকগণের মধ্যে রমেশবাবুর পরে, নবীন বাবু ভিন্ন কাহারও নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়া বঙ্কিম বাবু ও কর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়া ভূদেব বাবু যত কারুকার্য্য প্রদর্শন করুন না কেন, হৃদয় তত্ত্বে বা সহানুভূতি তত্ত্বে রমেশ বাবু ও নবীন বাবু শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ধর্ম্ম কর্ম্মতত্ত্বের প্রকৃত সুধার ইঁহারাই অধিকারী। কুরুক্ষেত্রে এই সুধা যথেষ্ট আছে।

(১১) এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর দেখিলাম, বিগত পৌষ মাসের জন্মভূমিতে ঠক্কর মহাশয় পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিয়া পরীক্ষিত অপেক্ষা মহানন্দ পৌত্র সোমাপিকেই ১০।১২ বৎসরের বড় স্বীকার করিয়াছেন। (এই প্রবন্ধের ৯নং পাদটীকা দেখুন।)

কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও কম উচ্চ নহে। ইহাতে হিন্দুজন-সাধারণের অনুসরণীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের মর্ম্ম ব্যাখ্যার যত্ন করা হইয়াছে। বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র এককপ ভাবতে উপেক্ষিত বলিলেও বলা যায়। খ্রীষ্টানের বাইবেলের ন্যায়, মুসলমানের কোরাণের ন্যায় হিন্দুর মহাভারত সাধারণ হিন্দুসমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা ধর্ম্ম গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাভারতের ব্যাখ্যা কুরুক্ষেত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যাও এই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত।

তৃতীয় উদ্দেশ্য, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঐতিহাসিক কারণ প্রদর্শন। কর্ণ, দুর্ব্বাসা সংবাদে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। সুতরাং "কুরুক্ষেত্রে" যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা যেমন উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত ও জটিল, তেমন সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মকর্ম্মের গন্তব্য পথের প্রশ্নের সহিত মিশ্রিত। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে যদি নবীন বাবুর সহিত আমাদের মত বিরোধ হয়, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।

তবে আমাদের পূর্ব্ব সমালোচনা সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্র হইতে যে প্রতিবাদ পত্র পাইয়াছি, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র কল্পিত ও সূচিত হয় ১৮৮২ ইংরেজীতে, বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় (আমার যতদূর স্মরণ হয়) ১৮৮৪ ইংরেজি হইতে। * * *। ১৮৮২ ইংরেজীতে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও তৎপরবর্ত্তী আরও একখানি কাব্যের Plot বঙ্কিম বাবু, কালীপ্রসন্ন বাবু ও প্রফুল্ল বাবু দেখিয়াছিলেন এবং বঙ্কিম বাবু প্রথমতঃ রৈবতকের কয়েক সর্গ দেখিয়া তাহাদের নীচে এবং তিনখানি কাব্যের সূচিত কৃষ্ণচরিত্র ও ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য ও এক দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এখনও আছে।"

এই পত্রের কথা দ্বারা লেখক আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চান যে "ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন যে কৃষ্ণ জীবনের উদ্দেশ্য" তাহা কুরুক্ষেত্রের কবি বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র হইতে অনুকরণ করেন নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে কুরুক্ষেত্র কাব্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। আর বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণচরিত্র লেখার মন্ত্রটুকু নবীন বাবু হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে হয়। বঙ্কিম বাবু কি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা চাহিয়াও, আমরা পাই নাই। তাহা পাইলে বর্ত্তমান গীতা ও কৃষ্ণচরিত্রের আন্দোলনের এক রহস্য প্রকাশ করিতে পারিতাম।

আর একটী কথা এই। নবীনবাবুর "রঙ্গমতী" কৃষ্ণচরিত্র প্রচারের প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। রঙ্গমতীর ২৩৫ পৃষ্ঠায় আছে।

> অন্তর বিগ্রহে বৎস ডুবেছে ভারত।
> ইতিহাসে প্রতি ছত্রে এই বহ্নি শিখা
> জ্বলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নি শিখা
> দেবচক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথমে।
> মহাজ্ঞানী, নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
> ভষ্মি উপরাজ্য গ্রাম বিচিত্র কৌশলে
> জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
> প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিত প্রবাহে
> নিবিলে সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
> কৌরবের একছত্র হইল স্থাপন।
> এই মহা অভিনয় না হইতে শেষ,
> সেই দেব অভিনেতৃ, সম্বরিলা লীলা
> সিন্ধু প্রান্তে, গুপ্ত অস্ত্রে আততায়ী করে।
> সদ্য মহারাজ্য ক্রমে পড়িল খসিয়া
> শত খণ্ডে, পদাহত অনার্য্য পরশে
> বালকের হস্তচ্যুত পুতুলের মত।"

রঙ্গমতী বঙ্কিমবাবুর নিকট উৎসর্গ করা হইয়াছিল, ইহা আমরা জানি। তবে কৃষ্ণ-

চরিত্র ও গীতা লইয়া বঙ্গ ভাষায় কয়েক বৎসর হইতে যে আন্দোলন চলিতেছে, রঙ্গমতীর এই কয়েক পংক্তি কি তাহার দীপ-শলাকা?

উপরোক্ত প্রতিবাদ প্রাপ্তে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছি। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ রঙ্গমতী-সূচিত কৃষ্ণচরিত্রের অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং এই প্রতিবাদের মর্ম্মানুসারে বঙ্কিমবাবুর নিকট নবীনবাবুর ঋণ অতি অল্প হইয়া উঠে। কিন্তু ইতিহাসের চক্ষে "কুরুক্ষেত্রে" যে ভ্রমের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া বলিয়াছি, তাহা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত নহি। ভিতরের কথা যাহাই হউক, বাহিরের কথা লইয়াই জগৎ বিচার করিবে; বাহিরে প্রকাশ, বঙ্কিমবাবুই কৃষ্ণ চরিত্র আন্দোলনের মূল। কুরুক্ষেত্র যখন বঙ্কিম বাবুর পুস্তক প্রকাশের পরে বাহির হইয়াছে, তখন ইতিহাস বলিবেই নবীনবাবু মূলমন্ত্রে বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী বঙ্কিমবাবুর এ সম্বন্ধে কি ব্যক্তব্য আছে, তাহা প্রকাশিত না হইলে এ কথা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

আর একটী কথা এই, মহাকবির লক্ষণ নূতন সৃষ্টি করা; দুর্ভাগ্যেরবিষয় আমাদের দেশে সেরূপ কবির অভ্যুদয় দেখিতেছি না। রামায়ণ ও মহাভারতের চর্ব্বিত চর্ব্বণ না করিয়া নবীনবাবু যদি স্বাধীন কল্পনা বলে নূতন কিছু সৃষ্টি করিতেন, তাঁহার নাম অমর হইত। ব্যাস বাল্মীকির উপর হস্তক্ষেপ করা অপেক্ষা তাহা করাই উচিত ছিল। কোন ব্যক্তির কল্পিত কোন চরিত্রকে উজ্জ্বল, ম্লান বা পরিবর্ত্তন করিতে কাহারও কোন ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার আছে কি না, আমাদের সন্দেহ। দুঃখের বিষয় মহাত্মা মাইকেল হইতে এ দেশের সকল কবিই এই কাজে ব্রতী। ইহা যে প্রকৃত মহত্ব ও প্রতিভার অন্তরায়, ইহা কেহই ভাবেন না। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে প্রকাশিত হইবে।

২। যুগপূজা বা ধর্ম্মভাব বিকাশ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি, এ, প্রণীত, মূল্য ।০। যুগে যুগে মানুষের উন্নতি হইতেছে। মানুষের উন্নতির সহিত পূজা বা উপাসনারও উন্নতি হইতেছে। শৈশবযুগের প্রেতপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া, মানুষের ক্রমোন্নতির সহিত বিবিধ যুগের প্রকৃতি পূজা, নরহরি পূজা, অদ্বৈত পূজা, নর পূজা, অজ্ঞেয়শক্তি পূজা কিরূপে ব্রহ্ম পূজায় পরিণত হইয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহা সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম হয়। গভীর বিষয় পদ্যে প্রস্ফুটিত করা খুব কঠিন, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিজয় বাবু সিদ্ধহস্ত; এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বর্ত্তমান যুগের কবিদিগের তুলনা হয় না। তাঁহার এই পুস্তকের ভাষা এত সুন্দর হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে মোহিত হইতে হয়। এই পুস্তকের একটী স্থান হইতে নমুনা দিলাম।

খ। অদ্বৈত পূজা—(২)

"আমি জ্ঞানী, আমি জ্ঞেয়, অনুমান, অনুমেয়,
আমি সারতত্ব, অহো, আমিই জিজ্ঞাসু।
"আমিই" আমার তরে, ভবে লীলা খেলা করে;
আমি পিপাসার বারি, আমিই পিপাসু।
আমিই অনন্ত, সান্ত, আমি বুদ্ধ, আমি ভ্রান্ত,
আমিই নূতন হই, আমি পুরাতন;
বৃথা এই কাল কল্প;—আমিই আমার কল্প
আমি স্বামী, আমি জন্ম, ব্রহ্ম-সনাতন।"

এইরূপ কবিতা এ পুস্তকে অনেক আছে। আমরা কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে এ পুস্তকখানি একবার পড়িতে অনুরোধ

করি। পড়িয়া যে সুখী হইবেন, এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। এরূপ, ধর্ম্মভাব-পূর্ণ কবিতা এদেশে যত প্রকাশিত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল।

৩। ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবি।—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ।৵০। কবীর দাস, নানকসাহ, তুলসীদাস ও তুকারামের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে আছে। পুস্তকখানি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বীরেশ্বর বাবুকে এই কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি, এই আড়ম্বর-শূন্য ভক্তদিগের-জীবনী সকলের পাঠ করা উচিত।

৪। কোল কাহিনী প্রথম ভাগ।—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ।/০। বীরেশ্বর বাবু ছোট নাগপুরের স্কুলসমূহের এসিস্‌টাণ্ট ইন-স্পেক্টর। দীর্ঘকাল কোল রাজ্যে বাস করিয়া কোল জাতি সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিয়াছেন, তাহা ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি সুন্দর হইয়াছে।

৫। চৌকিদারী পঞ্চাইত।—শ্রীগুরুগোবিন্দ পাত্রদার, বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০। আইনের যাহা প্রতি গ্রামবাসীর অবশ্য জ্ঞাতব্য, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা ভাল।

৬। জাতীয় উন্নতির উপায়।—যশোহর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমাখনলাল দত্ত, বি, এ, প্রণীত; মূল্য ।০। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইলাম। পুস্তকখানি বেশ চিন্তাপূর্ণ। ছাত্রদিগের পাঠ করা একান্ত উচিত।

৭। চিত্রদ্বয়।—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত প্রণীত, মূল্য ৵০। "হলদিঘাটের যুদ্ধ" এবং "ভ্রাতৃদ্বয়" ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু বর্ণনা সমীচীন নহে।

৮। স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র আশের সংক্ষিপ্ত জীবন।—লক্ষ্মণচন্দ্র আশ একজন সাধুব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীবনে শিক্ষার অনেক বিষয় আছে, পুস্তকখানি পড়িলে খুব উপকৃত হওয়া যায়।

৯। সাহিত্য পুস্তক।—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, সঙ্কলিত; মূল্য ॥০। ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীর জন্য ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাল্মীকির জয় হইতে কতকটুক মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায়, আরো কতকটা উদ্ধৃত করিলে ভাল হইত, কেন না, ঐরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। চন্দ্রনাথ বাবু একজন অসাধারণ পণ্ডিত, তাহার নির্ব্বাচন যে ভাল হইবে, বলা বাহুল্য। তবে একটী কথা এই, নূতন বাঙ্গলা শিক্ষা দিবার সময় ছাত্রদিগকে কিছু কিছু প্রাচীন বাঙ্গলাও শিক্ষা দেওয়া উচিত। উদ্ধৃতাংশে নূতন বাঙ্গলা শিক্ষার যথেষ্ট উপকরণ আছে, সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রাচীন ভাষার নমুনা থাকিলে ভাল হইত। নিরপেক্ষভাবে আজকাল অতি অল্প পুস্তকই সঙ্কলিত হইতেছে। টেক্সটবুক কমিটীর অনুজ্ঞায়, না কিসে ঐরূপ হইতেছে, বুঝি না।

চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট সাহিত্য জগৎ অনেক আশা করে; তিনি স্কুলের পাঠ্যের দিকে মনোনিবেশ করিতেছেন, ইহা সাহিত্য-জগতের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। একে একে সকল মহারথীই যদি সাহিত্য-সেবাকে লাভ-গণনার মধ্যে আনেন, তবে এ দেশের ভবিষ্যৎ কে উজ্জ্বল করিবে? সঙ্কলন কার্য্যে এরূপ মনীষী ব্যক্তিকে নিযুক্ত দেখিলে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হই। সাহিত্য

জগতে ইহাপেক্ষা অনেক মহৎ কার্য্য চন্দ্রনাথ বাবুর করিবার আছে। আমাদের বিবেচনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্যগণের পরীক্ষক মনোনীত হওয়ার ন্যায়, টেক্টবুক কমিটীর সভ্যগণের পাঠ্য পুস্তক লেখা অবৈধ। বিচারক নিজেই বিচারপ্রার্থী হইলে, ও সমস্ত টাকা ভাগ করিয়া লইলে অন্য লোকের আর আশা কোথায়?

১০ ও ১১। দুই ভাই, মূল্য ৵০, একটী চিত্র, মূল্য ৵০।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। হারাণ বাবুর গল্পের ভাষা সুন্দর; ভাব মার্জ্জিত। গল্প দুটী ক্ষুদ্র, কিন্তু বেশ শিক্ষাপ্রদ।

১২। চরিত্র সুশিক্ষা।—শ্রীরাধাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৵০। এখানি বিদ্যালয় পাঠ্য। মোটের উপর পুস্তকখানি ভাল হইয়াছে।

১৩। চারুমালা।—শ্রীমনোমোহিনী গুহ প্রণীত। মূল্য ৵০। তৃতীয় সংস্করণ। পুস্তকখানি ভাল।

১৪। পাটীগণিত।—শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১৷৵০। এই পাটীগণিতখানি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে গণিতের নিয়মাদি খুব সহজ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি। স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ পুস্তকখানি পাঠ করিলেই একথা বুঝিবেন।

১৫। অন্নপূর্ণা চরিত।—শ্রীশ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও বগুড়া হইতে প্রকাশিত মূল্য ১৲, মাশুল ৴১০। দেবী অন্নপূর্ণা একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। একদিকে প্রতিভা, অন্য দিকে প্রখর বুদ্ধি, এক দিকে ভক্তিবিশ্বাস, অন্য দিকে সেবা ও পরিচর্য্যার সমাবেশে দেবী ব্রাহ্মসমাজে এবং বঙ্গদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এরূপ সাধ্বীর জীবনচরিত পাঠ করা প্রতি ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এই পুস্তকে দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁহার বন্ধুগণের পত্র এবং তাঁহার রচিত কয়েকটী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। জীবনী অংশ যত সুন্দর হওয়া উচিত ছিল, তত হয় নাই দেখিয়া কিছু দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু বন্ধুগণের পত্র এবং তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। পুস্তক খানি ৬৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে; মূল্য যৎসামান্য। বঙ্গমহিলার উন্নতি দেখিলে যাঁহাদের আনন্দ হয়, তাঁহারা সকলে এক এক খানি এই পুস্তক ক্রয় করিবেন, আশা করি। উন্নতিপিপাসু বঙ্গমহিলাগণ এ পুস্তক পাঠ করিলে অনেক শিক্ষা পাইবেন এবং বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ বিশ্বাসের অনন্ত দৃষ্টান্তে মোহিত হইয়া যাইবেন।

১৬। প্রদীপ (গীতিকাব্য)—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। অক্ষয়বাবুর কবিত্বের যশ বাঙ্গালা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত, যে কবিতায় আত্মসমাহিত ভাবের প্রস্ফুটন সাধিত হয়, প্রদীপের কবিতা সেই শ্রেণীস্থ এবং এই সমস্ত কবিদিগের মধ্যে অক্ষয়বাবু এদেশে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। এ গ্রন্থের সকলগুলি কবিতাই সুমিষ্ট। ভাষা যেমন মার্জ্জিত, তেমনই মিষ্ট। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই এত ভাল হইয়াছে যে, বিলাতী বলিয়া মনে হয়।

১৭। দীপ্তি।—(বিকাশ-প্রণেতা প্রণীত) মূল্য ৵০। দীপ্তির কবিতাগুলি ধর্ম্মভাবপ্রণোদিত। অনেকগুলি কবিতাতেই বেশ রসাত্মক বাক্য আছে।

১৮। আকাশকুসুম কাব্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কবিতা।—শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম্‌, এ, প্রণীত, মূল্য ।৴০। ভাষা মার্জ্জিত ও পরিচ্ছন্ন; অনেক স্থানে

সুন্দর সুন্দর ভাবের যোজনাও আছে; কিন্তু কবিতা, যে বৈদ্যুতিক শক্তির বলে প্রাণস্পর্শী হয়—সে শক্তি যেন তত নাই। যে ভাষা কোমল ভাবের সহিত গাঁথা, বোধ হয় যেন সেই ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া—একটুখানি বড় বড় কথার যোজনা হইয়াছে বলিয়া,—প্রচুর উপল বিষমে বাধিয়া নদীর প্রবাহ যেমন স্তম্ভিত হয়, ইঁহার কবিতার প্রবাহ তেমনি স্তম্ভিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তের জন্য এক স্থান হইতে চারিটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি;—

"পাত্রাপাত্র না জানিয়া উদ্বাহ বন্ধনে
জনমে সুতিক্ত ফল চির বিষময়;
মিলন অবশ্যম্ভাবী হইবে কেমনে
ভিন্ন রুচিময় যবে মানব হৃদয়?"

১৯। কবিতাসুন্দরী।—শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত, মূল্য।০। একটিও কবিতা হয় নাই। অনেক স্থানে পয়ার পর্য্যন্ত মেলে নাই; যথা, দিশি, শশি; চলে, গালে; যায়, লয়; ছাড়িবে, যাবে; ইত্যাদি।

২০। কৃষকের ছবি।—তাহিরপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় ইহার লেখক। অনাবৃষ্টিতে গরিব কৃষক হাহাকার করিতেছে, তাহার উপর আবার জমিদারের পেয়াদা খাজনার জন্য তাহার কাণ ধরিয়াছে; কৃষকের এইরূপ দুঃখের কথা একজন জমিদার লিখিয়াছেন দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কি কবিত্ব, কি ভাষা, কি ভাব, এ পুস্তকের সবই মধুর। রাজার উন্নত হৃদয়ের ছবি ইহাতে প্রতিভাত।

২১। উপদেশমালা।—শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন প্রণীত, মূল্য ৴০,। বালিকাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত। সুন্দর হইয়াছে।

২২। শুম্ভ নিশুম্ভবধং, মহাকাব্যং;—শ্রীকালীকান্ত শিরোমণিনা প্রণীতম্। পণ্ডিতকবি উপসংহারে লিখিয়াছেন যে,—

দৃষ্টা ন বুদ্ধা চ বিকল্পনীয়ং
দোষং প্রদাতুঞ্চ ভবামি ভীতঃ।

এটা তাঁহার নিজের ভয়, কিম্বা সমালোচকদিগকে একটুখানি ভয় দেখান, সেটা মীমাংসা করা সহজ নহে। সংস্কৃত লিখিবার এবং ছন্দ রচনা করিবার শক্তি যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। কবিপ্রযুক্ত বাক্যে যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি প্রভৃতি গুণ অধিকাংশ স্থানেই লক্ষিত হয়। কিন্তু এই সকল গুণ থাকিলেও, ভাবের আদিমত্ব বা নূতনত্ব না থাকিলে, কিম্বা কল্পনার কমনীয়তা না থাকিলে, বাক্য রসাত্মক হয় না। অঙ্গাদির পরিমাণ সৌন্দর্য্য থাকিলেও, যেমন লাবণ্য না থাকিলে রমণীর রূপ কর্কশ বলিয়া বোধ হয়, তেমনি এই মহাকাব্য বড় প্রীতিপ্রদ হইতে পারে নাই।

২৩, ২৪, ২৫। দারোগার দপ্তর—মার ধনচুরী, মূল্য ৵০, হত্যারহস্য মূল্য ৵০ ও কাটামুণ্ড, মূল্য ৵০।—শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সরল ভাষায় মনোহর করিয়া আদালতের গল্প সাজাইবার ক্ষমতা প্রিয় নাথ বাবুর যথেষ্ট আছে। উপকথাপ্রিয় বাঙ্গালী আষাঢ়ে গল্প ছাড়িয়া এই সকল গল্প পড়িলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন।

২৬। মহরমের ইতিবৃত্ত।—শ্রীকুমুদবন্ধু ঘোষ বি-এ, প্রণীত। মূল্য ৶০, গ্রন্থের বিষয় ভাল; কিন্তু ভাষার দোষে তত মনোহর হইতে পারে নাই। ইতিবৃত্তটুকু যথাযথ হইয়াছে কি না, তাহা জানি না। ইংরাজিতে এ বিষয়ে যাহা পড়িয়াছি, তাহার সহিত অনেকস্থলেই মিলিল না। তবে হইতে পারে যে ইংরাজীটা

ভুল, এবং কুমুদবাবু মীর মোসারফ হোসেন সাহেবের বিষাদ-সিন্ধু অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই ঠিক।

২৭। কুলজানি।—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১৲। শ্রীশবাবুর ভাষা ভাল, গল্পটিও বেশ মনোহর হইয়াছে।

২৮। স্বামী-স্ত্রীর পত্র।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এই পত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। পত্রচ্ছলে যে বিশেষ কিছু সুশিক্ষা আছে, তাহা দেখা গেল না।

২৯। The Private Tutor (or A book for the million)—মূল্য ॥০ 'মিলিয়নে' যদি এই গ্রন্থ পড়িয়া ইংরাজী শিক্ষা করে, তবে বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশ একটা চায়না বাজারে পরিণত হইবে। You must not hurt him অর্থ তুমি তাহাকে দুঃখ দিবে না! I will not dine অর্থ, আমি মধ্যাহ্ন ভোজন করিব না। hurt অর্থ, দুঃখ দেওয়া। dine অর্থ, মধ্যাহ্ন ভোজন; এ সকল নূতন কথা। অন্য স্থানে আছে, I fear it is cool আমার ভয় হয় ইহা শীতল। এইরূপ ভুল রাশি রাশি আছে। আমাদের মনে হয় যে, যাহাতে এই সকল বই প্রকাশিত হইতে না পারে, সে পক্ষে যত্ন করিবার সময় 'উচ্চ হইয়া আসিয়াছে'। যেমন অর্থ জ্ঞান, তেমনি উচ্চারণ জ্ঞান। Cave (কেইভ্), Lame (লেইম), voice (ভয়েস্) ইত্যাদি। গ্রন্থকার নিজে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষা পিতৃমাতৃহীন। কথাটায় বিশ্বাস জন্মিল, কারণ গ্রন্থকার অনেক স্থানে 'কহা' স্থানে 'বলা' ব্যবহার করিয়াছেন, Empress অর্থ সম্রাজ্ঞী, Kidney অর্থ মূত্রাধার, Bladder অর্থ মূত্রযন্ত্র লিখিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা গ্রন্থকার মহাশয়কে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিতেছি।

৩০। সরল প্রাণিবিজ্ঞান।—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায় সঙ্কলিত; মূল্য ৸০, এই গ্রন্থে কশেরুক শ্রেণীর প্রাণীর সাধারণ বিবরণ বালকদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা যেমন সুপণ্ডিত, এই গ্রন্থও তাহার উপযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে এমন ভাল গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। আর্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার এই পুস্তকে যে সকল ছবি দিয়াছেন, সেগুলি বিলাতি ছবি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। পক্ষী বালকদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত; কাজেই তাহার এত সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিয়া, সাধারণ ৮ আটটি বর্গের উল্লেখ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিচয় দিলে মন্দ হইত না। টেক্‌সট বুক কমিটি এই অতি উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে প্রচলিত করাইলে বড় উপকার হয়।

৩১। আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রী বিদ্যা।—শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ কর্ত্তৃক সংকলিত, মূল্য ১॥০, যাঁহারা এ তত্ত্ব জানিতে চান, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। দেশময় ইংরাজি প্রথা চলিয়াছে, একবার দেশীয় প্রথাটাও দেখিয়া লওয়া ভাল। চিকিৎসকেরা বুঝিবেন কোন্‌টা অবলম্বনীয়।

৩২। দেহাত্মিক তত্ব।—By Dr. Saha মূল্য ॥০; গ্রন্থকারের 'মস্তিষ্ক দেবী' একটুখানি শীতল হইলে ভাল হইত। গল্পচ্ছলে বিজ্ঞানের কথা লিখিতে গিয়া, বিজ্ঞান বধ করা হইয়াছে।

৩৩। ভক্তিযোগ।—শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত কর্তৃক বিবৃত। এখানি ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ। যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে চান, ঈশ্বরে ভক্তি স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী। বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া অশ্বিনীবাবু ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানি "সৌভাগ্য-সোপান" শ্রেণীস্থ পুস্তক। পুস্তক খানি অশ্বিনীবাবুর ধর্ম্মজীবনের গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার অমৃত ফল। পড়িয়া খুব উপকার পাইলাম।

৩৪। বেদান্ত রত্নাকর।—শ্রীশীতলচন্দ্র বেদান্ত-ভূষণ বিরচিত মূল্য ১৲। বাঙ্গালা ভাষায় অতি পরিষ্কার করিয়া সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মত এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কার্য্যে বেদান্তভূষণ মহাশয় প্রভূত যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষাটা একটুখানি সংস্কৃত ঘেষা, ঠিক একালের মত নয়। সেইটি না হইলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

৩৫। মহাসার বা বৌদ্ধ মহাপরিত্রাণ।—অর্থাৎ মূলপালি, সান্বয় ব্যাখ্যা, গদ্য ও পদ্যানুবাদ সহ উৎসর্গ, প্রার্থনা, শীল, কর্ম্মস্থান ও শুভ-মঙ্গল পরিত্রাণ। শ্রীধর্ম্মরাজ বড়ুয়া প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹। যাঁহারা এই সকল তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া লাভবান হইতে পারিবেন।

৩৬। জমিদারী কার্য্যের নিয়মাবলী।—শ্রীকৈলাসনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। পূর্ব্বে এই নামে যে পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, খাজানার আইনানুসারে তাহা পরিবর্ত্তিত ও সংক্ষিপ্ত হইয়া বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ আইন ব্যবসা এবং জমীদারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় এই দুই বিষয়ে গ্রন্থকারের যে প্রভূত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, সেই অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তকে প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অভিজ্ঞতা অনেকেরই অনেক বিষয়ে থাকে, কিন্তু তাহা জগতের উপকারে বড় একটা লাগে না; কেন না, মৃত্যুর পর তাহা লোপ পায়। যাহা পাঠে অত্যাবশ্যকীয় জমীদারী কার্য্য শিক্ষা করা যায়, এদেশে একখানিও এমন উপযুক্ত পুস্তক নাই। এই পুস্তক খানি জমীদারী কার্য্য সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম পুস্তক, এজন্য, গ্রন্থকার সর্ব্ব সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। তিনি যে সমুদয় প্রণালীতে সরল ভাষায় পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, আশা করা যায়, জমীদার এবং তৎকর্ম্মচারী উভয় শ্রেণীরই প্রভূত উপকারে আসিবে। পুস্তক খানির মূল্য ২৲ স্থলে ১৲ করিয়া দিলে সকলের গ্রহণের সুবিধা হয়। আশা করি, গ্রন্থকার তাহা করিবেন।

৩৭। বরাহনগরের বিধবা-আশ্রমের অনুষ্ঠান পত্র।—এদেশে যাহারা কৃপার পাত্রী, সর্ব্ব-সুখ-বর্জ্জিতা, সর্ব্বাশ্রয়-বঞ্চিতা, সেই বঙ্গ বিধবাদের জন্য কে ভাবে, কে খাটে? মহাত্মা বিদ্যাসাগর চলিয়া গিয়াছেন, এখন বঙ্গদেশ বিধবার অশ্রুতে প্লাবিত; তাহা মুছাইবার জন্য স্বার্থপর বঙ্গদেশে কেহ কিছু ভাবে না, কেহ কিছু করে না। দেখিতেছি, একমাত্র বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের উন্নতির জন্য প্রাণপণে খাটিতেছেন। শশিপদ বাবু বিধবা আশ্রমের স্থায়িত্বের জন্য আপন বাড়ী ঘর দান করিয়াছেন এবং স্থায়ী ফণ্ড সংস্থাপনে যত্ন করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাধের কলেজ, তাঁহার অভাবে, হস্তান্তর হইয়াছে, যত দূর জানি, বিধবাদের সাহায্য বন্ধ

হইয়াছে। ইহা দেখিয়া বুঝিতেছি, এদেশের কোন কাজই স্থায়ী নয়, কর্ত্তার সহিত সকলই লোপ পায়। বহুদর্শী শশিপদ বাবু ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার অতি যত্নের বিধবাশ্রমকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কাজের সহিত সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। বিধবা-আশ্রম হিন্দুপ্রণালীতে চলিয়া থাকে, সুতরাং হিন্দুসমাজের কোন আপত্তি বা সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, অগ্রে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করা উচিত। ট্রাষ্টি নিযুক্ত না হইলে সংগৃহীত অর্থাদি নিরাপদ নহে, হঠাৎ শশিপদ বাবুর তিরোধান হইলে, বড়ই গোল উপস্থিত হইবে;— শশিপদ বাবু যে জন্য এত খাটিতেছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজের ন্যায়, তাহা পণ্ড হইয়া যাইবে। আশা করি, তিনি আমাদের কথা ভাল ভাবে গ্রহণ করিবেন।

৩৮। বালিকা শিক্ষা।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য /০। বর্ণপরিচয় ও শিশুশিক্ষারদ্বারা যে কাজ সুন্দররূপে চলে, সে জন্য অন্য পুস্তকের প্রয়োজন কি? বর্ণশিক্ষার জন্য বালিকার পৃথক পুস্তকের আবশ্যকতা আমরা বুঝিনা।

৩৯। আদর্শ পরিবার।—শ্রীশ্রীকান্ত সেন প্রকাশক, মূল্য ৵০, ঢাকা। একটী আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবারের চিত্র ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা সুন্দর, রুচি মার্জ্জিত। সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ ইহাতে না থাকিলে সুন্দর হইত। সাম্প্রদায়িক ভাষা, সাম্প্রদায়িক রুচি, সাম্প্রদায়িক ভাব নিতান্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক; খ্রীষ্টীয় সমাজ এক সময়ে এইরূপ কাজে মত্ত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে এ পথ পরিত্যাগ করিয়া অতি উদার বিশ্বজনীন ভাবে পুস্তক লেখা উচিত। যাহা গণ্ডিতে আবদ্ধ বা যাহা গণ্ডির জন্য লিখিত, সাধারণের তাহাতে সহানুভূতি থাকা সম্ভব নহে।

৪০। যুবক ধর্ম্মনীতি।—শ্রীঅকিঞ্চন যুবক প্রণীত, মূল্য ৵০। এ পুস্তক খানিও ভাল, কিন্তু ইহাতেও সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আছে। কতকগুলি শব্দ, কতকগুলি ভাব ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব-সূচিত হইয়াছে। এরূপ না হইলেই ভাল হয়।

৪১, ৪২। জাতুপত্নী এবং ত্রিবিধ চ্যুতি।— শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵০ করিয়া। Deserted village and Paradise lost এর বঙ্গানুবাদ; সুতরাং ইহাতে "প্রণীত" না লিখিয়া "অনুবাদিত" লেখা উচিত ছিল। অনুবাদ ভাল, কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা কি, বুঝিলাম না।

৪৩ ও ৪৪। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত।—মূল্য ৵০, এবং ভক্তচরিতামৃত, অর্থাৎ শ্রীমৎ রূপসনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত; মূল্য ।৵০। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভাল বিষয়, ভাল হাতে পড়িলে যেরূপ হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে। পুস্তক দুখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আরো অনুসন্ধান করা উচিত ছিল।

৪৫। সাহিত্য প্রসঙ্গ।—শ্রীনবকৃষ্ণ ভাদুড়ী, এম, এ, প্রণীত; মূল্য ।৵০। স্কুল পাঠ্যের জন্য লিখিত হইয়াছে। স্কুলের শিক্ষক যেমন বালকদিগের অভাব বুঝে, এরূপ আর কেহ বুঝে না। নবকৃষ্ণবাবু একজন সৎশিক্ষক, এজন্য, পুস্তকখানি ছাত্রবর্গের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকের

ভাষা প্রাঞ্জল এবং সরল, রুচি মার্জ্জিত, উপদেশ শিক্ষাপ্রদ। এরূপ সুন্দর পুস্তক পাঠ্য-তালিকাতে বড় অধিক নাই: পুস্তকখানি পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হইলে ভাল হয়, কিন্তু তাহা হইবে কি না সন্দেহ আছে। কারণ দুইটি। প্রথম কারণ, টেক্‌ষ্টবুক্ কমিটীর সভ্যেরা আপন আপন পুস্তক চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; দ্বিতীয় কারণ, ইহাতে কতিপয় বিদেশীয় লোকের জীবনচরিত লেখা হইয়াছে। দেশ থাকিতে বিদেশের দৃষ্টান্ত কেন?-কোন কোন আর্য্যভাবাপন্ন এই মত-বিষে জর্জ্জরিত সভ্য এই ধুঁয়া ধরিয়া অনেক পুস্তক অগ্রাহ্য করিয়াছেন, জানি। ইংরাজ আসিয়া দেশের বড়ই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাঁহাদের মত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কিন্তু ষোল আনা ইংরাজভাবাপন্ন।

৪৬। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপক নামে খ্যাত রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম মত।—শ্রীযুক্ত জয়নাথ চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৷৷৹ আনা। ৩০৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পুস্তক লিখিয়া, রাজার নানা ধর্ম্মমতের সমালোচনা করিয়া শেষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"এক্ষণে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে আমাদের শেষ মন্তব্য এই যে, যদিও তাঁহাকে খ্রীষ্টিয়ান নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নহে, তথাপি আমরা তাঁহাকে "প্রায় খ্রীষ্টীয়ান" বলিয়া আখ্যাত করিতে পারি।" পুস্তকখানিতে রাজার যে সকল মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা তুলিয়াই, আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারি যে, রাজা খ্রীষ্টধর্ম্ম বিরোধী ছিলেন। গ্রন্থকার সে সকল কথা যে কেন তুলিলেন, পুস্তক পাঠ করিবার সময় বুঝি নাই। এখন বুঝিতেছি, তিনি "প্রায় খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন" এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; সে সম্বন্ধে আমাদের কোন কিছু বক্তব্য নাই। রাজা যে অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে আপন দলভুক্ত মনে করিতে পারে এবং অনেক লোক সেরূপ করিতেছে। ইহাতে রাজার মহত্বই প্রকাশ পাইতেছে। জয়নাথবাবুও এই শ্রেণীর লোক। তাঁহার গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করি, কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা করি না। "প্রায় খ্রীষ্টীয়ান" ছিলেন, এই কথা প্রতিপন্ন করার জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক লেখার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। বলা বাহুল্য যে, জয়নাথবাবু রাজার একজন অনুরাগী ব্যক্তি। আশা করি, তিনি রাজার উদারতা ও মহত্ব একদিন বুঝিতে পারিবেন।

৪৭। মৃন্ময়ী।—শ্রীগোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সংকলিত। ইহাতে সিদ্ধান্ত শাস্ত্রোক্ত ভূগোল বিষয়ক অনেক কথা আছে। বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সূর্য্যকিরণে যে চন্দ্র আলোকিত হয়, এই তত্ত্ব ঋক্ বেদে দৃষ্ট হয়। "আদিত্যধর্ম্মী এই গমনশীল অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এই রূপে পাইয়াছিল (রমেশবাবুর অনুবাদ, ঋক্‌বেদ ১।৮৪।১৫)। পৃথিবী ভ্রাম্যমানা কিম্বা গ্রহ নক্ষত্রাদি ভ্রাম্যমান, এই বিষয়ে ইউরোপের ন্যায় এ দেশেও মতভেদ ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন মতানুসারে পৃথিবীকে "অটল" মনে করিতেন, আর্য্যভট্ট পৃথিবী যে সচলা, ইহা প্রথমে মানব সমাজে প্রচার করেন।

ভপঞ্জর স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য
প্রতি দৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ
সম্পাদয়তি—নক্ষত্র গ্রহাণাং।"

"অর্থ এই— রাশিচক্র স্থিরই আছে, পৃথিবী ঘুরিয়া

ঘুরিয়া গ্রহ নক্ষত্র সকলের প্রত্যাহিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে।”

মাধ্যাকর্ষণ গতি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত না থাকিলেও নিউটনের অনেক পূর্ব্বে এদেশে ভাস্করাচার্য্য পার্থিব আকর্ষণ শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন।

আকৃষ্টশক্তিশ্চমহী যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে।

অর্থ—“পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তি বলে শূন্যমার্গে স্থিত বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকেই পতনশীল বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ং চতুপার্শ্বস্থ সমান আকাশের কোথায় পড়িবে?”

বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মত ছিল যে, যখন উৎক্ষিপ্ত গুরু বস্তু ভূতলে পতিত হইয়াছে, তখন পৃথিবীর ন্যায় গুরু বস্তু অবশ্যই ক্রমশঃ নীচে পড়িতেছে। ভাস্করাচার্য্য এই মতের অতিসুন্দর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

“ভূঃ খেহধঃ খলু যাতীতি বুদ্ধিবৌদ্ধ
যাত্যাচতুর্ত্ত দৃষ্ট্বাপি খে যৎক্ষিপ্তং গুরুক্ষিতিং।

ভাবার্থ এই, যখন উৎক্ষিপ্ত বস্তু ভূতলে পড়িতেছে, তখন যদি পৃথিবী ক্রমশঃ নিম্নে পড়িতেই থাকিত, তবে ঐ
তাহার সহিত দেখা
পৃথিবী ঐ বস্তু

গণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা তাহার অনুবাদ দিতেছি।

“ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে লঙ্কা, তাহার পূর্ব্বে যমকোটী, পশ্চিমে রোমক পত্তন, অধঃস্থলে সিদ্ধপুর, উত্তরে সুমেরু এবং দক্ষিণে বড়বানল (কুমেরু) গোলবিৎপণ্ডিতগণ এই-ছয়টী স্থানকে পাদান্তরিত অর্থাৎ একচতুর্থাংশ সমান্তরিত রূপে স্থিত বলেন। লঙ্কাপুরে যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন যমকোটিতে দিবা দুই প্রহর, সিদ্ধপুরে অস্ত এবং রোমক পত্তনে রাত্রি দুই প্রহর।”

লঙ্কার অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। জন্মভূমিতে জনৈক প্রবন্ধ লেখক সিংহল দ্বীপকে লঙ্কা না বলিয়া সুমাত্রা দ্বীপকে বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গোলাধ্যায়ের এই শ্লোক তাহার মত সমর্থন করিতেছে। ফলতঃ সিংহল বিষুবরেখার ৭ অংশ উত্তরে স্থিত; সুমাত্রাই বটে বিষুব রেখার উপরিস্থ। বারিধি মহাশয় বিবেচনা করেন যে লঙ্কা দ্বীপের দক্ষিণাংশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে, কেবল উত্তরে কতকাংশ বিদ্যমান আছে। আমরা এরূপ অনুমানের কোন কারণ বুঝিতে পারি না, বরঞ্চ সুমাত্রাকে লঙ্কা বলিয়া স্বীকার করিলে জ্যোতিষ পুরাণের

ছেন, যদি দেশে হিন্দুধর্ম্ম আবার নবীভূত করিতে হয়, তবে তাহা পুরাণাশ্রয়েই করা কর্ত্তব্য। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও কি এই মতের পক্ষপাতী? আমাদের কিন্তু বিশ্বাস অন্যবিধ। দেশ ও ধর্ম্ম যদি আবার উত্থান করে, তবে তাহা বেদের সহিত সত্যাবলম্বনে উত্থান করিবে, উপবর্ণ-ধর্ম্মময় পুরাণের সহিত উত্থান করিবে না।

৪৮। আর্য্যগাথা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম, এ; এম্, আর্, এ, সি; এম্, আর্, এ, এস্, ই; প্রণীত। এখানি গীতিকবিতা গ্রন্থ। এই সংগীতগুলির কতক তাঁহার স্বরচিত, আর কতকগুলি বিদেশী গীতের অনুবাদ। বলা বাহুল্য, তাঁহার নিজের গীতগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার ভাব এবং ভাষা কবিত্বপূর্ণ, আবেগময় ও সুন্দর; স্বর-সংযোগে আরও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে।

৪৯। শুকতারা।—শ্রীনখিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। এখানি পদ্য পুস্তক, পড়িতে মন্দ লাগে না, ভাষা মিষ্ট।

৫০। রাজরাণীর ধেনুসেবা।—অদ্ভুত নাটকীয় উপন্যাস শ্রী-

মত হইতে পারে, এই আশায় ইহা প্রচারিত হইল।" নূতন প্রণালী কি, আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে ২।৩ পৃষ্ঠাব্যাপী 'ন'র মিলে, আর 'য়া'র মিলেই কি নূতন প্রণালী? বইখানি সাধারণ রকম হইয়াছে, তবে মুরুব্বির জোর থাকিলে পাঠ্য-লিষ্ট ভুক্ত হইতে পারে।

৫২। স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা।—আর্য্য মিশন ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৴১০ আনা। গ্রন্থের সমালোচ্য বিষয় নামেই প্রকাশ। স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মূল মতের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই, তবে তাঁহার সকল প্রণালী ও উপায় আমরা সমর্থন করিতে পারি না। আর ষাঁড় ও গভীর উপমাটা আমাদের নিকট বড় কুৎসিত বোধ হইল।

৫৩। বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা।—শ্রীচন্দ্রশেখর কালী, এল, এম, এস, প্রণীত, মূল্য ২৲। ওলাউঠা সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত এবং সুন্দর পুস্তক আমরা আর দেখি নাই। পুস্তকখানির অনেক স্থান উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু

ওলাউঠা এখন এ

...ায় পাড়ায়, নিত্য